



হিচ-হাইকার

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত



শ্যামল

অনুবাদ

হিচ-হাইকার

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

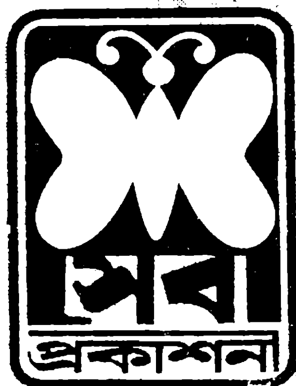




সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-0253-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১২
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
HITCH-HIKER
A Collection of short stories
Edited by: Anish Das Apu



ছেষট্টি টাকা

সূচি

ভূমিকা

এক কুড়ি অসাধারণ অনুবাদ গল্প নিয়ে প্রকাশিত হলো *হিচ-হাইকার*। বইটি সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রচুর খাটাখাটনি করতে হয়েছে আমাকে। কারণ আমি চেয়েছি *স্বর্ণকীট*-এর চেয়েও যেন ভাল হয় এ বইটি। চূড়ান্ত বাছাই এবং সম্পাদনা শেষে মনে হয়েছে নাহ্, সত্যি চমৎকার একটি বই উপহার দিতে যাচ্ছি আমি পাঠকদেরকে। বইয়ের গল্পগুলো পড়ার সময় নানান বিচিত্র অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কখনও অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে চোখ, কখনও ফেটে পড়েছি অট্টহাসিতে, আবার রোমাঞ্চ জেগেছে শরীরে, হয়েছি শিহরিত। তবে প্রতিটি গল্পই আমাকে পাঠক এবং সম্পাদক হিসেবে দারুণ তৃপ্তি দিয়েছে।

গল্প নির্বাচনে কাহিনির মজাটাই আমার কাছে ছিল আসল, লেখক বা অনুবাদক মুখ্য নয় ফলে একাধিক লেখক এবং অনুবাদকের গল্প স্থান পেয়েছে এ অনবদ্য সংকলনে। নিজে সম্পাদক বলে নিজের গল্প বেশি দেয়ার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু গল্পগুলো এত ভাল লাগল, চূড়ান্ত বাছাইপর্বে দেখা গেল কীভাবে যেন আমার অনূদিত একাধিক গল্প বইতে ঢুকে গেছে। পাঠক এতে ভুরু কোঁচকাবেন না আশা করি কারণ তাঁরা যখন দেখবেন আমার অনূদিত গল্পগুলো অন্যদের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়, তাঁদের কাছ থেকে আশা করি একটা সাধুবাদ আমি পাব।

হিচ-হাইকার-এর কুড়িটি গল্পই চমৎকার, শুরুতেই বলেছি। তবে কয়েকটি গল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করলেই নয়। কারণ এ গল্পগুলো আক্ষরিক অর্থেই আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। আর হৃদয়স্পর্শী প্রথম গল্পটি নিঃসন্দেহে কৃষণ চন্দরের *তাই ইশ্রী*। এ গল্পটি অনুবাদ করার সময় আমি কেঁদেছিলাম, পাঠক হিসেবে পড়ার পরে

আরও একবার কাঁদলাম। পাঠক, *ভাই ইশ্রী* আপনাদেরকেও কাঁদাবে।

জ্যাক লণ্ডন আমার দারুণ প্রিয় লেখক। তাঁর *স্বপ্ন* গল্পটি আমাকে অসম্ভব মুগ্ধ করেছে। আমাকে আরও মুগ্ধ করেছে গ্রেগোরিয় লোপেজ ফুয়েন্তেস্-এর *প্রাপক: ঈশ্বর* গল্পটি। কী যে সুন্দর গল্প!

আপনারা যাঁরা সায়েন্স ফিকশন ভালবাসেন তাঁদের জন্য ফাটাফাটি দুটি বিজ্ঞান কল্প-কাহিনি থাকছে এ সংকলনে। একটি হেনরী কুটনারের *শত্রু*, অপরটি বিল ব্রাউন-এর *তারা-হাঁস*। প্রথমটি পড়ে হাসতে হাসতে খুন হবেন, দ্বিতীয়টি চমকিত করবে।

হাস্যরসপ্রিয় পাঠকদের খিদে মেটানোরও ব্যবস্থা রয়েছে এ বইতে। হো হো করে হাসতে চাইলে লিও তলস্তয়ের *খরচ খুবই বেশি* এবং মার্ক টোয়েনের *আয়কর* পড়ুন। মুচকি হাসির জন্য ফ্র্যাংক. আর. স্টকটনের *রমণী, নাকি ব্যাঘ্র?* এবং রোল্ড ডাহ্লের টাইটেল গল্প *হিচ-হাইকার* এবং সাকি'র *শিকারের খলে*।

আপনাকে রোমাঞ্চিত করার জন্য রয়েছে আর্থার কোনান ডয়েলের *অপারেশন* এবং *চারপেয়ে*। আর রহস্য গল্প যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের ভাল লাগবে আগাথা ক্রিস্টির *অভিনেত্রী*, জেফরি আর্চারের *ঝাড়ুদার ইগনাশিয়াস* এবং ও' হেনরীর *তালার জাদুকর*।

জীবনধর্মী গল্পের মধ্যে গী দ্য মোপাসাঁর *মাদমোয়াজেল ফিফি* সমারসেট মম-এর *গয়না*, আলেকসান্দর পুশকিনের *ডুয়েল* ও খাজা আহমদ আব্বাসের *শেখ বুরহান উদ্দিনের মৃত্যু* অপূর্ব!

সবশেষে অনুবাদকদের কথা না বললে খুবই অন্যায় হবে। এ সংকলনের প্রতিটি গল্পই দারুণ অনুবাদ করেছেন অনুবাদকেরা। এঁদের মধ্য প্রথিতযশা লেখক যেমন আছেন, তরুণ অনুবাদকও আছেন ক'জন যাঁদের অনুবাদ পড়ে বোঝা যায় তাঁরা বয়সে নবীন হলেও কর্মে প্রবীণদের চেয়ে কম নন!

অনীশ দাস অপু

তাই ইশ্রী

আমি তখন ক্যালকাটার গ্রান্ট মেডিকেল কলেজে শেষ বর্ষের ছাত্র। লাহোরে ক'দিনের জন্য গিয়েছিলাম বড় ভাইয়ের বিয়েতে। আমাদের পূর্ব পুরুষের বাড়ি শাহি মহল্লার কাছে, কুচা ঠাকুর দাস লেনে। ওখানে বিয়ে। আর ওখানেই আমার প্রথম পরিচয় তাই ইশ্রীর সঙ্গে।

তাই ইশ্রী আমার আপন মাসী নন। তবে তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে ডাকত তাই–বড় মাসী বা খালা। তাঁর টোঙ্গা আমাদের মহল্লায় ঢুকলে কারও চোখে পড়লেই হলো, চেঁচিয়ে পাড়া মাত করত সে, 'তাই ইশ্রী এসেছেন!' তখন বুড়ো-ধাড়ি, বাচ্চা-কাচ্চা সকলে মিলে ছুটে যেত তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁকে টোঙ্গা থেকে নামতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত।

তাই ইশ্রীর ছিল বিশ্রী হাঁপানি রোগ। সামান্য হাঁটাহাঁটি, কথা বলা, এমনকী কাউকে ডাক দিতে গেলেও তাঁর জান বেরিয়ে যেত। কেউ টোঙ্গাঅলার ভাড়া দিতে গেলে চোখ রাঙাতেন তাই। বলতেন ভাড়া আগেই দিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথা বলার ভঙ্গি, শ্বাস নেওয়ার জন্য সংগ্রাম, হাঁপানি-হাসি, সবকিছুই আমাকে আকর্ষণ করত। ভাড়া দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাই ইশ্রীর আত্মীয় স্বজনকে মনমরা দেখাত। তারা পকেটে পয়সা ঢুকিয়ে অভিযোগের সুরে বলত, 'আপনি কেন ভাড়া দিতে গেলেন? আপনার সেবা করার সুযোগ আপনি কখনোই

দেন না।' তাই জবাব দিতেন না। পাশে দাঁড়ানো কোন তরুণী বা কিশোরীর হাত থেকে হাত পাখা নিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে মুচকি হাসতেন।

তাই ইশ্রীর বয়স ষাটের বেশি বৈ কম হবে না। বেশিরভাগ চুল পেকে সাদা, তাঁর বাদামী, গোল মুখখানাকে দান করেছে অপূর্ব মহিমা। সবাই তাঁর সহজ সরল কথা বলার ঢঙটি পছন্দ করত। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে, শ্বাস টানতে টানতে কথা বলতেন। আমি প্রথম দিনেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর চোখের দিকে। বৃদ্ধার চোখে এমন কিছু আছে, যেন সর্বংসহা ধরিত্রী–ও চোখের জমিনে যেন বিস্তৃত খেত ছড়িয়ে রয়েছে, বইছে গভীর নদী–একই সাথে সীমাহীন সারল্যের প্রতীক ও দুঃখ গোপন করে রাখার প্রচেষ্টা তাতে, এবং অসীম ভালবাসা এবং স্নেহের ফল্গুধারা উপচে পড়ছে চোখ জোড়া থেকে। আজতক এমন চোখের কোন নারী চোখে পড়েনি আমার। তাই ইশ্রীর চোখে ছিল নিরন্তর গুণের আধার, যে চোখ যে-কোন সমস্যাকে অবলীলায় হেলা করতে পারে।

তাই ইশ্রীর পরনে ছিল সোনালি রঙের বর্ডার দেওয়া রেশমী কাপড়ের 'ঘারারা', জাফরান রঙের সিল্কের জামা, তাতে ফুল আঁকা। মাথায় মসলিনের দোপাট্টা। হাতে সোনার ব্রেসলেট। উনি উঠানে হাজির হওয়া মাত্র বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। তরুণী বধূ, খালা, ভাবী, ননদ, ফুপু ইত্যাদি যত রকমের আত্মীয়স্বজন আছে সবাই ছুটে গেল তাঁকে প্রণাম করতে। এক মহিলা রঙিন একটি পিড়ি নিয়ে এসেছে, তাই ইশ্রী মৃদু হেসে ওটার উপরে বসলেন। প্রতিটি মহিলাকে তিনি আলিঙ্গনে বেঁধে নিলেন, মাথায় মাথা ছুঁইয়ে করলেন আশীর্বাদ।

মহিলাদের দলে সাবিত্রী নামে একটি কিশোরী ছিল। সে মহা উৎসাহে তাই ইশ্রীকে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছিল। তাই ইশ্রী

সঙ্গে একটি ঝুড়ি নিয়ে এসেছেন। তাঁর পায়ের কাছে, পিড়ির সামনে ওটা রাখা। যে-ই আসছে তাঁকে প্রণাম করতে, প্রত্যেককে তিনি ঝুড়ি থেকে চার আনা তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। পুরুষ, নারী, ছোকরা, মেয়ে, বাচ্চা সবাই তাই ইশ্রীকে প্রণাম করে চার আনা পেল। এবারে তাই ইশ্রী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন পাশে দাঁড়ানো কিশোরীর দিকে। এ তাকে বাতাস করছিল। 'কে গো তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমি সাবিত্রী,' ভীরু গলায় জবাব এল।

'ওহ্হো, তুমি জয় কিষেণের মেয়ে! তোমার কথা তো আমি ভুলেই গেছিলাম। এসো, আমার সঙ্গে কোলাকুলি করো...'

তাই ইশ্রী মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলেন। তারপর ঝুড়ি খুলে ওকেও চার আনা দিলেন। তখন মহিলারা হি হি করে হাসতে লাগল। কর্তারো মাসী আঙুলের নীলকান্তমণির আংটি ঘুরিয়ে বললেন, 'তাই, এ সাবিত্রী জয় কিষেণের মেয়ে নয়। এ অস্পৃশ্য হীরুর মেয়ে।'

'হায়, আমি গেছি!' আর্তনাদ করে উঠলেন তাই ইশ্রী। হাঁপানি উঠে গেল তাঁর। 'হায়, আমাকে এখন আবার চান করতে হবে। ওর মুখেও চুমু খেয়েছি। আমি এখন কী করি?'

তাই ইশ্রী বিস্ফারিত চোখে তাকালেন অস্পৃশ্য সাবিত্রীর দিকে। কিশোরী ফোঁপাতে শুরু করেছে। সাথে সাথে মন খারাপ হয়ে গেল তাইয়ের। মেয়েটিকে আবার বুকে টেনে নিলেন তিনি। 'আরে, বোকা, কাঁদে না। তুই কোন পাপ করিসনি। তুই দেবীর মত নিষ্পাপ আর খাঁটি। স্বয়ং ঈশ্বর বাস করছেন তোর এই ছোট্ট শরীরের মধ্যে। আমাকে স্নান করতে হবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্যে। তোকে কাঁদতে হবে না। নে, কান্না বন্ধ কর। এই রাখ আরও চার আনা...' তাই ইশ্রী কিশোরীকে আরেকটি চার আনা দিলেন। সাবিত্রী চোখ মুছে ফেলে ফিক করে হাসল। তাই

ইশ্রী হাত তুলে ডাকলেন, 'হীরু! আমার স্নানের জল দাও। তোমাকেও চার আনা দেবখন।' উঠানের ভিড় বিস্ফোরিত হলো অট্টহাসিতে।

অনেকেই তাই ইশ্রীকে চার আনা খালা বা মাসী বলে ডাকত। কেউ বলত দাতা মাসী। সবাই জানে বুড়ো বোধরাজ তাই ইশ্রীকে বিয়ে করলেও আজতক তাদের মধ্যে কোনরকম শারীরিক মিলন ঘটেনি। তরুণ বোধরাজের সাথে সুন্দরী মেয়েদের সম্পর্ক ছিল। সাধারণ কৃষকের কন্যা তাই ইশ্রীকে তার মোটেই পছন্দ হয়নি। বোধরাজ বিয়ের দিনই তাইকে ফেলে চলে গেছে। তবে তাইয়ের সঙ্গে সে খারাপ ব্যবহার করেনি। প্রতি মাসে পঁচাত্তর রুপী করে পাঠাচ্ছে। তাই ইশ্রী তাঁর শ্বশুর শাশুড়ি আর দেবর-ননদ নিয়ে গ্রামে থাকেন। যেই তাঁর বাড়িতে আসে, যথাসাধ্য সেবা করেন। বোধরাজ জলন্ধরে লোহার ব্যবসা করত। তাইয়ের বাবা-মা মেয়েকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে আসার বহু চেষ্টা করেছেন। আসেননি তাই। মেয়েকে আবার বিয়েও দিতে চেয়েছেন। রাজি হননি তাই। তিনি শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা যত্নে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। এমন সেবা আপন মেয়েও করত না, বলেন তাঁরা। বোধরাজের বাবা, মালিক চান্দ তাই ইশ্রীর হাতে সংসারের চাবি তুলে দিয়েছেন। শাশুড়ি তাঁর বউমাকে এত ভালবাসেন, নিজের সমস্ত সোনার গহনা তাইকে দিতে দ্বিধা করেননি। সব বাবা-মা-ই কোন না কোন সময় তাঁদের সন্তানদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাই এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। কোনদিন কাউকে বিন্দুমাত্র জ্বালাতন করেননি। লোকে মজা করে বলে, তাই নিশ্চয়ই তাঁর জন্মের সময় মাকে মিষ্টি গলায় বলেছিলেন, 'আমার জন্যে তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এই নাও চার আনা।'

সম্ভবত শান্ত মেজাজের কারণেই স্বামীর সঙ্গে শান্তিময় সম্পর্কটা বজায় রাখতে পেরেছেন তাই ইশ্রী। বোধরাজ একটা

অকর্মার ধাড়ি, মদ্যপ, ব্যভিচারী। ব্যবসায় ভাল করলেও তাই ইশ্রীর জীবনটাকে এভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার কোন অধিকার তার নেই। কিন্তু তাই ইশ্রীর এ নিয়ে কোন অভিযোগ নেই। আচরণ দেখে মনেই হয় না স্বামীর কারণে জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেছে তাঁর। সবসময়ই উৎফুল্লচিত্তে বকবক করে চলেছেন তিনি। হাসছেন, লোকের সাথে ঠাট্টা মশকরা করছেন; সব সময় মানুষের সুখ দুঃখের ভাগীদার তিনি, সাহায্যের জন্য বাড়িয়েই রেখেছেন হাত। মহল্লায় কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে আর সেখানে তাই ইশ্রী অনুপস্থিত, এ কল্পনাই করা যায় না। আবার কারও আত্মীয়-স্বজন মারা গেলেও তাকে সান্ত্বনা জানাতে ছুটছেন তিনি।

তাই ইশ্রীর স্বামীর টাকা থাকলেও তাইয়ের ছিল না। প্রতি মাসের ৭৫ রুপী মাসোহারা তিনি অন্যদের জন্য ব্যয় করতেন। ওই সময় ৭৫ রুপীর অনেক দাম ছিল। ওই টাকা দিয়ে অনেককে সাহায্য করতেন তাই ইশ্রী। তবে তাই ইশ্রী টাকা বিলোতেন বলে যে লোকে শুধু তাঁর কাছে আসত তা কিন্তু নয়। পকেটে একটি পয়সাও নেই, তবু মানুষ তাঁর কাছে যেত আশীর্বাদ নিতে। লোকে বলত তাই ইশ্রীর পা ছুঁয়ে প্রণাম বা সালাম করলেই মনে শান্তি আসে।

বোধরাজ ছিল শয়তান, আর তাই ইশ্রী সাক্ষাৎ দেবী। ত্রিশ বছর ধরে শ্বশুর বাড়িতে বাস করে আসছিলেন তাই ইশ্রী। শ্বশুর-শাশুড়ি এক সময় মারা গেলেন, ননদ-দেবররা বড় হবার পরে বিয়ে শাদী করে আলাদা হয়ে গেল। গ্রামের বাড়িটি হয়ে পড়ল শূন্য বোধরাজ তখন বাধ্য হলো তাই ইশ্রীকে জলন্ধরে নিয়ে আসতে। কিন্তু ওখানে বেশি দিন টিকতে পারলেন না তাই ইশ্রী। কারণ বোধরাজ পাঞ্জাবাগ থেকে আসা এক সম্ভ্রান্ত পাঠান পরিবারের মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। পাঠান পরিবারটি তাদের সম্মানের ভয়ে তাই ইশ্রীকে একদিন অনুরোধ

করল তাঁর স্বামীকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে। কয়েক দিন পরে তাই ইশ্রী স্বামীকে নিয়ে চলে এলেন লাহোরে। এবং মহল্লা ভারিয়ারানে ছোট একটি. বাড়ি ভাড়া করলেন। বোধরাজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এখানেও তার ব্যবসা জমে উঠল। একই সাথে লছমী নামে এক পতিতার বাড়িতে সে যাতায়াত শুরু করে দিল। লছমী শাহী মহল্লায় দেহ ব্যবসা করত। সম্পর্কটা এতটাই গভীরে চলে গেল যে বোধরাজ বেশ্যাটার সাথে থাকতে শুরু করল, খুব কমই তাকে দেখা গেল মহল্লা ভারিয়ারানে। তবে এ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল না তাই ইশ্রীর চেহারায়।

বেশ্যা মেয়েটার সাথে বোধরাজের সম্পর্কের কথা চাউর হয়ে যাবার সময়টাতে আমি এলাম আমার ভাইয়ের বিয়েতে। বোধরাজ বিয়েতে আসেনি, তবে তাই ইশ্রী সারাটা দিন কাটিয়ে দিলেন অতিথি আপ্যায়নে। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সবাই খুশি, এমনকী 'হাসতে মানা' ধরনের লোকের মুখেও হাসি ফুটল।

আমি কোনদিন শুনিনি তাই ইশ্রী কারও গীবত গেয়েছেন, নিয়তিকে দোষ দিয়েছেন। শুধু একবার তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য মনমরা হতে দেখেছি।

ঘটনাটা বিয়ের সময়ের। আমার বড় ভাইকে সারা রাত ব্যস্ত থাকতে হলো বিয়ের নানা আচার-অনুষ্ঠানে। পরদিন সকালে সকল লৌকিকতা শেষে কনে বাড়ির লোকজন তাদের যৌতুকের জিনিস পত্র নিয়ে এল। ওই সময় লোকে সোফা সেটের বদলে বাহারী রঙের পিড়ি আর খাট উপহার দিত। সে সব খাটের পায়াও থাকত রঙ করা। ওই সময় ড্রইং রুমকে লোকে বলত বৈঠকখানা কিংবা দিওয়ানখানা। আমার বড় ভাইয়ের শ্বশুর ভারতীয় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন তিনি তাঁর মেয়েকে প্রচুর যৌতুক দেন—এবং সবই লেটেস্ট স্টাইলের। আমাদের আত্মীয়-স্বজন ওই প্রথম যৌতুক হিসাবে সোফা সেট

চোখে দেখে।

সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল এই সোফা। দূরের গাঁও থেকে মহিলারা এসেছিল 'ইংলিশ পিড়ি' দেখতে। তাই ইশ্রীও সেবারই প্রথম সোফা নামের বস্তুটি চাক্ষুষ করেন। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তিনি সোফা সেটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছিলেন আর কী যেন বিড়বিড় করছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'বেটা, এ জিনিসের নাম সোফা সেট কেন?'

এ প্রশ্নের কী জবাব দেব আমি? শুধু মাথা নেড়ে বললাম, 'জানি না, মাসী।'

'দুটো চেয়ার ছোট আর তৃতীয়টা লম্বা কেন?'

এ প্রশ্নের জবাবও আমার জানা নেই। তাই মাথা নেড়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

তাই বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণ আপন মনে কী যেন বললেন। হঠাৎ শিশুর মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা, যেন প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন। 'বলব তোমাকে?'

'বলুন।'

আমরা যেন শিশু, সেভাবে ব্যাখ্যা করলেন তিনি, 'শোনো! আমার মনে হয় লম্বা সোফাটা বানানো হয়েছে যখন স্বামী-স্ত্রীর মনে শান্তি থাকে এবং তারা শান্তিতে ওটার উপর বসতে পারে সে চিন্তা করে। আর ওরা যখন বিবাদ করে তখন যাতে আলাদাভাবে বসতে পারে, তাই ভেবে ছোট চেয়ার দুটো বানিয়েছে ইংরেজদের মাথায় অনেক বুদ্ধি এ জন্যেই তো ওরা আমাদেরকে শাসন করছে।'

তাইয়ের ব্যাখ্যা শুনে সবাই ফেটে পড়ল হাসিতে। আমি লক্ষ করলাম হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেছেন তিনি। তাইয়ের কি মনে পড়েছে স্বামীর সাথে তাঁর জীবনভর ভুল বোঝাবুঝির কথা? আমি

ঠিক নিশ্চিত নই, তবে চোখের দিকে তাকাতে মনে হলো অদ্ভুত একটা আলো যেন দেখতে পেয়েছি ও চোখে। যেন মনের ভিতরে সবসময় বন্ধ হয়ে থাকা একটা দরজা এক মুহূর্তের জন্য খুলে গেছে।

ক্যালকাটা থেকে মেডিকেল ডিগ্রি নেওয়ার পরে আমি একটি বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে ধর্মতলায় ডাক্তারী প্র্যাকটিস শুরুর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারছিলাম না। অবশেষে আমার বড় ভাই লাহোর চলে আসতে তাগাদা দিল। কুচা ঠাকুর দাসের একটি দোকানে আমাকে বসিয়ে দিল। সেখানে আত্মীয়স্বজন আর প্রতিবেশীদের নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করে দিলাম। ক্যালকাটায় আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, ছিলাম নবিশ, লাহোরে দশ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে, কীভাবে রোগীকে ফাঁদে ফেলা যায় সে কৌশল রপ্ত করে ভালই কাজ করতে লাগলাম। প্র্যাকটিস জমে উঠতে লাগল। দিন রাত পাগলের মত খেটে যাচ্ছি।

আমার এখন নিজের পরিবার হয়েছে, জীবন ঘূর্ণির মত চলছিল. কোথাও বেড়াতে যাবারও ফুরসত নেই

তাই ইশ্রীর সঙ্গে দেখা নেই বহু দিন। শুনেছি তিনি এখনও মহল্লা ভারিয়ারানের সেই একই বাড়িতে বাস করছেন আর বোধরাজ তার পতিতা রক্ষিতা লছমীকে নিয়ে শাহী মহল্লায় থাকছে। মাঝে মাঝে সে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে।

একদিন সকালে, ক্লিনিকে বসে রোগীদের ভিড় নিয়ে ব্যস্ত, মহল্লা ভারিয়ারান থেকে এক লোক ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, 'ডাক্তার সাব, তাই ইশ্রী মারা যাচ্ছেন। শিগ্‌গির চলেন।'

আমি রোগী দেখা বাদ দিয়ে লোকটির সঙ্গে রওনা হলাম। তাইয়ের বাড়ি মহল্লা ভারিয়ারানের শেষ মাথায়। সিঁড়ি বেয়ে প্রায়

অন্ধকার একটি ঘরে ঢুকলাম। তাই বড় বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। ডান হাত দিয়ে চেপে আছেন বুক, যেন ছেড়ে দিলেই কলজেটা ফেটে বেরিয়ে যাবে। আমাকে দেখে স্বস্তির হাসি ফুটল মুখে। 'বেটা, তুমি এসে পড়েছ। আর চিন্তা নেই আমার।'

'কী হয়েছে, মাসী?'

'মৃত্যুর দেবতার ডাক পড়েছে! গত দু'দিন খুব জ্বর ছিল, ঠাণ্ডা হয়ে গেল গা, (কথা বলার সময় তাইয়ের চোখের পাতা দ্রুত ঝাপ্টাচ্ছিল)। প্রথমে পা দুটো একদম নিস্তেজ হয়ে গেল, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি বরফের মত শীতল। চিমটি কাটলাম। কোন সাড়া পেলাম না। তারপর আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে গেল পেট, শেষে আমার শরীর থেকে যখন প্রাণবায়ুটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, চেপে ধরলাম বুক (তাই বুকে হাতের চাপ বাড়ালেন)। তারপর চেঁচিয়ে বললাম, "কেউ 'আছ? থাকলে জয় কিষেণের ছেলে রাধা কিষেণকে ডেকে নিয়ে এসো। ও-ই একমাত্র আমাকে সুস্থ করে তুলতে পারবে!"—তুমি এসে পড়েছ—জানি আমি আর মরব না।' শেষে কথাটা রায় ঘোষণার মত শোনাল।

আমি তাইয়ের ডান কবজির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। 'আপনার হাতটা দেখি। পালস পরীক্ষা করতে হবে।'

তিনি বাম হাতের ঝটকায় সরিয়ে দিলেন আমাকে। 'হায়, কেমন ডাক্তার গো তুমি!' চেঁচাচ্ছেন তাই। 'জানো না এ হাতে আমি আমার প্রাণবায়ু চেপে ধরে রেখেছি। আমি তোমাকে এ হাতের পালস দেখতে দেই কী করে?'

কিছুদিনের মধ্যে আবার নিজের পায়ে খাড়া হতে পারলেন তাই। তাঁর উচ্চ রক্তচাপ আছে। প্রেশার নেমে গেলেই তিনি হাঁটাহাঁটি শুরু করে দেন, সবার খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। কয়েক মাস পরে তিনি যখন বেশ সুস্থ, মারা গেল বোধরাজ। রক্ষিতার

বাড়িতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পটল তুলল সে।

তাই স্বামীর লাশ নিজের বাড়িতে আনতে দিলেন না। শাহী মহল্লা থেকে শবযান নিয়ে যাওয়া হলো। শোক যাত্রায় তাই অংশ নিলেন না, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও না। কেউ তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল দেখল না। একটিও কথা না বলে তিনি ভেঙে ফেললেন বিয়ের চুড়ি, রঙিন শাড়ি বদলে পরে নিলেন সাদা ধুতি, ঘষে ঘষে তুলে ফেললেন মাথার সিঁদুর, কপালে লেপে দিলেন সামান্য ছাই। ধর্মীয় রীতি এটুকুই অনুসরণ করলেন তিনি।

সাদা শাড়ি, সাদা চুলে তাইকে আগের চেয়ে অনেক শান্ত ও সমাহিত মনে হলো। তাঁর অদ্ভুত আচরণ নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে গুঞ্জন উঠল। কেউ অবাক হলো, কেউ দুঃখ পেল। কিন্তু সবাই তাঁকে এতটাই শ্রদ্ধা করে যে সামনাসামনি কেউ কিছু বলার সাহস পেল না।

সময় যেতে লাগল। আমার প্র্যাকটিসের পরিধি মহল্লা ঠাকুর দাস ছাড়িয়ে শাহালাম গেটের কুচা কারমাল থেকে ওয়াচোবালির মূল চত্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সকালে আমি প্র্যাকটিস করি মহল্লা ঠাকুর দাসে, সন্ধ্যায় ওয়াচোবালিতে। কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ততার জন্য বহুদিন তাই ইশ্রীর সঙ্গে দেখা হয় না। তবে পরিবারের মেয়ে মহল থেকে তাঁর খোঁজ-খবর পাই। বোধরাজ ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা পয়সা দিয়ে গেছে লছমীকে, শুধু একটি বাড়ি আর জলন্ধরের একটি দোকান উইল করেছে তাই ইশ্রীর নামে। তাই ওখান থেকে মাসে দেড়শো রুপী ভাড়া পান। তিনি মহল্লা ভারিয়ারানে আগের মতই জনসেবা চালিয়ে যাচ্ছেন।

একদিন এক রোগী দেখে শাহী মহল্লা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে পড়ল বোধরাজ আর লছমীর কথা। এরা তো শাহী মহল্লাতেই থাকত। তাই ইশ্রীর কথাও মনে পড়ে গেল। এক বছরেরও বেশি

হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা নেই। কষ্ট লাগল বেচারির জন্য। ঠিক করলাম একটু সময় পেলেই দু'একদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

তাই ইশ্রীর কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শাহী মহল্লার একটা গলি থেকে বেরুচ্ছেন। বাহারি ঘারারার বদলে সাধারণ কালো একটি ঘারারা পরনে, তাতে কোন পাড় বা কুঁচি নেই। কামিজটাও ম্যাড়মেড়ে আদা রঙের, সাদা মসলিন দোপাট্টা এমনভাবে পেঁচিয়েছেন চিবুক আর মাথায়, তাকে মা মেরীর মত লাগছিল।

তাই ইশ্রী প্রায় এক সঙ্গে দেখে ফেললেন আমাকে। তাঁকে খুবই বিব্রত মনে হলো। ঝট্ করে ঘুরলেন। যে গলি থেকে এসেছেন ওদিকে হাঁটা দিলেন আবার। আমি ডাক দিলাম তাঁকে। অবাক হয়ে ভাবছিলাম বেশ্যালয়ে তাই ইশ্রী কী করছেন? 'তাই ইশ্রী!' জোরে ডাকলাম আমি। 'তাই ইশ্রী!'

আমার গলা শুনতে পেয়েছেন তিনি, ঘুরলেন, মাথা নিচু করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। যেন মস্ত কোন অপরাধ করে এসেছেন।

'তাই ইশ্রী, এখানে কী করছেন?' রাগ এবং বিস্ময় মেশানো কণ্ঠ আমার।

আমার চোখে চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না তিনি। 'বেটা,' কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি কী বলব? ইয়ে, মানে...ওই...শুনলাম লছমী মেয়েটার শরীর ভাল নেই...খুব অসুস্থ...ভাবলাম একবার একটু দেখে যাই...'

'আপনি লছমীকে দেখতে এসেছিলেন।' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'লছমী! সেই বেশ্যা, বদ মেয়ে লোকটা...'

তাই ইশ্রী হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলেন। 'না, না, বেটা!' নরম গলায় বললেন। 'ওকে ওভাবে গালমন্দ কোরো না।' চোখ তুলে চাইলেন তিনি, দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেললেন। 'একমাত্র

ওকে দেখে আমার মৃত স্বামীর কথা মনে করতাম। আজ সে সুযোগটাও হারিয়ে গেল চিরতরে।'

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার পরে লাহোর ছেড়ে জলন্ধরে চলে এলাম। ওখানে তাই ইশ্রীর একটি বাড়ি ছিল। তিনি দোতলাটা ছেড়ে দিলেন আমাদের জন্য। প্রতিদিন তিনি উদ্বাস্তু ক্যাম্পে গিয়ে নিজের সাধ্যমত সাহায্য করতেন। মাঝে মাঝে দু'একটি এতিম শিশুকে নিয়ে ফিরে আসতেন। চার-পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি চারটা ছেলে আর তিনটে মেয়েকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। এদের কারোর বাবা-মা'র খোঁজ মেলেনি। উদ্বাস্তুদের জন্য বাড়ির সামনের এবং পেছনের উঠানও ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

কিছুদিনের মধ্যে তাই ইশ্রীর বাড়ি যেন সরাইখানায় রূপান্তর ঘটল। তবু কেউ এক লহমার জন্যও তাঁকে বিরক্ত হতে দেখেনি। নিজের বাড়িতে তিনি ঢোকেন অচেনা মানুষের মত, যেন রিফুজিরাই এ বাড়ির মালিক। নিজেদের ব্যক্তিগত সহায়-সম্পদের প্রতি মেয়েদের স্বভাবজাত মোহ থাকে। শুধু তাই ইশ্রীর মধ্যে এ ব্যাপারটা অনুপস্থিত। কোন কিছুর প্রতি তাঁর মোহ নেই, শুধু মানুষের প্রতি রয়েছে অগাধ বিশ্বাস। জলন্ধরে আসার পরে এক বেলা খাবার খেতে হত তাঁকে, এ নিয়ে কখনও অভিযোগ করতে শুনিনি।

দাঙ্গার সময়টাতে স্বাভাবিক ভাবেই আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। তাই ইশ্রী জনে জনে সবাইকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিচ্ছে, এ ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হত না আমার। লাহোরে লাভজনক একটা প্র্যাকটিস হারিয়েছি আমি, মডেল টাউনের বাড়িটিও ফেলে রেখে পালিয়ে আসতে হয়েছে। আমার মাথার উপর ছাদ নেই–জামা কাপড় নেই, শূন্য পকেট, খাবার কেনার টাকাও নেই। খাবার দেওয়া হলে খাই, না দিলে অনাহারে থাকি। এমনসময়

আবার বাধিয়ে বসলাম আমাশা। নিজে ডাক্তার বলে রোগের চিকিৎসা জানি। কিন্তু আমাশা হলে ভাল খাবার-দাবার দরকার। তা কোথায় পাব? দ্রুত আমার স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগল। রোগের কথা কয়েকটা দিন গোপন রেখেছিলাম তাই ইশ্রীর কাছে। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম একদিন। তিনি আমার ঘরে এসে গভীর উদ্বেগ নিয়ে বলতে লাগলেন, 'বেটা, আমার কথা শোনো। এর নাম আমাশা। বড় ভয়ানক রোগ। ডাক্তাররা এ রোগ সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমি তোমাকে ভাড়া দিচ্ছি। সোজা গুজরানওয়ালায় চলে যাও। স্বর্ণকার গলিতে করিম বক্স চাচা থাকেন। পেশায় নাপিত। তার কাছে খুব ভাল ওষুধ আছে। ওই ওষুধ খেলে সবচে' বিশ্রী আমাশাও সেরে যায়। তোমার মেসোর কুড়ি বছর আগে একই রোগ হয়েছিল; করিম চাচা তাঁকে ভাল করেছিলেন। গুজরানওয়ালায় আমার স্বামী দশ দিন ছিলেন। ফিরে এসেছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে।'

আমি অসহিষ্ণু গলায় বললাম, 'তাই, আপনি জানেন না যে গুজরানওয়ালায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়?'

'কেন সম্ভব নয়? আমি তোমাকে যাবার ভাড়া তো দিচ্ছিই।'

'টাকা সমস্যা নয়। গুজরানওয়ালা পাকিস্তানে।'

'তাতে কী? আমরা কি ওখানে ওষুধ আনতে যেতে পারব না? আমাদের করিম বক্স চাচাও...

'তাই, আপনি দেখছি চোখ মেলে ঘুমাচ্ছেন,' বেজায় বিরক্ত আমি। 'জানেন না, মুসলমানরা এখন তাদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করে নিয়েছে? সে দেশের নাম পাকিস্তান, আমাদেরটা হিন্দুস্তান। কোন হিন্দুস্তানী এখন পাকিস্তানে যেতে পারবে না। পাকিস্তানীরাও আসতে পারবে না হিন্দুস্তানে। পাসপোর্ট লাগবে।' বিস্ময়ের ভাঁজ পড়ল তাইয়ের কপালে। 'পাসপোর্ট? এ জন্যে আমাদের কোর্টে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ। যেতে হবে।' ক্রুদ্ধ গলায় জবাব দিলাম। এই বোকা বুড়িকে কিছু বোঝাতে যাওয়া বড্ড ঝকমারি।

'না, বেটা। কোর্টে যাওয়া ঠিক কাজ নয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা কখনও কোর্টে যায় না। কিন্তু করিম চাচা...'

'গোল্লায় যাক করিম বক্স!' গর্জে উঠলাম আমি। 'আপনি কুড়ি বছর আগের কথা বলছেন। জানেন না করিম বক্স বেঁচে আছে না মরে গেছে। তবু তোতাপাখির মত তার নাম আউড়ে চলেছেন।'

চোখে জল নিয়ে মুখ ঘোরালেন তাই। তিনি চলে যাবার পরে নিজের উপর খুব রাগ হলো আমার। সরল, বৃদ্ধ মানুষটিকে কেন এভাবে আঘাত দিলাম আমি? এতটা মেজাজ না দেখালেও চলত। বর্তমান সময়ের জটিলতা যদি তাই বুঝতে না পারেন সে জন্য তাঁর কী দোষ?

ওই সময়টা ছিল দুশ্চিন্তা আর মেজাজ গরমের সময়। কলেজে পড়ার সময় বিপ্লব নিয়ে খুব গলাবাজি করেছি। পরে বিয়ে করে, প্র্যাকটিস শুরু করলে বিপ্লবের উত্তাপে ঠাণ্ডা জল পড়ে শীতল হয়ে গিয়েছিল। একটা সময় শব্দটা আমার অভিধান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে রায়টের সময়ে, জলন্ধরে বিপ্লব আবার মহা তেজে ফিরে আসে আমার কাছে। উৎসাহ নিয়ে বিপ্লবের কথা বলতাম আমি সব হারানো মানুষগুলোর সাথে। দোতলায় আমার ঘরে মীটিং বসত। একের পর এক চায়ের কাপ ধ্বংসের পাশাপাশি চলত বিশ্ব সমস্যা নিয়ে আলোচনা। আমি মুঠো শক্ত করে উঁচিয়ে ষাঁড়ের গলায় চেঁচাতাম, 'আমাদের সঙ্গে মোটেই মানবিক আচরণ করা হচ্ছে না। এসব লোকের কাছ থেকে কোনদিন ন্যায় বিচার পাব না। আমি নিশ্চিত এ দেশে শীঘ্রি আরেকটি ইনকিলাব (বিপ্লব) আসছে।'

একদিন আমার বক্তৃতা শুনে ফেললেন তাই ইশ্রী। ভিতরে ঢুকলেন তিনি শুকনো মুখ নিয়ে; দারুণ উদ্বেগ নিয়ে জানতে

চাইলেন, 'বেটা, মুসলমানরা কি আসছে?'

'না তো! আপনাকে কে বলল এ কথা?'

'তুমিই না বললে ইনকিলাব আসছে?'

বেচারি তাই, 'ইনকিলাব' ভেবেছেন কোন মুসলমানের নাম। তাঁর কথা শুনে আমরা হাসতে হাসতে খুন।

'আপনি যে কী সরল, তাই! আরে, আমরা যে ইনকিলাবের কথা বলছি তা হিন্দু-মুসলমান কোনটাই নয়। এ ইনকিলাব সবার জন্যে; আমরা একে আনতে চাই।'

তাই কী বুঝলেন কে জানে, মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, বেটা। তোমরা গল্প করো। আমি তোমাদের জন্যে চা নিয়ে আসি।'

আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য তাই সোনার ব্রেসলেট বিক্রি করে দিলেন। ওই টাকা দিয়ে আমি আমার পরিবার নিয়ে চলে এলাম দিল্লীতে। কারণ তখন জলন্ধরের পরিস্থিতি খুবই অনিশ্চিত হয়ে উঠছিল। দিল্লীতে নতুন প্র্যাকটিস আরম্ভ করলাম। কয়েক বছরের মধ্যে আবার খুঁজে পেলাম পায়ের তলায় মাটি। আমার ক্লিনিক ছিল করল বাগে। ওখানে লাহোর থেকে আসা প্রচুর উদ্বাস্তু ঠাঁই নিয়েছিল। এদের অনেকেই আমার পূর্ব পরিচিত। ধীরে ধীরে এদের সাথে হৃদ্যতা বাড়ল। তারা আমার ক্লিনিকে আসতে লাগল। আমার উপার্জনও সেই সাথে বেড়ে চলল। দশ বছরের মাথায় একটি বাড়ি করে ফেললাম আমি, কিনলাম গাড়ি। করল বাগের নেতৃস্থানীয় নাগরিক আমি এখন। আবার ছুটি দিলাম বিপ্লবকে। আমার আর আমাশাও হলো না। ভাল ডাক্তার হিসাবে বেশ সুনাম কামিয়ে ফেলেছি মহল্লায়।

তেরো বছর বাদে, গত মার্চে আমাকে জলন্ধর যেতে হয়েছিল। এক আত্মীয়র বিয়ে। এই তেরো বছরে তাই ইশ্রীর

কথা একবারও মনে পড়েনি। জলন্ধর পৌঁছা মাত্র মনে পড়ে গেল তাঁর কথা। মনে পড়ল এই মহিলা আমার জন্য কী করেছেন, বিশেষ করে তাঁর ব্রেসলেট বিক্রির টাকা দিয়ে আমি আবার নতুন করে প্র্যাকটিস শুরু করতে পেরেছি। তাই ইশ্রীর টাকাটা ফেরত দেওয়া হয়নি। জলন্ধর রেল স্টেশন থেকে সোজা চলে গেলাম তাঁর বাড়ি।

সন্ধ্যা নেমেছে। ধুলো, ধোঁয়া আর তেলের গন্ধ বাতাসে। পাশের বাড়ির শিশুদের কলরব শুনতে পেলাম তাই ইশ্রীর ঘরে ঢোকার সময়। তারা খেলাধুলা শেষে বাসায় ফিরেছে।

বাড়িতে তাই ইশ্রী ছাড়া কেউ নেই। প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে রাখা। তেলের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন তিনি, দেবতাকে ফুলের অর্ঘ্য দিচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দ শুনে হাঁক ছাড়লেন, 'কে রে?'

'আমি,' জবাব দিলাম হাসিমুখে ঘরে ঢুকে।

তাই দু'কদম এগিয়ে এলেন। কিন্তু চিনতে পারলেন না আমাকে। তেরো বছর দীর্ঘসময়! কানে বোধহয় কম শোনেন উনি, চোখের জ্যোতিও হয়তো কমে এসেছে। আগের চেয়ে শুকনো দেখাল মুখখানা। হাঁটার সময় কদম ফেলেন খুব ধীরে। 'আমি রাধা কিষেণ,' মৃদু গলায় বললাম।

'জয় কিষেণের ছোট খোকা?' আবেগে কেঁপে গেল তাইয়ের কণ্ঠ। দ্রুত এগিয়ে আসতে গেলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারেন সে ভয়ে চট করে আমি তাঁকে ধরে ফেললাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলেন তিনি। কাঁদছেন। অসংখ্যবার আশীর্বাদ করলেন তিনি আমাকে, চুমু খেলেন মুখে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, বিড়বিড় করলেন, 'বেটা, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? কোথায় ছিলে? কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম!'

লজ্জায় মাথা নুয়ে গেল আমার, মাটির দিকে তাকিয়ে

রইলাম। কথা বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু ভাষা যোগাল না মুখে। তাই আমার বিব্রত হবার কারণ বুঝতে পারলেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সেই পুরানো হাঁপানির মত টেনে টেনে প্রশ্ন করলেন, 'সরোজ ভাল আছে?'

'আছে, তাই।'

'বড় ছেলেটা?'

'ও ডাক্তারী পড়ছে।'

'আর ছোটটি?'

'ও কলেজে।'

'শানু আর বাত্তু?'

'দু'জনেই কলেজে উঠেছে। কমলার বিয়ে দিয়েছি।'

'ভাল। খুব ভাল!' সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন তিনি। 'আমিও সাবিত্রীর বিয়ে দিয়েছি। পুরান আছে রুরকিতে। নিম্মি আর বুমি ওদের বাবা-মা'র খোঁজ পেয়েছে। দেশ ভাগের ছ'বছর পরে ওরা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গেছে! দারুণ, না? ওদের নিয়মিত খবরাখবর আমি পাই। শুধু গোপি আছে আমার সঙ্গে। সামনের বছর ও-ও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। রেলওয়ে ওয়ার্কশপে শিক্ষা নবিশের কাজ করবে।'

এরা সবাই রায়টের সময় তাইয়ের আশ্রয়ে ছিল।

আমি লাজুক ভঙ্গিতে থুতনি চুলকে নিয়ে বললাম, 'তাই, আপনার দেনাটা এখনও শোধ করতে পারিনি। টাকাটা পাঠাতে পারিনি বলে আমি খুবই লজ্জিত। আমি এবার দিল্লী ফিরেই টাকা পাঠিয়ে দেব।'

'কীসের দেনা?' বিস্মিত দেখাল বৃদ্ধাকে।

'ব্রেসলেটের কথা মনে নেই আপনার?'

'অঃ ওইটা!' মনে পড়েছে তাইয়ের। মুচকি হাসলেন। আঙুলের গাঁট দিয়ে আমার মাথায় টোকা দিলেন। 'তোমার কাছে

আমার যে দেনা ছিল তা দিয়ে ও শোধবোধ হয়ে গেছে।'

'আমার কাছে আপনার তো কোন দেনা নেই!' অবাক আমি।

'বেটা, এ জীবনে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে দেনাদার,' গভীর গলায় বললেন তাই। 'কেউ না কেউ দেনা শোধ করেই চলেছে। তুমি কি এই পৃথিবীতে আপনাআপনি আসতে পেরেছ? না, তোমার বাবা-মা তোমাকে জীবন দিয়েছেন। তা হলে কি তুমি তোমার জীবনের জন্য আরেকজনের কাছে দেনাদার নও? আমরা যদি এই ঋণ বা দেনা শোধ না করে চলি তা হলে পৃথিবী এগোবে কী করে? শেষ হিসাব-নিকাশের দিন আসবে...বেটা, এ জন্যই বললাম আমার দেনা তুমি শোধ করে দিয়েছ। তুমি অন্য কারও দেনাও শোধ করে দেবে। সবসময় দায়মুক্ত থাকবে-এটাই জীবনের নিয়ম হওয়া উচিত।' দীর্ঘ বক্তৃতা শেষে বেদম হাঁপাতে লাগলেন তাই।

আমি আর কী বলব তাঁকে? ছায়া আলোকে কী বলতে পারে? তিনি যা বলেছেন আমি নীরবে শুনেছি। উনিও কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। তারপর আবার বললেন, 'আমার হাত-পা এখন আগের মত কর্মঠ নয়। নইলে তোমাকে কিছু একটা রান্না করে খাওয়াতাম। গোপী আসুক। তোমার জন্যে কিছু একটা বানিয়ে দেবে। তুমি না খেয়ে কিন্তু যাবে না...বুঝেছ?'

আমি নরম গলায় বললাম, 'তাই, এসব নিয়ে একদম ভাববেন না তো। আজ দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে আছি তো শুধু আপনার দয়ায়। আমি তেজ পালের বিয়েতে এসেছি। রেল স্টেশন থেকে সোজা চলে এসেছি আপনার বাড়ি। কিন্তু এখন বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতেই হবে।'

'আচ্ছা,' বললেন তিনি। 'আমাকেও দাওয়াত দিয়েছে ওরা। কিন্তু গত দু'দিন ধরে শরীরে মোটেই জুত পাচ্ছি না। তাই যাব না ঠিক করেছি। ওদেরকে একটা উপহার পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি

আমার তরফ থেকে তেজ পালের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ো। বোলো আমি তাকে আশীর্বাদ জানিয়েছি।'

'অবশ্যই, মাসী।' ঝুঁকে তাইকে প্রণাম করলাম।

উনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। আমার মাথায় হাত রেখে অন্তত একশোবার আশীর্বাদ করলেন। 'বেটা,' আমি চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, এমন সময় ডাক দিলেন। 'আমার একটা কথা রাখবে?'

'অবশ্যই। বলুন।'

'কাল সকালে একবার আমার কাছে আসবে?'

'কেন, মাসী?' হেসে উঠলাম আমি। 'ব্যাপার কী? আজ তো দেখা করেই গেলাম।'

থেমে থেমে বললেন তাই, 'আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না রে, বাপ। রাতের বেলা তো কিছুই দেখি না। কাল দিনের বেলা যদি একবার আসো তোমাকে একটু প্রাণ ভরে দেখতে পেতাম। তোমাকে তেরো বছর ধরে দেখি না, বেটা।'

আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। 'আমি অবশ্যই আসব, মাসী।'

পরদিন সকালে বিয়ের আরও অতিথি আসার খবর পেয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে ক'জন মিলে গেলাম রেল স্টেশনে। ফেরার পথে তাইয়ের কথা মনে পড়ল। অতিথিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছুটলাম বৃদ্ধার বাড়িতে। যে গলিতে উনি থাকেন, তার কোণায় দেখতে পেলাম ক'জন লোক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত কদমে এগোলাম। তাইয়ের বাড়ির নীচতলায় আরও অনেক মানুষের ভিড়, সবার চোখে জল। তাই ইশ্রী সকাল বেলা মারা গেছেন। ওই সময় আমি রেল স্টেশনে।

ওরা তাঁকে সাদা চাদরে জড়িয়ে তাঁর ঘরের মেঝেতে শুইয়ে রেখেছে। মুখখানা খোলা। ধূপ আর আগর বাতির গন্ধ ঘর জুড়ে। এক পণ্ডিত বৈদিক মন্ত্র পড়ছেন।

তাই ইশ্রীর চোখ বোজা, শিশুসুলভ চেহারা ইতিমধ্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ও মুখে অসীম একাকীত্বের ছাপ। এ মুখ যেন আমি চিনি না। ও মুখ মুখ নয়, শান্তির প্রতীক, ওই মুখ অতল স্বপ্ন দেখত। ওই মুখ যেন স্বয়ং ধরিত্রী–যে পৃথিবীর চোখে প্রবাহিত হয় দুনিয়ার সকল নদী, যার কোলে শত, হাজার উপত্যকায়, হাসিতে উদ্ভাসিত পাহাড়ের ছায়ায় আবাস গড়ে তোলে মানুষ, যে মুখ থেকে স্বার্থহীন ভালবাসা আর সারল্যের দীপ্তির বিকিরণ ঘটে।

তাই ইশ্রীর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে নির্নিমেশ তাকিয়ে ছিলাম আমি, চমক ভাঙল কাঁধের উপর কারও হাতের ছোঁয়ায়। ঘুরলাম। এক তরুণ। কাঁদতে কাঁদতে ফুলিয়ে ফেলেছে চোখ।

'আমি গোপী নাথ,' মৃদু গলায় বলল সে।

ওকে জানি আমি। তবে কোন মন্তব্য করলাম না। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

'আপনার খোঁজে তেজ পালের বাড়ি গিয়েছিলাম; আপনি তখন রেল স্টেশনে।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'তাই আজ সকালে বহুবার আপনার কথা বলেছেন। উনি জানতেন আপনি আসবেন। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগ পর্যন্ত উনি আপনার অপেক্ষা করেছেন। আর অপেক্ষার সময় নেই বুঝতে পেরে আমাকে বলেছিলেন–'আমার বেটা রাধা কিষেণ এলে তাকে এ জিনিসটা দিয়ো।' গোপী নাথ হাত বাড়াল। আমার তালুতে একটি চার আনা রাখল।

আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

জানি না তাই ইশ্রী আজ কোথায় আছেন, তবে স্বর্গে থাকলে আমি নিশ্চিত তিনি তাঁর রঙিন পিড়িতে বসে, পায়ের কাছে ঝুড়ি নিয়ে দেবতাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করছেন, আর প্রত্যেককে বিলিয়ে দিচ্ছেন চার আনা পয়সা।

মূলঃ কৃষণ চন্দর
অনুবাদঃ অনীশ দাস অপু

শেখ বুরহান উদ্দিনের মৃত্যু

আমার নাম শেখ বুরহান উদ্দিন। দিল্লিতে যেবার ভয়াবহ আকারে সন্ত্রাস আর খুন ছড়িয়ে পড়ল আর রাস্তা রঞ্জিত হয়ে উঠল মুসলমানদের রক্তে, আমি তখন প্রতিবেশী হিসাবে একজন শিখকে পেয়ে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছিলাম। এ লোক বিপদের সময় আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে সে চিন্তা তো করিই না, যেটা একজন সুপ্রতিবেশীর কর্তব্য, বরং কৃপাণটা কখন আমার পেটে ঢুকিয়ে দেয় সে আতঙ্কে অস্থির ছিলাম। শিখরা তখনও আমার কাছে হাসির পাত্রই ছিল। তবে তাদেরকে অপছন্দ করতাম, আর খানিকটা ভয়ও পেতাম।

শিখদের প্রতি ঘৃণা আমার ছেলেবেলার, প্রথম এদের একজনকে দর্শন করবার পর থেকে। তখন আমার বয়স ছয়ের বেশি হবে না, একদিন দেখলাম এক শিখ রোদ পোহাতে পোহাতে তার লম্বা চুল আঁচড়াচ্ছে। 'ইক্!' গা ঘিনঘিন করে উঠল আমার, 'লম্বা দাড়ির মহিলা!' বড় হবার পরে বিতৃষ্ণাটা ঘৃণায় পরিণত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গোটা জাতির প্রতি।

আমাদের বাড়ির বৃদ্ধারা সবসময় শিখদের প্রতি বিষোদ্গার করতেন। যেমন কোন বাচ্চা নিউমোনিয়া বাধিয়েছে অথবা কারও ঠ্যাং ভেঙেছে, তারা বলতেন, 'বহু আগে এক শিখের (অথবা ইংরেজের) নিউমোনিয়া হয়েছিল কিংবা বহু আগে এক শিখের ঠ্যাং ভেঙে গিয়েছিল।' বড় হবার পরে শুনেছি ১৮৫৭ সালের

স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু আর মুসলমানদেরকে পরাজিত করবার জন্য শিখ যুবরাজরা ফিরিঙ্গী বা বিদেশীদেরকে সাহায্য করেছিল। আমি কোন ঐতিহাসিক দলিল লিখতে বসিনি, শুধু বোঝাতে চাইছি আমি ইংরেজ ও শিখদের প্রতি একটা সন্দেহ ও ঘৃণা নিয়ে বড় হয়েছি। তবে শিখদের চেয়ে ইংরেজদের প্রতি ভীতিটা আমার বেশি ছিল।

দশ-বছর বয়সে দিল্লি থেকে আলিগড়ে ঘুরতে যাবার সুযোগ হয়ে গেল হঠাৎ করেই। থার্ড ক্লাস বা মধ্যম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেই আমি অভ্যস্ত। সেদিন সিদ্ধান্ত নিলাম অন্তত একবারের জন্য হলেও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করে দেখব কেমন লাগে। টিকিট কাটলাম। একটি খালি সেকেন্ড ক্লাস কমপার্টমেন্ট পেয়েও গেলাম। লাফ দিয়ে বসে পড়লাম আরামদায়ক আসনে। কিছুক্ষণ পরে বাথরুমে গেলাম চুলটুল আঁচড়াতে। বাথরুম থেকে বের হয়ে কমপার্টমেন্টের সবগুলো পাখা চালিয়ে দিলাম। সুইচ টিপে বারবার বাতি জ্বালালাম আর নেভালাম। ট্রেন ছাড়বার কয়েক মুহূর্ত আগে চার লাল মুখো 'টমি' (ইংরেজ সৈনিক) ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল কমপার্টমেন্টে। তাদের মুখে 'শালা' আর 'বানচোত' ছাড়া কোন কথা নেই। প্রতিটি বাক্যে এই অশ্লীল শব্দ দুটি প্রয়োগ করতে লাগল তারা। তাদের দিকে তাকিয়ে আমার সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণের ইচ্ছে সম্পূর্ণ উবে গেল।

দ্রুত সুটকেস নিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে। একটি থার্ড ক্লাস কমপার্টমেন্টে ঢুকে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলাম। এ কমপার্টমেন্টে সবাই স্থানীয় লোকজন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস–সকলেই শিখ। তাদের লম্বা দাড়ি পেট ছুঁয়েছে, নিম্নাঙ্গে হাফপ্যান্ট ছাড়া কিছু নেই। এ ঘর থেকে অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই। তবু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বসে পড়লাম। শিখদের চেয়ে সাদা মানুষদের বেশি ভয় পেলেও আমি

সাদাদেরকে অনেক সভ্য মনে করি। তারা আমাদের মতই পোশাক পরে। আমিও ওদের মত ইংরেজিতে 'শালা' 'বানচোত' বলে গালি দিতে চাই। তাদের মত শোষক শ্রেণীভুক্ত হতে চাই। ইংরেজরা ছুরি-কাঁটা হাতে নিয়ে খাবার খায়, আমিও সেভাবে খেতে চাই যাতে এই শিখগুলো আমাকে সাদাদের মতই সভ্য আর উন্নত মনে করে।

আমার শিখ-ফোবিয়া একটু ভিন্নরকম। শিখদের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা ছাড়া কিছু নেই। এরা কী রকম নির্বোধ মেয়েদের মত চুল লম্বা রাখে। আমি অবশ্য চুল খুব ছোট করে ছাঁটবার পক্ষপাতি নই। যদিও আমার বাবা বড় চুল রাখা পছন্দ করতেন না। কিন্তু শুক্রবার, নাপিতের দোকানে চুল ছাঁটতে যাবার সময় বলে দিতাম খুব বেশি ছোট যেন না করে। আমি মোটামুটি লম্বা চুল রাখতাম। যখন হকি বা ফুটবল খেলতাম, বাতাসে আমার চুল উড়ত ইংরেজ খেলোয়াড়দের মত। বাবা প্রায়ই অভিযোগ করতেন, 'মেয়েদের মত লম্বা চুল রেখেছ কেন?' বাবার যত আদ্যিকালের ধ্যান-ধারণা। তাই বাবাকে তেমন পাত্তা দিতাম না। বাবা পারলে সবার মাথা ন্যাড়া করে থুতনির নীচে কৃত্রিম দাড়ি লাগিয়ে দেন...দাড়ির প্রসঙ্গ উঠলেই মনে পড়ে যায় শিখদেরকে ঘৃণা করবার দ্বিতীয় কারণ হলো তাদের লম্বা দাড়ি, যাতে তাদেরকে বুনোদের মত লাগে।

চারিদিকে শুধু দাড়ি আর দাড়ি। আমার বাবার দাড়ি, ফরাসী কায়দায় নিখুঁতভাবে ছাঁটা; কিংবা আমার চাচার চিবুকের নীচে সুঁচাল ডগার দাড়ি। কিন্তু সেরকম দাড়ি দেখলেই ঘেন্না লাগে যে দাড়িতে কোনদিন নাপিতের কাঁচি পড়েনি, বুনো ঝোপের মত শুধু বেড়েই চলেছে–তাতে আবার তেল, দই ছানাসহ আরও কী সব মাখানো হয়, খোদা মালুম! এ দাড়ি কয়েক হাত লম্বা হবার পড়ে মেয়েদের চুলের মত চিরুনি দিয়ে আবার আঁচড়ানোও হয়।

আমার দাদারও খুব লম্বা দাড়ি ছিল, তিনি চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতেন। কিন্তু আমার দাদার সাথে তো আর শিখদের তুলনা করা যায় না। আমার দাদা হলেন আমার দাদা। আর শিখরা তো স্রেফ শিখ।

ম্যাট্রিক পাস করবার পরে আমাকে ভর্তি করা হলো আলিগড়ে, মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে। আমরা, ছেলেরা, যারা দিল্লি বা উত্তর প্রদেশ থেকে এসেছি, পাঞ্জাব থেকে আসা ছাত্রদেরকে পাত্তা দিতাম না। ওরা ছিল গাঁইয়া, কীভাবে কথা বলতে হয় জানে না, কীভাবে টেবিলে বসতে হয় জানে না। ওরা শুধু জানে বড় বড় গ্লাস ভর্তি ঘোল গিলতে। লিপটন চা ওরা জীবনেও পান করেছে কিনা সন্দেহ। আর কী চোয়াড়ে ঢঙের কথাবার্তা! ওরা যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, মনে হয় ঝগড়া করছে। প্রতিটি বাক্যে উসসি, তুসসি, সাদি, তোহাদি'র অনর্গল ব্যবহার। আমি পাঞ্জাবীদের কাছ থেকে সবসময় দূরত্ব রেখে চলতাম।

কিন্তু আমাদের হোস্টেলের ওয়ার্ডেন, (খোদা তাকে ক্ষমা করুন) আমার রুমমেট হিসাবে গছিয়ে দিল এক পাঞ্জাবীকে। একে ঝেড়ে ফেলবার কোন উপায় নেই দেখে ঠিক করলাম নতুন রুমমেটের সঙ্গে খামোকা দ্বন্দ্বে জড়াতে যাব না। এতে অবশ্য লাভই হলো। কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। আমার নতুন রুমমেটের নাম গোলাম রসুল, এসেছে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে। এর মাথা ভর্তি কৌতুক গিজগিজ করছে, সঙ্গী হিসাবে বেশ ভাল।

গোলাম রসুল শিখদেরকে নিয়ে সারাক্ষণ ঠাট্টা করত। তার গল্প কিংবা কৌতুকের বিষয়বস্তুই ছিল শিখ। তার চোখে শিখদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো: সকল শিখই নির্বোধ ও ডাহা মূর্খ। দুপুরবেলা এরা সবাই একযোগে বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলে। যেমন, একদিন বেলা বারোটার সময় এক শিখ অমৃতসরের হল

বাজারে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় একজন কনেস্টবল, এও শিখ, তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাতি কই?'

সাইকেল আরোহী কাঁপা গলায় জবাব দিল, 'জমাদার সাব, আমি বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বাতি জ্বালিয়েছিলাম। ওটা নিশ্চয় এইমাত্র নিভে গেছে।' জমাদার তাকে হাজতে পুরে দেওয়ার ভয় দেখাল। ওই সময় সাদা দাড়িঅলা এক শিখ পথচারী ওদিক দিয়েই যাচ্ছিল। সে সব শুনে বলল, 'ভায়েরা, ছোটখাট জিনিস নিয়ে ঝগড়া করবার মানে নেই। বাতি যদি নিভে গিয়েই থাকে, ও আবার জ্বালানো যাবে।'

গোলাম রসুল এ ধরনের প্রচুর কৌতুক জানত। পাঞ্জাবী উচ্চারণে কৌতুকগুলো যখন বলত সে, শ্রোতা-দর্শক না হেসে পারত না।

শিখরা শুধু নির্বোধই নয়, ভয়ানক নোংরাও। গোলাম রসুলের সঙ্গে প্রচুর শিখের পরিচয় ছিল। সে আমাদেরকে বলত শিখরা কখনও মাথা কামায় না। আমরা মুসলমানরা অন্তত শুক্রবার দিন খুব ভালভাবে মাথা ধুই, আর শিখরা হাফপ্যান্ট পরে যত রাজ্যের নোংরা জিনিস মাথায় ঢালে। যেমন দই। আমি খুলিতে লেবুর রস আর গ্লিসারিন ঘষি। গ্লিসারিন দইয়ের মত সাদা আর ঘন হলেও এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস–ইউরোপের বিখ্যাত সুগন্ধি কোম্পানির তৈরি। আমার গ্লিসারিন আসে সুন্দর বোতলে আর শিখরা দই কেনে নোংরা মিষ্টির দোকানদারের কাছ থেকে।

শিখদেরকে নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাতাম না, যদি না তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের মত বীরযোদ্ধা বলে দাবি করত। পৃথিবীর সবাই জানে একজন মুসলমান দশজন হিন্দু কিংবা শিখের চেয়ে বেশি শক্তি রাখে। কিন্তু এই শিখগুলো মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে রাজি নয়, বরং মিথ্যা অহংকারে গোঁফ ফুলিয়ে

দাড়িতে হাত বুলিয়ে গট্‌গট্‌ করে হাঁটে। গোলাম রসুল বলত, একদিন আমরা, মুসলমানরা শিখদেরকে এমন শিক্ষা দেব যে জীবনে ভুলবে না।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল।

আমি কলেজের পাট চুকালাম। প্রথমে কেরানির চাকরি পেলাম, সেখান থেকে প্রমোশন হয়ে হেড ক্লার্ক। আলিগড় ছেড়ে চলে এলাম নয়া দিল্লি। সরকারী কোয়ার্টার পেয়ে গেলাম। বিয়ে-শাদী করলাম। বাচ্চাকাচ্চার বাপও হয়ে গেলাম।

আমার কোয়ার্টারের পাশেই থাকেন এক শিখ। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে উচ্ছেদ হয়ে চলে এসেছেন। অনেকদিন কেটে গেলেও গোলাম রসুলের একটা কথা আমি ভুলিনি। সে বলেছিল মুসলমানরা একদিন শিখদেরকে জন্মের শিক্ষা দেবে। তাই ঘটেছে রাওয়ালপিণ্ডিতে। মুসলমানরা একযোগে ওই শহর থেকে মুছে ফেলেছে শিখদের নিশানা। শিখরা নিজেদেরকে বিরাট যোদ্ধা বলে গর্ব করে, লম্বা কৃপাণ উঁচিয়ে হম্বিতম্বি করে। কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডিতে সাহসী মুসলমানদের সামনে তারা দাঁড়াতেই পারেনি। জোর করে সবগুলো শিখের দাড়ি কেটে দেওয়া হয়েছে। খত্‌না করতে তারা বাধ্য হয়েছে। বাধ্য হয়েছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে। হিন্দু পত্রপত্রিকাগুলো তাদের অভ্যাসমত যাচ্ছেতাই গালাগাল করেছে মুসলমানদেরকে। তারা লিখেছে মুসলমানরা শিখ মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করছে। এটা মোটেই সত্য নয়। ইসলাম ধর্মে পরিষ্কার বলা আছে কোন মহিলা বা শিশুর গায়ে হাত তোলা যাবে না। হিন্দু পত্রিকাগুলোতে মহিলা ও শিশুদের লাশের যে ছবি ছাপা হয়েছে সব ভুয়া। কোনদিন শোনা যায়নি মুসলিম যোদ্ধারা নারী কিংবা শিশুর উপর অত্যাচার করেছে। আমার ধারণা, শিখেরা নিজেরাই নিজেদের স্ত্রী আর বাচ্চাদেরকে খুন করেছে মুসলমানদের উপর দোষ চাপানোর জন্য।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও শিখ নারীদেরকে তুলে নেওয়ার অভিযোগও এসেছে। আসল ব্যাপার হলো মুসলমানদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে শিখ আর হিন্দু মেয়েরা তরুণ মুসলমানদের প্রেমে পড়েছিল এবং তাদের হাত ধরে চলে যেতে চেয়েছিল। মহান হৃদয়ের অধিকারী এই তরুণদের সামনে ওই মেয়েদেরকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এবং এভাবে শিখ ও হিন্দু মেয়েদেরকে তারা ইসলামের সত্য পথে নিয়ে এসেছে। শিখদের ফালতু অহংকারের পতন ঘটেছে। তাদের নেতারা কৃপাণ হাতে মুসলমানদেরকে হুমকি দিতে পেরেছে কি পারেনি তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। তবে আমার বুকটা ইসলামের জন্য গর্বে ফুলে উঠেছে দেখে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শিখরা দলে দলে ছুটে পালাচ্ছে।

আমার প্রতিবেশী শিখের বয়স ষাটের কাছাকাছি। দাড়ি পুরোটাই সাদা। মৃত্যুর চোয়াল থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও বুড়োকে দেখছি সারাক্ষণই দাঁত কেলিয়ে হাসছেন। নির্বোধ না হলে এভাবে কেউ হাসতে পারে? প্রথম প্রথম উনি সেধে আমার সঙ্গে ভাব জমাতে চাইছিলেন। রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে আসতেন। একবার কী একটা শিখ উৎসবে তিনি আমাদের বাড়িতে কিছু মাখন পাঠিয়ে দিলেন। আমার স্ত্রী সাথে সাথে ওটা আমাদের ঝাড়ুদারণীকে দিয়ে দিল। আমি বুড়োর সাথে যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে চলছিলাম। জানতাম কথা বলবার সুযোগ দিলেই তিনি ঘনিষ্ঠ হতে চাইবেন। আর শিখরা যে কথায় কথায় অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে কে না জানে? আমি এ ধরনের লোকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জিভটাকে নোংরা করব কেন?

রোববারের এক বিকেলে আমার বউকে শিখদের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে কৌতুক শোনাচ্ছিলাম। আমার বক্তব্য প্রমাণ করতে আমার

চাকরটাকে ঠিক বারোটার সময় প্রতিবেশী শিখের বাড়িতে পাঠালাম ক'টা বাজে জেনে আসবার জন্য। সে এসে বলল, বারোটা বেজে দুই মিনিট।' আমি স্ত্রীকে বললাম, 'দেখলে, ওরা বারোটা বেজেছে এ কথাটা বলতেও ভয় পায়!' তারপর দু'জনেই হেসে উঠলাম হো হো করে। এরপরে বহুবার আমার শিখ প্রতিবেশীকে বোকা বানানোর জন্য জিজ্ঞেস করেছি, 'সর্দারজী, বারোটা কি বেজেছে?' নির্লজ্জ লোকটি বেহায়ার মত সমস্ত দাঁত বের করে জবাব দিয়েছেন, 'জনাব, আমাদের জন্যে সবসময়ই বারোটা বাজে।' তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন যেন মস্ত একটা ঠাট্টা করেছি।

আমার বাচ্চাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সবসময়ই সচেতন ছিলাম। শিখদেরকে কোনভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। আর এ লোক তো রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পালিয়ে এসেছেন। তাঁর বুকে নিশ্চয়ই মুসলমানদের জন্য প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে, প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। আমার স্ত্রীকে বলে দিয়েছি কখনোই যেন বাচ্চাদেরকে শিখের বাড়ির ধারেকাছেও যেতে না দেয়। কিন্তু বাচ্চা তো বাচ্চাই। কয়েকদিন পরে দেখলাম আমার বাচ্চারা শিখের ছোট মেয়ে মোহিনী এবং তাঁর এক নাতনীর সঙ্গে খেলছে। মোহিনীর বয়স দশ-টশ হবে, নামের মতই চেহারা তার। ফর্সা, অপূর্ব সুন্দরী। হারামজাদা শিখগুলোর বউরা খুব সুন্দরী হয়। গোলাম রসুল বলত যদি শিখ পুরুষগুলোকে তাদের বউ আর মেয়েদেরকে রেখে পাঞ্জাব থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যেত তা হলে আর মুসলমানদেরকে হুরপরীর খোঁজে বেহেশতে যাবার দরকার হত না।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ধাওয়া খেয়ে শিখরা কাপুরুষের মত পালিয়ে গেছে পুব পাঞ্জাবে। এখানকার মুসলমানরা ছিল দুর্বল এবং অপ্রস্তুত। তাই শিখরা তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা শুরু করে

দিল। হাজার হাজার মুসলমান শাহাদাত বরণ করল, তাদের রক্তের নহর বইল। হাজার হাজার মুসলিম নারীকে নগ্ন করে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নেওয়া হলো। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে বিপুল পরিমাণে শিখ পালিয়ে এসে ঢুকে পড়ল দিল্লিতে, পরিষ্কার বোঝা গেল এবার রাজধানীতে গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। তক্ষুণি পাকিস্তানে চলে যাবার মত প্রস্তুতি আমার ছিল না। তবে স্ত্রী এবং বাচ্চাদেরকে আকাশ পথে, আমার বড় ভাইসহ পাঠিয়ে দিলাম, নিজের ভাগ্য সঁপে দিলাম খোদার হাতে। প্লেনে বেশি মালপত্র পাঠাতে পারিনি। তাই ফার্নিচারসহ অন্যান্য জিনিসপত্র পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য একটি গোটা রেলওয়ে ওয়াগন ভাড়া করলাম। কিন্তু যেদিন মালপত্র তুলতে যাব, শুনলাম পাকিস্তানের পথে যাত্রা করা ট্রেনে হামলা চালাচ্ছে শিখ লুটেরারা। আমার আর মালপত্র পাঠানো হলো না। ওগুলো রয়ে গেল দিল্লির বাসায়।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করল ভারত। ভারতের স্বাধীনতা দিবস তো আমার কী! সারা দিন বিছানায় গড়াগড়ি দিলাম আর পড়ে ফেললাম ডন ও পাকিস্তান টাইমস। দুটি পত্রিকাই অত্যন্ত জোরাল ভাষায় ভারত যেভাবে স্বাধীন হয়েছে তার সমালোচনা করে উপসংহার টেনেছে হিন্দু আর ব্রিটিশরা মিলে ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের নেতা, মহান মোহম্মদ আলী জিন্নাহ তাদের ষড়যন্ত্র টের পেয়ে তা নস্যাৎ করে মুসলমানদের জন্য জিতে নিয়েছেন পাকিস্তান। ইংরেজরা হিন্দু আর শিখদের চাপে পরাজয় স্বীকার করে ভারতকে অমৃতসর দিতে বাধ্য হয়েছে। অথচ পৃথিবী জানে অমৃতসর সম্পূর্ণ একটি মুসলিম নগরী। এর বিখ্যাত স্বর্ণ মসজিদ...নাকি স্বর্ণ মন্দিরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললাম কথাটি! —নাহ্, স্বর্ণ মসজিদ তো দিল্লিতে। দিল্লিতে স্বর্ণ মসজিদের সাথে রয়েছে জামে মসজিদ, লাল কেল্লা, নাজিমউদ্দিন ও সম্রাট

হুমায়ূনের জাঁকাল সমাধি, সফদর জং-এর কবর ও স্কুল—সবকিছুই ইসলামী শাসনের পরিচয় বহন করছে। এমনকী এই দিল্লিকেও (এ শহরের প্রতিষ্ঠাতা মুসলমান শাসক শাহজাহানের নামে শাহজাহানাবাদ রাখাই আসলে ঠিক ছিল) হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের পতাকা ওড়ানোর যন্ত্রণা ও অবমাননা সইতে হয়েছে।

আমার বুক যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল এসব কথা ভেবে। আমার দুঃখের পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল যখন বুঝতে পারলাম এই দিল্লি, যা একসময় ছিল ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, তাকে আজ আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন থেকে আমাদেরকে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের মরুভূমিতে বর্বর, অসভ্য লোকজনের সঙ্গে বাস করতে হবে। আমাদেরকে যেতে হবে এমন এক দেশে যেখানকার লোকেরা শুদ্ধ উর্দুই বলতে পারে না; যেখানে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের মত ঢোলা সালোয়ার পরে, খায় চার পাউন্ড ওজনের একেকটা মোটা রুটি। অথচ আমরা বাড়িতে ফিনফিনে পাতলা রুটি খেয়ে অভ্যস্ত।

নিজেকে শক্ত করলাম আমি। এটুকু কষ্ট করতেই হবে আমার মহান নেতা জিন্নাহ এবং আমার নতুন দেশ পাকিস্তানের জন্য। যদিও দিল্লি ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না।

সন্ধ্যা বেলায় ঘর থেকে বেরিয়েছি, আমার শিখ প্রতিবেশী কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে বললেন, 'ভাইসাব, আজ আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে যাননি?' ইচ্ছা করল ব্যাটার দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিই।

একদিন সকালে খবর ছড়িয়ে পড়ল পুরানো দিল্লিতে দাঙ্গা বেধে গেছে। করল বাগে মুসলমানদের বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাঁদনী চকে মুসলমানদের দোকান লুট হয়েছে। এই হলো হিন্দু আইনের উদাহরণ! আপন মনে বললাম, 'নয়া

দিল্লি সত্যিকারের ইংরেজ নগরী; লর্ড মাউন্টব্যাটন এখানে সর্বাধিনায়ক হিসেবে বাস করেন, অন্তত নয়া দিল্লিতে কেউ মুসলমানদের গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না।' নিজের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি অফিসে রওনা দিলাম। প্রভিডেন্ট ফান্ডের ঝামেলাটা সেরে ফেলা দরকার। পাকিস্তানে যেতে দেরি করছি শুধু এ টাকাটা তুলবার জন্য। আমি মাত্র গোলে মার্কেটে পৌঁছেছি, অফিসের এক হিন্দু কলিগের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বলল, 'আপনি এখানে কী করছেন? শিগ্‌গির বাড়ি যান। আর ঘর থেকে বেরুবেন না। দাঙ্গাকারীরা কনাট সার্কাসে হত্যা করছে মুসলমানদেরকে।' আমি দ্রুত পা চালালাম বাড়ির দিকে।

ঘরে না ঢুকে শিখ প্রতিবেশীর বাড়ি গেলাম। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন, 'শেখজী! ভয় পাবেন না। আমি বেঁচে থাকতে কেউ আপনার গায়ে হাত তুলতে পারবে না।'

আমি মনে মনে বললাম, 'লোকটার দাড়ির আড়ালে কত যে ভণ্ডামি লুকিয়ে আছে! মুসলমানরা কচুকাটা হচ্ছে জেনে এ নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে খুশিতে লাফাচ্ছে–কিন্তু মুখে সহানুভূতি দেখাচ্ছে।' এ মহল্লায় একমাত্র আমিই মুসলমান আছি, আর কেউ নেই।

তবে এ লোকদের সহানুভূতি কিংবা দয়া কোনটারই আমার প্রয়োজন নেই। আমি নিজের ঘরে ঢুকে ভাবলাম, 'মরতেই যদি হয়, অন্তত ওদের দশটাকে আগে মেরে মরব।' খাটের নীচে ডাবল ব্যারেলের বন্দুক লুকিয়ে রেখেছি। কিছু কার্তুজও আছে, কিন্তু শোবার ঘরে বন্দুক পেলাম না। বাড়ির কোথাও না। 'হুজুর কিছু খুঁজছেন?' আমার বিশ্বস্ত চাকর মোহাম্মদ জিজ্ঞেস করল।

'আমার বন্দুক কই?'

চুপ করে রইল মোহাম্মদ। কিন্তু ওর চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম হয় ও অস্ত্রটা লুকিয়ে রেখেছে কিংবা চুরি করেছে।

'জবাব দিচ্ছিস না কেন?' রেগে গেলাম আমি।

ধমক খেয়ে সত্য কথা বেরিয়ে এল। ও আমার বন্দুক চুরি করে তার এক বন্ধুকে দিয়েছে। ওরা দরিয়াগঞ্জের মুসলমানদেরকে রক্ষা করবার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করছে।

'আমরা কয়েকশো বন্দুক, প্রচুর মেসিন গান, দশটি রিভলভার আর একটা কামান জোগাড় করে ফেলেছি,' গর্বের সাথে জানাল মোহাম্মদ। 'এই নাস্তিকগুলোকে জবাই করব আমরা; জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।'

'আমার বন্দুক দিয়ে দরিয়াগঞ্জে নাস্তিকদের তোরা পুড়িয়ে মারতে পারবি বটে কিন্তু আমাকে এখানে কে বাঁচাবে? এই বুনো জানোয়ারগুলোর মধ্যে আমি একা মুসলমান। আমি খুন হয়ে গেলে কে তার দায়-দায়িত্ব নেবে?'

মোহাম্মদকে হুকুম দিলাম দরিয়াগঞ্জ থেকে আমার বন্দুক আর শ'খানেক কার্তুজ নিয়ে আসতে। তবে ছোকরা চলে যাবার পরে মনে হলো ও আর এদিকে পা মাড়াচ্ছে না। আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। ম্যান্টলপিসের উপরে পারিবারিক একটি ছবি আছে। আমার স্ত্রী আর বাচ্চারা নীরবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ছবিটি দেখে বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল, চোখ ভরে গেল পানিতে। এ জীবনে হয়তো আর ওদের সঙ্গে দেখা হবে না ভেবে। তবু সান্ত্বনা পেলাম চিন্তা করে পাকিস্তানে ওরা ছহি সালামতে আছে। হায়, কেন মরতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার লোভ করেছিলাম? কেন ওদের সঙ্গে চলে গেলাম না? এমন সময় তুমুল একটা হল্লার শব্দ শুনতে পেলাম।

'সৎ শ্রী আকাল...'

'হর হর মহাদেব...'

চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ক্রমে কাছিয়ে এল। এরা দাঙ্গাবাজ–আমার মৃত্যু সমন নিয়ে আসছে। আমি যেন এক

আহত হরিণ, প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছি এদিক-ওদিক, শিকারীরা দল বেঁধে পিছু নিয়েছে। পালাবার পথ নেই। দরজা খুব পাতলা কাঠ আর কাঁচ দিয়ে তৈরি। প্রবল এক ধাক্কাতেই ভেঙে যাবে।

'সৎ শ্রী আকাল...'

'হর হর মহাদেব...'

ওরা আরও কাছে এসে পড়েছে, মৃত্যুও সমান পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়বার শব্দ। আমার শিখ প্রতিবেশী ভিতরে ঢুকলেন, 'শেখজী, এক্ষুণি আমার বাড়িতে চলুন।' আমি কিছু না ভেবেই শিখের বারান্দার দিকে ছুটলাম, লুকিয়ে পড়লাম থাম্বার আড়ালে। একটা গুলি ছুটে এল। বিঁধল আমার মাথার উপরের দেয়ালে। একটা ট্রাক দেখতে পেলাম। জনা বারো তরুণ লাফিয়ে নামল ট্রাক থেকে। তাদের নেতার হাতে একটা ফর্দ—'কোয়ার্টার নাম্বার আট—শেখ বুরহান উদ্দিন।' আমার নাম পড়ল সে। দলকে নির্দেশ দিল আগে বাড়তে। আমার বাড়িতে হামলা চালাল তারা। আমার চোখের সামনে তছনছ করতে লাগল সাজানো সংসার। আমার আসবাব, বাক্স, ছবি, বই, কার্পেট, এমনকী নোংরা লিনেনগুলো পর্যন্ত ট্রাকে তুলে নিল। দস্যু! লুটেরা! বদমাশ!

শিখ বুড়ো, যিনি আমাকে সহানুভূতি দেখানোর ভান করছিলেন ইনিও কম লুটেরা নন। দাঙ্গাবাজদেরকে তিনি বলছিলেন, 'ভায়েরা, থামো! আমাদের প্রতিবেশীর জিনিসপত্রের উপরে আমারও দাবি আছে। লুটের ভাগ আমাদেরকেও দিতে হবে।' তিনি ইশারা করলেন তার ছেলে মেয়েদেরকে। তারা যে যা পারল হাতে করে নিয়ে এল। একজন আনল আমার ট্রাউজার্স; আরেকজন একটি সুটকেস।

ওরা এমনকী আমাদের পারিবারিক ছবিটিও বগলদাবা করল।

লুটের মাল নিয়ে ছুটল নিজেদের ঘরে।

হারামজাদা শিখ! খোদা যদি এ যাত্রা রক্ষা করে তা হলে তোর একদিন কি আমার একদিন। কিন্তু এ মুহূর্তে প্রতিবাদ করবারও উপায় নেই। দাঙ্গাবাজরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র, আর আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যদি আমার উপস্থিতি টের পেয়ে যায়...

বুড়ো শিখের হাতের খোলা কৃপাণের দিকে আমার নজর আটকে গেল। উনি আমাকে ঘরে যেতে ইশারা করছেন। আমার জিনিস লুট করে হাত নোংরা করবার পরে লোকটাকে আরও ভয়ঙ্কর লাগছে। তার হাতের ঝলসানো কৃপাণের ফলা আমাকে নিয়তির প্রতি আহ্বান করছে। এখন আর বিবাদ করবার সময় নেই। দাঙ্গাবাজদের বন্দুকের গুলি কিংবা বুড়োর কৃপাণ যে কোন একটিকে আমার বেছে নিতে হবে। সশস্ত্র গুণ্ডাদের সম্মিলিত আক্রোশ থেকে বুড়োর কৃপাণই বরং ভাল ভেবে ইতস্তত ভঙ্গিতে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলাম।

'এখানে নয়, ভেতরে চলুন,' আমি ভিতরের ঘরে ঢুকলাম, কসাইয়ের পেছন পেছন যেভাবে ছাগল যায়। কৃপাণের ফলার ঝলসানিতে চোখ অন্ধ হবার জোগাড়।

'এই যে আপনার জিনিসপত্র। নিন,' বললেন শিখ।

তিনি এবং বাচ্চারা যে সব জিনিস লুট করবার ভান করে এনেছিলেন সমস্ত কিছু আমার সামনে এনে রাখলেন। শিখের বৃদ্ধা স্ত্রী বললেন, 'বাবা, আমি দুঃখিত। এর বেশি কিছু উদ্ধার করতে পারিনি।'

আমি বিস্ময়ে হতবাক। মুখে কোন কথা জোগাল না।

লুটেরার দল আমার স্টীলের আলমারি টেনে বের করে এনেছে ঘর থেকে, ওটা ভাঙবার চেষ্টা করছিল। শুনতে পেলাম একজন বলছে, 'চাবি পাওয়া গেলে খুলতে আর সমস্যা হত না।'

'চাবির খোঁজ মিলবে শুধু পাকিস্তানে। কাপুরুষের বাচ্চা

মুসলমানটা পিঠটান দিয়েছে।'

প্রতিবাদ করল ছোট্ট মোহিনী, 'শেখজী কাপুরুষ নন। আর তিনি পাকিস্তানেও পালিয়ে যাননি।'

'তা হলে ব্যাটা মুখ লুকিয়েছে কোথায়?'

'তিনি কেন মুখ লুকোতে যাবেন? তিনি আছেন... বলেই মোহিনী বুঝতে পারল মস্ত ভুল করে ফেলেছে। চুপ হয়ে গেল সে। তার বাবার চেহারা লালচে হয়ে উঠল। তিনি ভিতরের ঘরে আমাকে তালা মেরে রাখলেন, ছেলের হাতে কৃপাণ ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দাঙ্গাবাজদের মুখোমুখি হতে।

বাইরে এরপরে কী ঘটেছে ঠিক বলতে পারব না আমি। শুধু দুমদাম ঘুসির শব্দ শুনতে পেলাম; তারপর ভেসে এল মোহিনীর কান্নার আওয়াজ; শিখ পাঞ্জাবী ভাষায় তারস্বরে গালাগাল দিতে লাগলেন। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ আর শিখ কাতরে উঠলেন 'হা!' বলে।

শুনতে পেলাম ট্রাক স্টার্ট নিচ্ছে; তারপর আশ্চর্য নীরবতা নেমে এল।

তালা খুলে আমাকে ঘর থেকে যখন বের করে আনা হলো· দেখলাম শিখ দড়ির খাটিয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর পাশে ছেঁড়া, রক্তমাখা জামা। পরনের নতুন জামা বেয়েও রক্ত ঝরছে। তাঁর ছেলে গেছে ডাক্তারকে ফোন করতে।

'সর্দারজী, এ আপনি কী করেছেন?' জানি না কীভাবে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল কথাগুলো। এতদিন ধরে যে ঘৃণার রাজ্যে বাস করে এসেছি, এক লহমায় তা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

'সর্দারজী, আপনি কেন এ কাজ করতে গেলেন?' প্রশ্ন করলাম আবার।

'বেটা, তোমার কাছে আমার একটা ঋণ ছিল।'

'কীসের ঋণ?'

'রাওয়ালপিণ্ডিতে তোমার মত একজন মুসলমান তার জীবন দিয়ে আমাকে আর আমার পরিবারের সম্মান রক্ষা করেছিল।'

'তার নাম কী, সর্দারজী?'

'গোলাম রসুল।'

নিয়তি কী দারুণভাবে খেলল আমাকে নিয়ে! দেয়াল ঘড়িটি বেজে উঠল...১...২...৩...৪...৫...শিখ মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন ঘড়ির দিকে। হাসি ফুটল মুখে। বৃদ্ধকে দেখে আমার দাদার কথা মনে পড়ে গেল। দাদার মুখেও এরকম বারো ইঞ্চি লম্বা দাড়ি ছিল। দু'জনের মধ্যে কী অপূর্ব মিল!

...৬...৭...৮...৯...নীরবে শুনতে লাগলাম আমরা।

আবার হাসলেন তিনি। তাঁর সাদা দাড়ি এবং লম্বা, সাদা চুল যেন অলৌকিক দীপ্তি ছড়াচ্ছে, স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত...১০...১১...১২... থেমে গেল ঘণ্টা ধ্বনি।

আমি যেন শুনতে পেলাম উনি বলছেন, 'আমাদের, শিখদের জন্যে সবসময়ই বারোটা বাজে!'

কিন্তু দাড়িঅলা ঠোঁটজোড়া এখনও হাসি হাসি দেখালেও নিশ্চুপ। আমি জানি ইতিমধ্যে তিনি দূরের এক পৃথিবীতে চলে গেছেন যেখানে ঘড়ির ঘণ্টা ধ্বনি কেউ শোনে না, যেখানে সন্ত্রাস ও উপহাস তাঁকে কখনও আঘাত করতে পারবে না।

মূল: খাজা আহমদ আব্বাস
অনুবাদ: অনীশ দাস অপু

প্রাপক: ঈশ্বর

ছোট্ট টিলার ওপর বাড়িটা–পুরো উপত্যকা জুড়ে ওই একটিই ঘর। ওখানে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালে এক চিলতে নদীটা চোখে পড়ে। আরও দেখা যায় অদূরে কোড়ালের পাশে বিস্তীর্ণ গম আর শিমের খেত। গমে পাক ধরেছে, শিম গাছগুলোও ছেয়ে গেছে ফুলে। সন্দেহ নেই, দারুণ জমপেশ একখানা ফলন হবে এবার। এখন দরকার কেবল এক পশলা বৃষ্টির। তাহলেই পোয়াবারো!

সেই সকাল থেকেই লেনচো তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছে আকাশ পানে। স্ত্রীর উদ্দেশে বলল সে, 'আর অপেক্ষা করতে হবে না, বৃষ্টি নামল বলে...'

রাতের রান্নায় ব্যস্ত স্ত্রী জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ঈশ্বর চাহে তো!'

বড় ছেলেরা পুরোদিন মাঠে কাজ করেছে, ছোটগুলো তখনও খেলছিল উঠানে। হাতের কাজ শেষ করে লেনচোর স্ত্রী তাড়া লাগাল, 'জলদি...ডিনার তৈরি।'

সবাই খেতে বসেছে মাত্র, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমে এল–যেমনটা লেনচো আশা করেছিল। উত্তরপূর্ব আকাশে কালো, পর্বতাকৃতি মেঘের সমাবেশ লক্ষ করল সে। ঠাণ্ডা, মিষ্টি বাতাসের ছোঁয়ায় তার সর্বাঙ্গে পুলকের ঢেউ খেলে গেল। তড়িঘড়ি খাওয়ার পর্ব শেষ করে উঠানে নেমে গেল সে, ছেলেমানুষের মত ভিজল কিছুক্ষণ বৃষ্টিতে। আনন্দে নেচে উঠল

মন। মনের সুখে গোসল করে তবেই সে ফিরল। পুলকিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আকাশ থেকে ঝরছে ওগুলো কেবল বৃষ্টির ফোঁটা নয়–কয়েন। বড় বড় ফোঁটাগুলো এক একটা দশ কয়েন আর ছোটগুলো পাঁচ...'

সন্তুষ্টচিত্তে তখনও সে তাকিয়ে আছে বৃষ্টির ঘন চাদরের দিকে। হঠাৎ করেই বাতাসের বেগ ভয়াবহ রকম বেড়ে গেল। প্রায় একই সাথে–কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হলো শিলাবৃষ্টি। বড় বড় টুকরোয়। ঠিক ধাতব মুদ্রার মতই দেখাচ্ছিল শিলাখণ্ডগুলোকে। ছেলেরা মনের আনন্দে দল বেঁধে নেমে পড়ল শিল কুড়োতে।

'এখন আর ভাল ঠেকছে না,' লেনচো বলল। দমে গেছে সে। 'তাড়াতাড়ি থামলেই হয়।'

গজব কিন্তু তাড়াতাড়ি থামল না। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বাড়ি, পাহাড়, খেত আর পুরো উপত্যকা জুড়ে শিলাবৃষ্টি তার তাণ্ডবলীলা চালিয়ে গেল। আশপাশের জমিন ধবধবে সাদা হয়ে পড়ল–যেন লবণ দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়েছে। গাছগুলোতে একটা পাতাও অবশিষ্ট রইল না। পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল গম খেত। শিম গাছ থেকে ঝরে পড়ল সমস্ত ফুল। লেনচোর গোটা আত্মা হাহাকার করে উঠল। অবশেষে যেন কোটি কোটি বছর পরে–শান্ত হলো প্রকৃতি। চারদিকে চেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত লেনচো বলে উঠল, 'পঙ্গপালও এত ক্ষতি করে না...কিছু অবশিষ্ট রেখে যায়। অথচ এই ঝড় আমাদের স্রেফ পঙ্গু করে দিল। এবছর না পাব গম, না পাব একরত্তি শিম...'

সেই রাতে বাড়িতে শোকের মাতম উঠল।

'সারা বছরের খাটনিটাই ভেস্তে গেল!'

'না খেয়ে মরব এবার...'

'কে সাহায্য করবে?'

একপর্যায়ে উপত্যকার একমাত্র নির্জন বাড়ির বাসিন্দাদের হৃদয়ে জেগে উঠল একমাত্র ভরসার আশা–কেবল ঈশ্বরই পারবেন তাদের রক্ষা করতে।

লেনচো সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল, 'শতকরা একশোভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা। তবে ভেঙে পড়লে চলবে না। মনে রেখো, ঈশ্বর চাইলে না খেয়ে আমাদের মরতে হবে না। তিনি সবই দেখেন। পড়তে পারেন সবার হৃদয়ের কথা–তা যত গভীরেই থাকুক না কেন।'

সে প্রকাণ্ডদেহী, মাঠে খাটতেও পারে অসুরের মত; পাশাপাশি কাজ চালানোর মত লেখাপড়াও লেনচোর জানা আছে। পরবর্তী রোববার সকালে, নিজের সাথে অনেক বোঝাপড়া করে যে রক্ষাকর্তা নিশ্চয়ই তাকে দেখবেন, সে চিঠি লিখতে বসল। সিদ্ধান্ত নিল চিঠিটা সে শহরের ডাকবাক্সে নিজ হাতে ফেলে আসবে।

চিঠিতে ঈশ্বরের কাছে লেনচো এভাবে তার আর্জি পেশ করল হে মহান ঈশ্বর, যদি তুমি স্বয়ং সাহায্য না পাঠাও, বউ ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করে মরতে হবে। জমিতে আবার বীজ বুনতে হলে আর পরবর্তী ফসল না তোলা পর্যন্ত খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চাইলে কম করেও একশো পেসো লাগবে। শিলা বৃষ্টিতে যে ক্ষতি হয়েছে...

খামের উপর লিখল প্রাপক ঈশ্বর। চিঠিটা খামে ভরে আঠা লাগাল, এরপর রওনা দিল শহরের উদ্দেশে। ডাকবাক্সে খামটা ফেলার আগে একটা স্ট্যাম্প কিনে ওটার ওপর সেঁটে দিতেও লেনচো ভুলল না।

পোস্টম্যান প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে খামটা তার বসের হাতে তুলে দিল। দীর্ঘ কর্মজীবনে উপরঅলার কাছে চিঠি বিলি করার দায়িত্ব কখনও তার কাঁধে চাপেনি। মোটাসোটা, অমায়িক

চেহারার পোস্টমাস্টারও একচোট হেসে নিলেন। তবে শিগ্‌গিরই সামলে উঠলেন তিনি। চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে গম্ভীর সুরে বললেন, 'একেই বলে বিশ্বাস! কতখানি আস্থা আর বিশ্বাস থাকলে তবেই না ঈশ্বরের কাছে কেউ চিঠি লিখতে পারে। আহা, সেই বিশ্বাসের সিকি পরিমাণও যদি আমার থাকত...এই অলৌকিক বিশ্বাসের মূলে কিছুতেই কুঠারাঘাত পড়তে দেয়া যেতে পারে না! এর একটা জবাব তৈরি করতেই হবে।'

কিন্তু চিঠিটা বের করে বক্তব্য পড়ামাত্র তিনি বুঝলেন—কেবল কাগজ, কলম আর কিছু ভারি ভারি কথাবার্তা দিয়ে জবাব তৈরি করা যাবে না। পত্রপ্রেরকের নগদ সাহায্য দরকার। দয়ালু পোস্টমাস্টার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্মচারীদের ডাকলেন। উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করে যার যতটুকু সাধ্যে কুলোয় সেভাবে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানালেন তিনি, নিজেও বেতন থেকে কিছু অংশ আলাদা করে রাখলেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে 'একটি পরহিতৈষীকর কার্যক্রমের' জন্য অনুদান চাইলেন দয়ালু পোস্টমাস্টার।

এত কিছুর পরেও পুরো একশো পেসো জমল না—কিছু কম পড়ে গেল। একটা খামের ভেতরে সংগৃহীত টাকাগুলো ভরলেন তিনি। একটুকরো কাগজও পুরে দিলেন ওটার ভেতরে। কাগজের ওপর একটি মাত্র শব্দই লেখা ঈশ্বর।

পরবর্তী রোববারে লেনচো পুনরায় হাজির হলো পোস্ট অফিসে। সকাল সকালই চলে এসেছে সে, উদ্দেশ্য—ঈশ্বর কোন জবাব পাঠালেন কিনা তার খোঁজ নেয়া। পোস্টম্যান নিজ হাতে তার হাতে খামটা তুলে দিল। দরজায় দাঁড়িয়ে পোস্টমাস্টারও লক্ষ করছিলেন—খামটা হাতে পেয়ে কতখানি খুশি আর সন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠতে লাগল লেনচোর চোখে মুখে।

খামের ভেতর টাকা দেখে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলো না সে।

এমনি এমনি তো সে ঈশ্বরের ওপর অগাধ আস্থা পোষণ করেনি। টাকা গোনা শেষ হতেই রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল লেনচো। ঈশ্বরের তো এতবড় ভুল হতে পারে না। জরুর ডাল্‌মে কুছ কালা হ্যায়!

লেনচো দ্রুত জানালার কাছে এসে পোস্টমাস্টারের কাছ থেকে কাগজ কলম চেয়ে নিল, পাবলিক টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে খসখস শব্দে কলম চালাল সে। ঝটপট লেখা শেষ করে স্ট্যাম্প কিনল। আঠা মেখে প্রচণ্ড এক মুষ্ঠ্যাঘাতে খামের ওপর বসিয়ে দিল ওটা।

পোস্টমাস্টারের তর সইছিল না। ডাকবাক্সে চিঠিটা ফেলে লেনচো অদৃশ্য হওয়ামাত্র ছুটে এসে ওটা হস্তগত করল সে। ওখানে লেখা

'হে দয়াময় ঈশ্বর, আমার চাহিদা ছিল একশো পেসোর অথচ পেলাম কিনা সত্তুর! বাকিটাও, হে প্রভু, দয়া করে চট্‌জলদি পাঠিয়ে দাও। খুব কম করেই চেয়েছিলাম আমি, এর নীচে সত্যি সত্যিই পোষাবে না আমার। তবে ভুলেও টাকাটা ডাকে পাঠিও না, প্রভু। ডাকঘরের ওদেরকে তো চেনই–সব একেকটা চোরচামুণ্ডা! বিনীত–লেনচো।'

মূল: গ্রেগোরিয় লোপেজ ফুয়েন্তস্
রূপান্তর: মাহবুবুর রহমান শিশির

মাদমোয়াজেল ফিফি

প্রাশান সেনাপতি মেজর গ্রাফ ফন ফার্লসবার্গ বড় একটা ইজি চেয়ারে বসে নিজের কাছে আসা চিঠি পড়ছিলেন। শ্যাতো Uville দখল করার পর থেকে আজ তিন মাস তিনি এই চেয়ারে বসে কাজ করছেন। সুন্দর মার্বেল পাথরের পা-দানীর ওপর বুটসমেত পা রাখতে রাখতে দাগ হয়ে গেছে। দাগ দুটো দিনে দিনে আরও গাঢ় হচ্ছে।

তার সামনে একটা ছোট নকশা করা টেবিলে এক কাপ ধূমায়িত কফি রাখা আছে। টেবিলটা মদের দাগ আর সিগারের আগুনে পোড়া। মাঝে মাঝে এই বিজয়ী অফিসার পেন্সিল কাটার ছুরি দিয়ে টেবিলের ওপর নানা রকম নকশা আঁকেন।

চিঠিপত্র এবং জার্মান সংবাদপত্র পড়া শেষ হলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আগুনে দু'তিনটে কাঠ ছুঁড়ে দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। সাধারণ নরম্যাণ্ডির বৃষ্টি। দেখে মনে হচ্ছে কোনও পাগল আকাশ থেকে পানি ঢেলে দিচ্ছে।

অফিসার দীর্ঘ সময় ধরে সামনের ভেজা মাঠ আর পানিতে টইটম্বুর আন্দেল নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। জানালার কাঁচের ওপর আঙুল দিয়ে নাচের বাজনা বাজাতে লাগলেন। হঠাৎ একটা শব্দ হতে ঘুরে পেছনে তাকালেন। দেখলেন তাঁর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, ক্যাপ্টেন ব্যারন ভ্যান কেলওয়েইনস্টেন দাঁড়িয়ে আছেন।

মেজর দেখতে বিশালাকৃতির। প্রশস্ত কাঁধ, লম্বা দাড়ি বুকের ওপর পর্দার মত ছড়িয়ে আছে। নীল চোখে ঠাণ্ডা আর নরম দৃষ্টি। গালে একটা কাটা দাগ আছে, অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে তলোয়ারের আঘাতে কেটেছিল। তবে শুধু বীর যোদ্ধা হিসেবে নয়, ভাল মানুষ হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে।

আর ক্যাপ্টেন খাটো, লালমুখো মানুষ। কোমরের বেল্টটা শক্ত করে বাঁধা। মাথা ভর্তি লাল চুল, বিশেষ আলোতে দেখলে মনে হয় তিনি বুঝি ওতে ফসফরাস লাগিয়েছেন। মাথায় চকচকে টাকের চারপাশে লাল কোঁকড়া চুল চকচক করছে। অতীতে কোনও এক রাতে তার সামনের দুটো দাঁত ভেঙে যায়। তাই কথাগুলো ভাল বোঝা যায় না।

ক্যাপ্টেনের সাথে করমর্দন করলেন মেজর। তারপর ষষ্ঠ বারের মত কফির কাপে চুমুক দিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে দিনের কার্য বিবরণী শুনতে লাগলেন। তাঁরা দুজনেই জানালার কাছে গিয়ে একমত হলেন যে দিনটি খুবই খারাপ।

মেজর খুবই শান্ত স্বভাবের মানুষ, বাড়িতে স্ত্রী আছে, আর যে-কোনও কিছুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন লোকটি চঞ্চল প্রকৃতির। সব সময় হৈ-হুল্লোড়ে মেতে থাকেন আর নারী সঙ্গ পছন্দ করেন। তিন মাস এই বিশ্রী জায়গায় পড়ে থাকতে হচ্ছে বলে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না।

দরজায় নক্ করার শব্দ হলো। মেজর বললেন, 'ভেতরে এসো।'

পরিচারক ঘরে প্রবেশ করে ঘোষণা করল নাস্তা প্রস্তুত। ডাইনিং রুমে তিনজন নিম্ন পদস্থ অফিসারের সাথে তাদের দেখা হলো। এদের মধ্যে একজন হলো লেফটেন্যান্ট অটো ফন গ্রসলিং আর অপর দুজন সাব লেফটেন্যান্ট ফ্রিট্জ্ শিউনবার্গ ও ব্যারন ফন আইরিক। এদের মধ্যে ব্যারন ফন আইরিক খুব খাটো,

চুলগুলো সোনালী। অত্যন্ত অহংকারী আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। বন্দিদের প্রতি খুবই নির্দয়, যেন বিস্ফোরণোন্মুখ বারুদ।

ফ্রান্সে আসার পর থেকেই তার সহকর্মীরা তাকে মাদমোয়াজেল ফিফি নামে ডাকে। তার পোশাকের চাকচিক্য, সরু কটি, নীরস মলিন মুখ আর সব মানুষের প্রতি সার্বক্ষণিক ঘৃণা–যেটাকে ফরাসি ভাষায় 'Fi, fi donc' বলে–এসব কারণে সহকর্মীরা তাকে এই নামে ডাকে।

শ্যাতোর ডাইনিং রুমটা লম্বা ও চমৎকার। দেয়ালে টাঙানো বড় আয়নাগুলোতে বুলেটের ক্ষত আর কারুকাজ করা ফ্লেমিশ পর্দাগুলোর শতচ্ছিন্ন অবস্থা দেখে বোঝা যায় মাদমোয়াজেল ফিফি অবসরে একাজ করেই কাটায়।

দেয়ালে তিনটা পারিবারিক পোর্ট্রেট ঝোলানো আছে–স্টিলের পোশাক পরা একজন নাইট, এক কার্ডিনাল এবং জনৈক রাজা। প্রত্যেকেই লম্বা পাইপ দিয়ে ধূমপান করছে। এগুলোর মধ্যে রাজার ছবিতে কে যেন কয়লা দিয়ে লম্বা গোঁফ এঁকে দিয়েছে।

অফিসাররা নীরবে নাস্তা খেতে লাগল। খাওয়া শেষ করে ধূমপান শুরু করল। ব্র্যাণ্ডির বোতল থেকে গ্লাসে নিল প্রত্যেকে। মাদমোয়াজেল ফিফি একটু পর পর গ্লাস খালি করছে, হঠাৎ ক্যাপ্টেন ব্যারন ভ্যান কেলওয়েইনস্টেন বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠলেন, 'হেভেনস্! এভাবে আর চলতে পারে না। আমাদের কিছু একটা করা উচিত।'

একথা শুনে লেফটেন্যান্ট অটো এবং দুই সাব-লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞেস করল, 'কী করব, ক্যাপ্টেন?'

কিছুক্ষণ ভেবে ক্যাপ্টেন বলল, 'কী করব? কেন, মেজর যদি অনুমতি দেন তা হলে একটা পার্টির ব্যবস্থা করতে পারি।'

'কী ধরনের পার্টি?' মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মেজর।

'সব ব্যবস্থা আমি করব, স্যর,' ব্যারন বলল। 'লে ডেভয়-কে আমি রুয়েনে পাঠাব। আমাদের জন্য কয়েকটা মেয়ে নিয়ে আসবে ও। ওদেরকে কোথায় পাওয়া যাবে আমি জানি। এখানেই আমরা সাপার খাব। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব হাতের কাছেই থাকবে। সন্ধ্যাটা আমাদের চমৎকার কাটবে।'

গ্রাফ ফন ফার্লসবার্গ শ্রাগ করে হাসলেন। বললেন, 'ক্যাপ্টেন ব্যারন, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

কিন্তু অন্যান্য অফিসাররা চেয়ার ছেড়ে উঠে মেজরকে ঘিরে বলতে লাগল, 'অনুমতি দিন, মেজর। সত্যি একঘেয়ে লাগছে আমাদের।'

মেজর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'বেশ, ঠিক আছে।'

তখুনি লে. ডেভয়কে ডেকে পাঠাল ব্যারন। লে. ডেভয় একজন নন কমিশনড্ অফিসার যাকে কখনও হাসতে দেখা যায়নি। তবে বিনা প্রতিবাদে ওপরওয়ালার হুকুম পালন করে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ব্যারনের কথা শুনল সে। পাঁচ মিনিট পরে তারপুলিন দিয়ে ঢাকা বড় একটা মিলিটারি ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে।

অফিসারদের ভিতর সহসা এক আনন্দের উত্তেজনা জেগে উঠল। সবার চেহারা আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। প্রত্যেকেই কথা বলছে।

মাদমোয়াজেল ফিফি নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। চেয়ার থেকে উঠে আবার বসে পড়ল সে। তার চোখ ধ্বংস করার মত কিছু খুঁজছে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল নকল গোঁফ আঁকা রাজার পোর্ট্রেটের ওপর। পিস্তল বের করে বলল, 'তোমার কোন কিছু দেখা উচিত নয়।' তারপর চেয়ারে বসেই পোর্ট্রেটের দুটি চোখে নিশানা করে গুলি করল।

'এবার একটা মাইন বানাব,' সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল। ঘরের সবাই কথা বন্ধ করে তার দিকে তাকাল। ফিফির এই

কথার মানে তারা বোঝে। একটা কিছু করার আনন্দে সবার চোখ আগ্রহে চক্‌চক্‌ করছে।

শ্যাতোর মালিক কোঁত ফার্নাণ্ড ডাময় ডাভিল এ জায়গা ছেড়ে যাবার সময় কোনও জিনিস নিয়ে বা লুকিয়ে রেখে যেতে পারেননি। শুধু মাত্র কিছু সোনা একটা দেয়ালের গর্তে লুকিয়ে রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন ধনী এবং রুচিবান মানুষ। এ বাড়ির বড় ড্রইং রুমটাকে জাদুঘরের গ্যালারির মত মনে হয়। দেয়ালে দামি দামি তেল রং আর জল রং-এর ছবি ঝোলানো আর টেবিলগুলোর ওপর সুন্দর দামি শোপিস সাজানো রয়েছে।

এসব দামি আসবাবপত্র চুরি হয়ে যেত কিন্তু মেজরের জন্য রক্ষা পেয়েছে। মাদমোয়াজেল ফিফির একটি শখ হলো ঘরে ঘরে মাইন পেতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সুন্দর জিনিসগুলোকে ধ্বংস করা। আর অফিসাররাও এ কাজটা খুব উপভোগ করে।

ফিফি ড্রইংরুমে একটা চায়না টিপট নিয়ে এল। টিপটে গান পাউডার দিয়ে ভরা। সতর্কতার সাথে পাত্র রেখে সলতেয় আগুন ধরিয়ে, দৌড়ে ডাইনিং রুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। জার্মান অফিসাররা কৌতূহলের সাথে অপেক্ষা করছে। সবারই মুখে হাসি। বিস্ফোরণের শব্দে পুরো বাড়িটা কেঁপে উঠলে তারা ড্রইং রুমে ছুটে এল।

সবার আগে ড্রইং রুমে ফিফিই ঢুকল। দেখল ভেনাসের একটা টেরাকোটা মূর্তির মাথা উড়ে গেছে। খুশিতে হাতে তালি দিল ফিফি। মেজর বিশাল ড্রইং রুমটার চারপাশে তাকালেন। সর্বত্র দামি শিল্পকর্মগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রুম থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তিনি হেসে বললেন, 'ভালই ধ্বংস করেছ!'

ডাইনিং রুমের বাতাস তামাক আর বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে

আছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল সবার। তাই মেজর উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিলেন। অন্যান্য অফিসাররা ফিরে এসে গ্লাসে মদ ঢেলে নিল।

বাইরে লম্বা গাছগুলো বাতাসের বেগে নুয়ে পড়ছে। আকাশের কালো মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। দূরে কুয়াশায় ঢাকা উপত্যকা দেখা যাচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গির্জার চূড়ার ঘণ্টাটাকে একটা ধূসর বিন্দুর মত দেখাচ্ছে।

জার্মানরা এ অঞ্চলের কর্তৃত্ব নেওয়ার পর এ গির্জার ঘণ্টা বাজেনি। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে তারা শুধু মাত্র এই প্রতিবাদটুকুই পেয়েছে। গির্জার ধর্মযাজক তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে কিংবা সৈন্যদের খাওয়ানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেননি। উপরন্তু কমাণ্ডারের সাথে বসে দু'এক পাত্র মদও খেয়েছেন। কিন্তু জার্মানরা বারবার বলার পরও সেই থেকে গির্জার ঘণ্টা আর বাজাননি। এভাবে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে এবং নীরবে এই আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আশপাশের পঁচিশ মাইলব্যাপী লোকদের মাঝে ধর্মযাজক অ্যাবে শ্যাণ্টাভঁয় দেশ প্রেমের এক চমৎকার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। গ্রামবাসীরা কোনও ক্ষতি না করায় প্রাশান অফিসাররা তাদের নীরব প্রতিবাদটুকু সহজভাবে মেনে নিয়েছে।

একমাত্র ফিফিই গির্জার ঘণ্টা বাজানোর জন্য যাজককে বাধ্য করতে চাইত। উর্ধ্বতন অফিসাররা যাজককে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য রাগ করত সে। মজা করার জন্য শুধুমাত্র একবার গির্জার ঘণ্টা বাজানোর জন্য মেজরের কাছে প্রায়ই অনুনয় করত। কিন্তু মেজর তার কথায় কান দেননি।

ডাইনিং রুমে পাঁচজন লোক। প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করে রইল। তারপর লেফটেন্যাণ্ট ফ্রিট্জ্ হেসে বলল, 'এই বাজে আবহাওয়ায় মেয়েদের আসতে কষ্ট হবে।'

প্রত্যেকেই যে যার কাজে চলে গেল। শুধু মাত্র ডিনারের আয়োজন করার জন্য ক্যাপ্টেন থেকে গেলেন।

সন্ধ্যার দিকে তারা যখন মিলিত হলো একজন আরেকজনকে দেখে হাসাহাসি করতে লাগল। মেজরের চুল সকালে যে রকম ধূসর দেখাচ্ছিল তারচেয়ে একটু কম লাগছে। ক্যাপ্টেন দাড়ি কামিয়েছেন কিন্তু গোঁফটা রেখে দিয়েছেন।

বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও ওরা জানালা খোলা রাখল। একটু পরপর গিয়ে শব্দ শোনার চেষ্টা করল। সোয়া ছটার দিকে ব্যারন বলে উঠলেন, তিনি গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। শুনে দরজার কাছে গেল সবাই। চার ঘোড়ায় টানা ওয়াগনটা দ্রুত দরজার কাছে এসে থামল।

পাঁচ জন সুন্দরী ওয়াগন থেকে নামল। বোঝা গেল লে ডেভয় ভালভাবেই ওদের বাছাই করেছে। যদিও প্রাশানরা এদেশ দখল করেছে তবুও যেন ওই মেয়েদের কাছে এসব কিছু না। এরা টাকা পেলেই খুশি।

মেয়েদেরকে নিয়ে সবাই ডাইনিং রুমে এল। ডাইনিং রুমে আলো জ্বলছে। কিন্তু ভেতরের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এক দল ডাকাত, ডাকাতি করার পর কোনও পান্থশালায় দামি পাত্রে খেতে বসেছে।

ক্যাপ্টেনের চেহারা খুশিতে জ্বলজ্বল করছে। মেয়েদের কাঁধে এমনভাবে হাত রাখছে যেন ওদেরকে কত দিন ধরে চেনে। ছোট অফিসাররা নিজেদের জন্য যখন মেয়েদের পছন্দ করতে চাইল, সে তখন মেয়েদের ভার নিল। পদবী অনুসারে বড় থেকে ছোট অফিসারদের মাঝে মেয়েদের বণ্টন করতে চাইল। এজন্য উচ্চতা অনুযায়ী মেয়েদের লাইন করে দাঁড় করাল।

'তোমার নাম কী?' সবচেয়ে লম্বা মেয়েটিকে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন।

'পামেলা,' মেয়েটা উঁচু কণ্ঠে জবাব দিল।

'এক নম্বর মেয়ে পামেলা, মেজরকে দেয়া হলো,' ক্যাপ্টেন বললেন। তারপর ব্লণ্ডিনা নামের মেয়েটিকে চুমু খেয়ে বুঝিয়ে দিল সে একে গ্রহণ করেছে। আমাণ্ডাকে দেয়া হলো লেফটেন্যান্ট অটো-কে। ইভাকে পেল সাব-লেফটেন্যান্ট ফিট্জ্। আর মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে খাটো র‍্যাচেলকে পেল ফিফি। র‍্যাচেলের চোখ দুটো গাঢ় কালো, উন্নত নাক আর খুব স্বাস্থ্যবতী। মেয়েরা সবাই সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। প্রত্যেকেই এই কাজে অভিজ্ঞ।

জুনিয়র তরুণ তিন অফিসার তখুনি মেয়েদের নিয়ে নিজ নিজ ঘরে যেতে চাইল। কিন্তু ক্যাপ্টেন অভিজ্ঞ লোকের মত ওদের বাধা দিলেন। তিনি সবাইকে ডিনারে বসতে বললেন। আপাতত শুধু চুমুর মধ্যেই সবাইকে সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

হঠাৎ র‍্যাচেল কাশতে শুরু করল। কাশতে কাশতে তার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে পড়েছে। কারণ তাকে চুমু খেতে গিয়ে ফিফি এক রাশ ধোঁয়া তার মুখে ভরে দিয়েছে। র‍্যাচেল রেগে গেল না বা কোনও কথা বলল না। শুধু অগ্নিদৃষ্টিতে ফিফির দিকে তাকাল।

সবাই খেতে বসল। মেজরকে খুব প্রসন্ন দেখাচ্ছে। তাঁর বাম পাশে বসেছে পামেলা আর ডান পাশে ব্লণ্ডিনা। তিনি রুমালের ভাঁজ খুলতে খুলতে বললেন, 'আপনার বুদ্ধিটা খুব চমৎকার, ক্যাপ্টেন।'

লেফটেন্যান্ট অটো আর ফ্রিট্জ্ একটু লাজুক প্রকৃতির। তারা বেশি কথা বলল না। শুধু ক্যাপ্টেনই ভাঙা ভাঙা ফরাসি ভাষায় নানা রকমের কথা বলে ঠাট্টা তামাশা করে আসর জমিয়ে রাখলেন। তাঁর ফোকলা দাঁতের সব কথা মেয়েরা বুঝতে পারছিল না। তবুও দু'একটা স্থূল রসিকতার কথা বুঝতে পেরে হাসছিল।

মেয়েরা ওয়াইনের প্রথম বোতলটা শেষ করেই নিজেদের স্বভাব

মত কাজ করতে লাগল। ডান বা বাম দিকে বসা অফিসারদের চুমু দিতে লাগল, তাদের গায়ে চিমটি কাটতে লাগল। কখনও বুনো কণ্ঠে চিৎকার করল, কখনও বা ফরাসি কবিতা আবৃত্তি করল। আবার কখনও শত্রু সৈনিকদের কাছ থেকে শেখা এক-আধটা জার্মান গান গাইতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে অফিসাররাও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। চিৎকার করে প্লেট ভাঙতে লাগল। তবে মেজর নিজের সংযম বজায় রেখে স্থির হয়ে বসে রইলেন।

মাদমোয়াজেল ফিফি তার কোলে র‍্যাচেলকে বসিয়ে উত্তেজিত হয়ে কখনও ঘাড়ে চুমু খেতে লাগল, কখনও বা জোরে চিমটি দিল। একটু পর ব্যথায় র‍্যাচেল চিৎকার করে উঠে সাবধান করল ফিফিকে। কিন্তু ফিফি পাগল হয়ে উঠেছে। এক পর্যায়ে আরও হিংস্র হয়ে উঠে ফিফি র‍্যাচেলের ঠোঁটে এমনভাবে কামড় দিল যে রক্ত বেরিয়ে গেল। ব্যথায় অস্পষ্ট চিৎকার বের হলো র‍্যাচেলের মুখ থেকে। থুতনি বেয়ে জামার ওপর রক্তের ফোঁটা পড়ল।

দ্বিতীয় বারের মত সে ফিফির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এজন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে।'

নিষ্ঠুর হাসি হেসে ফিফি বলল, 'আমিও তাই চাই।'

খাবার পর শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হলে মেজর উঠে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশে বললেন, 'মেয়েদের উদ্দেশ্যে'। তিনি এমনভাবে কথাটা বললেন যেন সম্রাজ্ঞী অগাস্টার সামনে বসে শ্যাম্পেন পান করছেন। সবাই টোস্ট করতে লাগল। মেয়েরা নেশার ঘোরে বসে থাকতে পারছে না যেন। অফিসারদের যে কোন কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

ক্যাপ্টেন শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে ধরে বললেন, 'আমাদের বিজয়ের আনন্দে...'

তারপর লেফটেন্যান্ট অটো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের

গ্লাস উঁচু করে বলল, 'ফ্রান্সের ওপর আমাদের বিজয় গৌরবের স্মরণে...'

মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকায় মেয়েরা চুপ করে থাকল। কিন্তু র‍্যাচেল বলে উঠল, 'আমি জানি, বহু ফরাসি আছে যাদের সামনে একথা বলার সাহস তোমরা পাবে না।'

হাসতে লাগল ফিফি। মদের নেশা তাকে ভালই পেয়েছে। বলল, 'হা! হা! হা! এরকম কারও সাথেই আমার দেখা হয়নি। আমাদেরকে দেখলেই ওরা পালিয়ে যায়!'

র‍্যাচেল রেগে বলল, 'মিথ্যা কথা বলছ, নোংরা বদমাশ।'

ফিফি তার দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। পিস্তলের গুলিতে একটা পোর্ট্রেট ধ্বংস করার সময় তার চোখে যেরকম দৃষ্টি থাকে এখন সে দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। সে হেসে বলল, 'আহ্! এভাবে কথা বলছ কেন, মাই ডিয়ার! ওরা যদি সাহসী হত তা হলে কি আমরা এখানে থাকতে পারতাম?' সে আরও উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'আমরা এখন ওদের প্রভু! ফ্রান্স এখন আমাদের!'

আর সবাই যারা নীরবে পান করছিল, হঠাৎ সবার মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠল। সবাই গ্লাস উঁচু করে চিৎকার করে বলল, 'লং লিভ প্রাশা।' তারপর এক চুমুকে গ্লাস খালি করল।

মেয়েরা ভয়ে কোনও প্রতিবাদ করল না। চুপচাপ বসে রইল। এমনকী র‍্যাচেলও কোনও কথা বলল না।

তারপর ফিফি আবার গ্লাস ভরে র‍্যাচেলের মাথার ওপর ধরে বলল, 'ফ্রান্সের সব মেয়েই আমাদের।'

হঠাৎ দ্রুত উঠে দাঁড়াল র‍্যাচেল। ধাক্কা লেগে গ্লাসের শ্যাম্পেন তার চুলে পড়ল এবং গ্লাসটা মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। র‍্যাচেলের ঠোঁট কাঁপছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিফির দিকে তাকাল। ফিফি হাসছে দেখে র‍্যাচেল তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল,

'একথা—একথা সত্যি নয়। তোমরা কখনোই ফ্রান্সের সব মেয়েকে পাবে না।'

ফিফি হাসতে হাসতে বলল, 'ও ভাল, খুব ভাল। তা হলে এখানে তুমি কেন এসেছ, মাই ডিয়ার?'

র‍্যাচেল বজ্রাহতের মত চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। প্রথমটায় ফিফির কথা বুঝতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরে কণ্ঠে ঘৃণা মিশিয়ে বলল, 'আমি—আমি ভদ্রমহিলা নই। আমি একজন বেশ্যা। আর জেনে রেখো, প্রাশান সৈনিকদের ভাগ্যে বেশ্যারাই জুটবে। সত্যিকারের ফরাসি নারীকে তারা কোনদিন পাবে না।'

র‍্যাচেলের কথা শেষ হতে না হতেই ফিফি তাকে প্রচণ্ড এক চড় মারল। মারার জন্য আবার হাত তুলতে যাচ্ছিল কিন্তু র‍্যাচেল রাগের মাথায় সেই মুহূর্তে টেবিলের ওপর থেকে একটা ছুরি তুলে নিয়ে ফিফির গলায় আমূল বসিয়ে দিল। ফিফি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তা আর বলা হলো না। মুখ অর্ধেক খোলা অবস্থায় সে চেয়ারের ওপর নেতিয়ে পড়ল। চোখে আতঙ্কিত দৃষ্টি।

অফিসাররা সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার করছে। বিশৃংখলভাবে সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠতে শুরু করল। কিন্তু লেফটেন্যান্ট অটোর পায়ে চেয়ার ছুঁড়ে মেরে জানালার দিকে দৌড়ে গেল র‍্যাচেল। অন্য কেউ তার কাছে এগিয়ে যাবার আগেই জানালা খুলে লাফ দিয়ে নীচে নেমে বৃষ্টির মধ্যে পালিয়ে গেল সে।

দুই মিনিটের মধ্যে মাদমোয়াজেল ফিফি মারা গেল।

ফ্রিট্জ্ আর অটো তলোয়ার বের করে অন্য মেয়েদের খুন করতে চাইল। মেজর অতি কষ্টে তাদের শান্ত করলেন। মেয়েরা তাদের পায়ের ওপর পড়ে ক্ষমা চাইছিল। তিনি চারজন মেয়েকে একটা ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দু'জন সৈনিককে পাহারার দায়িত্ব দিলেন। তারপর কয়েকজন সৈন্যকে পাঠালেন র‍্যাচেলকে

ধরে আনার জন্য।

খাবার টেবিল পরিষ্কার করে ফিফির মৃতদেহ তার ওপর রাখা হলো। অন্য চার অফিসার জানালার কাছে গিয়ে বৃষ্টি-ঝরা অন্ধকার রাতের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্লান্ত সৈনিকের মত তারা যেন লাশটা পাহারা দিচ্ছে।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শোনা গেল, তারপর আরেকটা। পরবর্তী চার ঘণ্টা কখনও কাছ থেকে কখনও দূর থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল।

সকালে সৈন্যরা ফিরে এল। অদৃশ্য শত্রুর গুলিতে দুইজন সৈনিক নিহত আর তিনজন আহত হয়েছে। কিন্তু তারা র‍্যাচেলকে ধরতে পারেনি।

এলাকার সমস্ত অধিবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। সবার ঘর-বাড়ি তছনছ করা হয়েছে। কড়া পাহারার ব্যবস্থা কড়া হয়েছে। কিন্তু র‍্যাচেলের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না কোথাও।

ঘটনাটা জেনারেলকে জানানো হলে তিনি চেপে যাবার হুকুম দিলেন। কারণ এ ঘটনা জানাজানি হলে সৈনিকদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। কিন্তু ঘটনার জন্য মেজরকে বকা দিলেন। মেজর তার অধীনস্থ অফিসারদের শাস্তি দিলেন।

জেনারেল বললেন, 'মজা করার জন্য কেউ যুদ্ধে যায় না। বেশ্যাদের নিয়ে ফুর্তি করার সময় এটা নয়।'

গ্রাফ ফন ফার্লসবার্গ রেগে প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু ভাবতে লাগলেন কী করা যায়। তরপর যাজককে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, ব্যারন ফন আইরিক-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় গির্জার ঘণ্টা বাজাতে হবে।

যাজক অপ্রত্যাশিত নমনীয়তার সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

যখন গুলিভর্তি রাইফেল নিয়ে সৈনিকরা মাদমোয়াজেল ফিফির মৃতদেহ শ্যাতো ডাভিল থেকে কবরস্থানে নিয়ে যচ্ছিল,

অনেকদিন পর প্রথম বারের মত গির্জার ঘণ্টাটা বেজে উঠল। এমন করুণ শব্দে বাজতে লাগল যেন কোনও বন্ধু বন্ধুর মৃত্যুতে শোক জানাচ্ছে। রাতে আবারও ঘণ্টা বাজল, পরদিন এবং তারপরে প্রত্যেক দিন। রাতের নীরবতার মাঝে ঘণ্টাটা আস্তে আস্তে টুংটাং শব্দ করে বেজে উঠল। কেউ জানে না কেন।

গাঁয়ের চাষীরা বলতে লাগল, এটা যাদুকরী ব্যাপার। যাজক আর কবরখোদক ছাড়া কেউ গির্জার কাছে যায় না। তারা ওখানে যেত কারণ একাকী, দুঃখী একজন মেয়ে ওখানে থাকত।

জার্মান সৈন্যরা এই এলাকা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওখানে লুকিয়ে ছিল সে। তারপর একদিন সন্ধ্যায় যাজক একটা রুটি প্রস্তুতকারকের গাড়ি নিয়ে মেয়েটিকে রুয়েনে নিয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে একজন দেশপ্রেমিক বীর র‍্যাচেলের দৃঢ় মনোবলের জন্য তাকে পছন্দ করে এবং তাদের মধ্যে ভালবাসা হয়। তারপর লোকটি তাকে বিয়ে করে বীরাঙ্গনার উপযুক্ত মর্যাদা দেয়।

মূলঃ গী দ্য মোপাসাঁ
রূপান্তরঃ তারক রায়

অপারেশন

ডগলাস স্টোন আর লেডি স্যানক্সের সম্পর্কটা ছিল ওপেন সিক্রেট। ব্যাপারটা কুখ্যাত মহিলাটির ফ্যাশনেবল সমাজ যেমন জানত, তেমনি জানত বিজ্ঞান-সম্পর্কিত মানুষেরা, যাদের সবাই ছিল স্টোনের গুণগ্রাহী। এক সকালে যখন শোনা গেল যে আজ থেকে লেডি স্যানক্স চিরদিনের মত অন্তরালে চলে যাচ্ছেন, কেউই আর কখনও তাঁর দেখা পাবে না, হাসি-মজার খোরাক পেয়ে সবাই আবার নড়েচড়ে বসল নতুন করে। কিন্তু ব্যাপারটা তারা হজম করার আগেই এল আরেক সংবাদ। এক সকালে ইস্পাত কঠিন স্নায়ুর অধিকারী সুবিখ্যাত সার্জনটিকে নাকি পাওয়া গেছে তাঁর সাজভৃত্যের ঘরে, বিছানায় বসে মিটিমিটি হাসছেন, দুটো পা পাজামার এক পায়ায় এক করে ঢোকানো। সাধারণ মানুষের মনে হলো, একসঙ্গে এত হাস্য-কৌতুক তাদের স্নায়ু আর সইতে পারবে না।

যৌবনে ডগলাস স্টোন ছিলেন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আরও অনেক ওপরে হয়তো উঠতেন তিনি, কারণ, এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনচল্লিশ। তাঁর কাছের মানুষেরা জানত যে শুধু সার্জন হিসেবেই নয়, ইচ্ছে করলে তিনি আরও অনেক বিষয়ে বিখ্যাত হতে পারতেন। তিনি হতে পারতেন বীর সৈনিক, দুঃসাহসী অভিযাত্রী, তুখোড় আইনজীবী, এমনকি ইঁট-পাথর নিয়ে ব্যস্ত একজন এঞ্জিনিয়ার। তিনি জন্মই

নিয়েছিলেন বিখ্যাত হবার জন্যে। ভদ্রলোক যে-পরিকল্পনা করতেন অন্য মানুষ সে-কাজ করার সাহস পেত না, আর তিনি যে-কাজ করতেন অন্য কারও পক্ষে তার পরিকল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। সার্জারিতে কেউ তাঁকে অনুসরণ করতে পারত না। তাঁর স্নায়ু, বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা কখনোই একটার সঙ্গে আরেকটা জট পাকিয়ে যেত না। খচ খচ ছুরি চলত তাঁর, লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত হার মানত মৃত্যু, আর তাঁর সাহস দেখে রোগীর মতই ফ্যাকাসে হয়ে যেত অপারেশন টেবিলের পাশে দাঁড়ানো সহকারীরা। তাঁর কর্মশক্তি, দুঃসাহস আর আত্মবিশ্বাসের স্মৃতি আজও সবার মাঝে অমলিন।

গুণের মতই লম্বা ছিল তাঁর দোষের বহর। প্রচুর আয় করতেন তিনি। লন্ডনের পেশাদার মানুষদের মধ্যে তাঁর আয়ই ছিল তৃতীয় সর্বোচ্চ, কিন্তু বিশাল সেই আয়ও তাঁর বিলাসিতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না। তাঁর জটিল চরিত্রের গভীরে ছিল অতি মাত্রার অভিজাত একজন ভোগসুখবাদী মানুষ, যাঁর চাহিদার কাছে তিনি ঢেলে দিতেন জীবনের সমস্ত উপার্জন। তাঁর চোখ, কান, স্পর্শের রুচি ছিল অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের, একবার কিছু পছন্দ হলে নিজেকে তিনি আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। পুরানো মদ, দুর্লভ বিদেশী সুগন্ধী, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মৃৎশিল্প—এসবের পেছনেই হু হু করে উড়ে যেত তাঁর বিশাল উপার্জন। আর তারপরেই হঠাৎ করে তিনি পাগল হয়ে উঠলেন লেডি স্যানক্সের জন্যে। বাঁকা চোখের কয়েকটা তীর আর ফিসফিস করে কিছু কথা তাঁর হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল। লেডি স্যানক্স ছিলেন লন্ডনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, তাঁর একমাত্র নারী। কিন্তু সার্জন লন্ডনের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ হলেও, তাঁর একমাত্র পুরুষ ছিলেন না। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভের অভ্যেস ছিল মহিলার, কেউ ধৈর্য নিয়ে তাঁর পিছু লেগে থাকলে শেষমেশ তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারতেন

না। সম্ভবত এই কারণে কিংবা এসবের প্রতিক্রিয়ায় লর্ড স্যানক্সকে পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়ের মত দেখাত, যদিও তাঁর আসল বয়স ছিল ছত্রিশ।

লর্ড ছিলেন শান্ত, নীরব, উদাসীন একজন মানুষ। পাতলা ঠোঁট, ঘন চোখের পাতা, বাগান আর বাড়ির ছোটখাট কাজকর্ম নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। একসময় খুব ভালবাসতেন তিনি অভিনয়, এমনকি লন্ডনের একটা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করেছিলেন। এই মঞ্চেই তিনি প্রথম দেখেন মিস ম্যারিয়ন ডসনকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দিতে চান নিজের কুমারত্ব, পদবি আর এক কাউন্টির এক-তৃতীয়াংশ। বিয়ের পর অভিনয়ের শখ বিস্বাদ হয়ে গেল তাঁর, ফলে মেধা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত কোন মঞ্চেও তাঁকে অভিনয়ে আর রাজি করানো যায়নি। খুনচি আর ঝাঁঝরি হাতে তিনি আনন্দের নতুন জগৎ খুঁজে নিয়েছেন অর্কিড আর ক্রিসানথিমামের মাঝে।

তাঁর কি বোধশক্তি কিংবা তেজ বলতে কিছুই নেই? নাকি তিনি সব জেনেশুনেও স্ত্রীর যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন? এসব আলোচনা নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় উঠল ড্রইং-রুমে, চুরুটের ধোঁয়া উড়ল ক্লাবঘরে।

কিন্তু ডগলাস স্টোনের সঙ্গে লেডির সম্পর্ক শুরু হতে লর্ডের জ্ঞান বা মূর্খতা নিয়ে মাথা ঘামানো বাদ দিল সবাই। সুকৌশলে কিছুই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন না স্টোন। ফলে শিগগির কলঙ্ক একেবারে ডালপালা মেলল। অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু সার্জন হিসেবে তাঁর সামাজিক মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিল, তিনি তাদের গালাগালি করে চল্লিশ গিনি দিয়ে লেডির জন্যে একটা বালা কিনলেন। প্রত্যেক বিকেলে সার্জনের গাড়িতে হাওয়া খেতে বেরোলেন লেডি, আর সন্ধ্যেয় সার্জন গেলেন লেডির বাড়িতে।

দু'জনের কারও মধ্যেই সম্পর্ক গোপন করার কোনরকম চেষ্টা দেখা গেল না। তবে শেষমেশ একটা ছোট্ট ঘটনায় তাঁদের অভিসারে বাধা পড়ল।

শীতের এক বিষণ্ন রাত। ঠাণ্ডা, ঝোড়ো বাতাস আছড়ে পড়ছে চিমনি আর জানালার শার্সিতে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। ডিনার শেষে স্টাডিতে আগুনের পাশে বসে আছেন ডগলাস স্টোন, কনুইয়ের কাছে মালাকাইটের টেবিলের ওপর এক গ্লাস দামী পোর্ট। চুমুক দেয়ার আগে গ্লাসের ভেতরের রক্তলাল পদার্থটুকু দেখলেন তিনি সমঝদারের দৃষ্টিতে। আগুন ভালভাবে জ্বলে উঠতে আলো এসে পড়ল তাঁর পৌরুষদীপ্ত মুখ আর ধূসর চোখজোড়ার ওপর। মোটা, দৃঢ় ঠোঁট, রোমান ধাঁচের চৌকো চোয়ালে একটা বুনো ভাব। দামী চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসছেন তিনি মাঝে মাঝে। এই আত্মসন্তুষ্টি অনুভব করার অধিকার তাঁর আছে। আজ ছ'জন সহকর্মীর নিষেধ সত্ত্বেও অত্যন্ত জটিল একটা অপারেশন করেছেন। এর আগে এরকম অপারেশন হয়েছে মাত্র দু'বার, কিন্তু আজকের সাফল্যে তিনি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। লন্ডনের আর কোন সার্জনের এই পরিকল্পনা করার দুঃসাহস কিংবা অপারেশন করার মত দক্ষতা নেই।

কিন্তু আজ সন্ধেয় লেডি স্যানক্সের সঙ্গে দেখা করবেন বলে কথা দিয়েছেন তিনি, আর ইতিমধ্যেই সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ক্যারিজ প্রস্তুত করার আদেশ দিতে বেল টেপার জন্যে কেবল হাত বাড়িয়েছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন কড়া নাড়ার ভোঁতা শব্দ। এক মুহূর্ত পরেই হলঘর থেকে ভেসে এল পদশব্দ, দড়াম করে বন্ধ হলো একটা দরজা।

'একজন রোগী কনসালটিং রুমে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্যার,' বলল খানসামা।

'তাঁর নিজের ব্যাপারে?'

'না, স্যার; মনে হয় আপনাকে নিয়ে যেতে চান।'

'এখন আর সম্ভব নয়, অনেক দেরি হয়ে গেছে,' কড়া গলায় বললেন ডগলাস স্টোন। 'আমি যাব না।'

'এই যে তাঁর কার্ড, স্যার।'

সোনার একটা থালায় করে কার্ডটা সামনে রাখল খানসামা। থালাটা তাঁকে উপহার দিয়েছেন একজন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী।

'হামিল আলী, স্মিরনা। হুঁম! ভদ্রলোক তুর্কী মনে হচ্ছে।'

'জী, স্যার। দেখে মনে হলো তিনি বিদেশ থেকে এসেছেন। তাঁর অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়।'

'আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে, যেতেই হবে সেখানে। কিন্তু আমি এই হামিল আলীর সঙ্গে দেখা করব। যাও, তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো, পিম।'

কয়েক মুহূর্ত পর খানসামা দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকলেন ছোটখাট, ভাঙাচোরা এক মানুষ; পিঠ কুঁজো, মাথাটা সামনে বাড়িয়ে চোখ পিটপিট করা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। মুখ, চুল আর দাড়ি কুচকুচে কালো। ভদ্রলোকের এক হাতে লাল ডোরা কাটা সাদা মসলিনের একটা পাগড়ি, আরেক হাতে শ্যামোয়া চামড়ার একটা ব্যাগ।

'শুভ সন্ধে,' দরজা বন্ধ করে দিয়ে খানসামা চলে যেতে বললেন ডগলাস স্টোন। 'আশা করি ইংরেজি বলতে পারেন?'

'জী, স্যার। আমি এশিয়া মাইনর থেকে এসেছি, থেমে থেমে ইংরেজি বলতে পারি।'

'আপনি আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চান মনে হয়?'

'জী, স্যার। আমি চাই আমার স্ত্রীকে আপনি একবার দেখেন।'

'আজ তো আপনার স্ত্রীকে দেখতে পারব না, আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে। আগামীকাল সকালে যেতে পারি।'

অদ্ভুত এক কৌশলে জবাব দিলেন তুর্কী ভদ্রলোক। ব্যাগের মুখ খুলে টেবিলের ওপর উপুড় করলেন তিনি, ঝরঝর করে যেন ঝরে পড়তে লাগল সোনার ঝর্না।

'এখানে একশো পাউন্ড আছে,' বললেন তিনি। 'আর কথা দিচ্ছি এক ঘন্টার বেশি দেরি আপনাকে করতে হবে না। আপনার বাড়ির সামনেই একটা ক্যাব দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

ঘড়ি দেখলেন ডগলাস স্টোন। এক ঘণ্টা পরে লেডি স্যানক্সের কাছে গেলে খুব বেশি দেরি হবে না। তিনি তার চেয়েও দেরি করে সেখানে গেছেন। খুবই বেশি ফি দিতে চাইছেন ভদ্রলোক। জিনিসপত্র নিয়ে কয়েকজনের কাছে অনেক ঋণ হয়ে গেছে, ঋণের জন্যে চাপ দিতে শুরু করেছে তারা। না, এই সুযোগ হাতে পেয়ে তিনি হেলায় হারাতে রাজী নন। তিনি যাবেন।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'সেটা খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার! খুবই দুঃখজনক! আপনি কি কখনও আলমোহেদির ড্যাগারের কথা শুনেছেন?'

'না।'

'এগুলো বহু প্রাচীন পুবদেশীয় এক ধরনের ছুরি। অদ্ভুত চেহারা, হাতলটা আপনারা যাকে বলেন ওই রেকাবের মত। এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, প্রাচীন সব দুর্লভ বস্তুর ব্যবসা আমার। এগুলো সংগ্রহের জন্যেই আমি স্মিরনা থেকে ইংল্যান্ডে এসেছি, ফিরে যাব আগামী সপ্তাহে। দুঃখের বিষয়, এই জিনিসগুলোর সঙ্গেই ছিল ওই ড্যাগার।'

'আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে, নিশ্চয় ভুলে যাননি সে-কথা,' সামান্য বিরক্তির সঙ্গে বললেন সার্জন; 'দয়া করে লম্বা বর্ণনা বাদ দিয়ে আসল ঘটনা বলুন।'

'শুনলেই বুঝতে পারবেন যে এই বর্ণনার প্রয়োজন আছে।

আমি যে-ঘরে জিনিসগুলো রাখি, হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে আমার স্ত্রী আজ পড়ে গেছে সেখানে, আর তার নিচের ঠোঁট কেটে গেছে আলমোহেদির সেই অভিশপ্ত ড্যাগারে।'

'হুঁ।' উঠে দাঁড়ালেন ডগলাস স্টোন। 'তাহলে আপনি চান যে ক্ষতটা আমি ব্যান্ডেজ করে দিই?'

'না, না, আপনি যা ভাবছেন আঘাত তার চেয়ে অনেক খারাপ।'

'কিরকম?'

'এই ড্যাগারগুলো বিষাক্ত।'

'বিষাক্ত!'

'জী। পৃথিবীর কেউ জানে না যে এটা কি বিষ কিংবা এর হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় কি। বাবাও এই ব্যবসা করতেন, তাঁর মুখ থেকেই আমি প্রথম শুনি এই বিষের কথা।'

'এই বিষে আক্রান্ত হলে কি হয়?'

'গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রোগী, তারপর ঘুমের মধ্যেই মারা যায় তিরিশ ঘণ্টার ভেতরে।'

'আপনি বলছেন এই বিষ থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই, তাহলে আমার পেছনে এত খরচ করতে চাইছেন কেন?'

'ওষুধ রেহাই দিতে পারবে না, কিন্তু ছুরি হয়তো পারবে।'

'কিভাবে?'

'এই বিষের কাজ শুরু হতে অনেক দেরি হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এটা থেকে যায় ক্ষতের মধ্যে।'

'জায়গাটা পরিষ্কার করলে বিষ ধুয়ে যাবে?'

'কাউকে সাপে কামড়ালে ক্ষত পরিষ্কার করে কি সেই বিষ দূর করা যায়? এই বিষ যেমন সূক্ষ্ম তেমনি মারাত্মক!'

'তাহলে কি জায়গাটা কেটে বাদ দিতে হবে?'

'জী। এই বিষ আঙুলে লাগলে সেই আঙুল কেটে বাদ দাও,

বলতেন বাবা। তবে ঘটনাটা ঘটেছে আমার স্ত্রীর বেলায়, তাই যাকে তাকে দিয়ে অপারেশন করিয়ে আমি ঝুঁকি নিতে পারি না।'

জীবনে অনেক কাটা-ছেঁড়া করেছেন ডগলাস স্টোন, ফলে সাধারণ মানুষের ভয় তাঁর মনে নেই। সব শুনে ইতিমধ্যে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন তিনি। 'হ্যাঁ, অপারেশন ছাড়া তো আর কোন পথই নেই মনে হচ্ছে,' বললেন তিনি সরাসরি। 'জীবন হারানোর চেয়ে বরং একটা ঠোঁট হারানো অনেক ভাল।'

'জী, ঠিকই বলেছেন আপনি। সবই আমার কিসমত, একে এড়িয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই। এখন চলেন, আমার সঙ্গে গিয়ে যা করার করবেন।'

একটা ড্রয়ার থেকে সার্জিক্যাল ছুরির কেস, এক রোল ব্যান্ডেজ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস বের করে নিলেন ডগলাস স্টোন। লেডি স্যানক্সের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করার উপায় তাঁর নেই। 'আমি প্রস্তুত,' ওভারকোট গায়ে দিতে দিতে বললেন তিনি। 'এই ঠাণ্ডায় বেরোবার আগে খাবেন নাকি এক গ্লাস ওয়াইন?'

কথাটা শোনামাত্র একটা হাত ওপরে তুলে আতঙ্কে যেন একেবারে কুঁকড়ে গেলেন তুর্কী ভদ্রলোক। 'আপনি হয়তো ভুলে গেছেন যে আমি মুসলমান, মহানবীর একজন খাঁটি অনুসারী,' বললেন তিনি। 'মদ স্পর্শ করা আমাদের নিষেধ। এবার বলুন, সবুজ কাঁচের বোতলে করে এইমাত্র ওটা কী রাখলেন পকেটে?'

'ক্লোরোফর্ম।'

'ওটাও আমাদের জন্যে হারাম। স্পিরিট জাতীয় জিনিস আমরা ব্যবহার করি না।'

'কী! ক্লোরোফর্ম ছাড়াই স্ত্রীকে অপারেশন করাতে চান?'

'আহা! বেচারি কিছুই বুঝতে পারবে না। বিষের আক্রমণে ইতিমধ্যেই সে তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে। তারপর আমি তাকে

স্মিরনার আফিম দিয়েছি। চলুন, স্যার, এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।'

বাইরে পা দিতেই এক পশলা বৃষ্টি এসে ঝাপটা মারল মুখে। মার্বেল পাথরের একটা নারীমূর্তির বাহু থেকে ঝোলা হলঘরের বাতিটা নিবে গিল দপ্ করে। অতি কষ্টে কাঠের ভারি দরজাটা খুলে ধরে রাখল খানসামা পিম। দু'জনে গিয়ে উঠলেন অপেক্ষমাণ ক্যাবে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খটখটিয়ে রওনা দিল সেটা।

'দূরে যেতে হবে?' জানতে চাইলেন ডগলাস স্টোন।

'না, না। ইউস্টন রোডে।'

সময় জানার জন্যে রিপিটারের স্প্রিং চেপে ধরলেন স্টোন। মৃদু টিং টিং শব্দ তাঁকে জানিয়ে দিল যে এখন সোয়া ন'টা বাজে। মনে মনে দূরত্ব হিসেব করে তিনি ভাবলেন, এরকম ছোট্ট একটা অপারেশন করতে কত সময় লাগতে পারে। দশটার মধ্যে লেডি স্যানক্সের কাছে যেতেই হবে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ঝাপসা গ্যাসবাতি নাচতে নাচতে সরে যাচ্ছে পেছনে, মাঝেসাঝে দু'একটা উজ্জ্বল দোকান। ক্যাবের চামড়ার ছাদে ঝরঝরিয়ে পড়ছে বৃষ্টি, কাদার গর্তে পড়তে কঁ্যাচ কঁ্যাচ করে উঠছে চাকা। উল্টোপাশে বসা তুর্কী ভদ্রলোকের সাদা পাগড়ি সামান্য চকচক করছে অন্ধকারের গায়ে। পকেটে হাত দিয়ে সুচ, সেফটি-পিন ঠিকঠাক করে নিলেন সার্জন, রোগীর বাড়িতে পৌছার পর বাড়িতে একটা মুহূর্তও তিনি ব্যয় করতে চান না। অস্থির হয়ে মাঝেমাঝেই পা ঠুকতে লাগলেন তিনি ক্যাবের মেঝেতে।

অবশেষে একসময় গতি কমতে কমতে থেমে গেল ক্যাব। চোখের পলকে ডগলাস স্টোন বেরিয়ে এলেন বাইরে, পেছনে পেছনে স্মিরনার ব্যবসায়ী।

'তুমি দেরি করো,' বললেন তিনি ক্যাবচালককে।

সরু, নোংরা একটা রাস্তায় করুণ চেহারার একটা বাড়ি।

লন্ডনকে সার্জন চেনেন বেশ ভালভাবেই। আশপাশে তাকিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছুই তাঁর চোখে পড়ল না, কেবল বাজে চেহারার বাড়ির লম্বা দুটো সারি। তাঁরা এসে দাঁড়ালেন রঙচটা, কালিঝুলি লাগানো একটা দরজার সামনে। ওপরে বেডরুমগুলোর একটার জানালায় হলুদ একটা আভা। জোরে জোরে দরজায় টোকা দিলেন ভদ্রলোক, আলো এসে পড়তে ডগলাস স্টোন দেখলেন, তাঁর সারা মুখে উদ্বেগের ছাপ। বোল্ট নামার শব্দ পাওয়া গেল, মোমবাতি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল বয়স্কা এক মহিলা।

'সব ঠিক আছে?' শ্বাস চাপলেন ভদ্রলোক।

'তাঁকে যেমন রেখে গিয়েছিলেন এখনও তেমনি আছেন, স্যার।'

'কথা বলেনি?'

'না, অঘোরে ঘুমাচ্ছেন।'

দরজা বন্ধ করে দিলেন ব্যবসায়ী, সরু প্যাজেস ধরে এগোতে এগোতে অবাক চোখে আশপাশে তাকাতে লাগলেন ডগলাস স্টোন। কোন অয়েল-ক্লথ, ম্যাট বা হ্যাট-র্যাক নেই কোথাও। সব জায়গায় দেখা গেল পুরু ধুলো আর মাকড়সার জাল। প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে মহিলার পেছনে পেছনে ওপরে ওঠার সময় নিজের পদশব্দই কর্কশ লাগল কানে। সেখানে কোন কার্পেট নেই।

বেডরুমটা দ্বিতীয় ল্যান্ডিঙে। বয়স্কা নার্সকে অনুসরণ করলেন ডগলাস স্টোন, তাঁর পেছনে ব্যবসায়ী। এখানে অন্তত আসবাব চোখে পড়ল। মেঝে আর কোণগুলো ভর্তি হয়ে আছে টার্কিশ ক্যাবিনেট, মণিরত্ন খচিত টেবিল, বর্ম, অদ্ভুত চেহারার বাঁশি আর অস্ত্রশস্ত্রে। দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটে একটামাত্র ছোট বাতি। সেটা নামিয়ে ডগলাস স্টোন এগোলেন জিনিসগুলোর মাঝখান দিয়ে। এক কোণের একটা বিছানায় শুয়ে আছেন বোরখা আর নেকাব

পরা একজন মহিলা। মুখের নিচ অংশটা খোলা তাঁর, সার্জন দেখলেন নিচের ঠোঁটের প্রান্ত বরাবর আঁকাবাঁকা একটা কাটা দাগ।

'বোরখা পরে থাকায় কিছু মনে করবেন না,' বললেন তুর্কী ভদ্রলোক। 'আপনি নিশ্চয় জানেন যে আমরা মেয়েদের খুব পর্দার মধ্যে রাখি।'

কিন্তু সার্জন এই মুহূর্তে বোরখা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। মহিলাও এখন আর তাঁর কাছে মহিলা নয়, স্রেফ একটা রোগী। ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ চোখে ক্ষতটা পরীক্ষা করলেন তিনি। 'যন্ত্রণার কোন চিহ্ন নেই,' বললেন সার্জন। 'লক্ষণ স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি।'

হাত কচলাতে লাগলেন ব্যবসায়ী।

'স্যার, স্যার,' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'দেরি করবেন না। আপনি জানেন না যে এই বিষ কত মারাত্মক। আমি জানি বলে আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, অপারেশন ছাড়া কোন উপায় নেই।'

'তবু আমি একটু অপেক্ষা করতে চাই,' বললেন ডগলাস স্টোন।

'যথেষ্ট অপেক্ষা করেছেন,' রেগে গেলেন তুর্কী ব্যবসায়ী। 'এখন প্রত্যেকটা মিনিট মূল্যবান, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর মৃত্যু দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এবারে এখানে আসার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে অন্য সার্জনের খোঁজে বেরতে হবে।'

মুশকিলে পড়ে গেলেন ডগলাস স্টোন। একশো পাউন্ড ফেরত দেয়া মোটেই আনন্দের ব্যাপার নয়। কিন্তু অপারেশন না করলে পাউন্ডগুলো তাঁকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। আর তুর্কী ভদ্রলোকের কথা অনুসারে সত্যিই যদি মহিলা মারা যান, করোনারের জেরায় তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

'এই বিষ সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা আছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'জী, আছে।'

'আপনি কিন্তু আমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে এক্ষেত্রে একটা অপারেশনের প্রয়োজন।'

'সমস্ত পবিত্র জিনিসের শপথ করছি আমি।'

'অপারেশনের পর চেহারা হবে ভয়াবহ।'

'জী, বুঝতে পারছি যে ওই ঠোঁটে চুমু খেতে আর মোটেই ভাল লাগবে না।'

সাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন ডগলাস স্টোন, বিশ্রী এই মন্তব্যে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তাঁর। কিন্তু তুর্কীদের কথা বলার, চালচলনের নিজস্ব কিছু ধরন আছে, আর এখন তর্কাতর্কি করার মত সময় নেই। কেস থেকে সার্জিক্যাল একটা ছুরি বের করে তর্জনীতে ছুঁইয়ে ধার পরীক্ষা করলেন ডগলাস স্টোন, তারপর বাতিটা নিয়ে গেলেন বিছানার আরও কাছে। বোরখার ফাঁক দিয়ে গাঢ় দুটো চোখ চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

'অনেকটা আফিম দিয়েছেন মনে হচ্ছে।'

'জী, তা অনেকখানিই দেয়া হয়েছে।'

আবার তাকালেন তিনি গাঢ় চোখজোড়ার দিকে। তাতে নিষ্প্রভ দৃষ্টি, তবু তাকিয়ে থাকতে থাকতে সামান্য নড়ে গেল মণি, মৃদু কেঁপে উঠল ঠোঁট।

'উনি সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাননি,' বললেন সার্জন।

'ব্যথার বোধ না থাকা অবস্থাতেই কি ছুরি চালানো ভাল নয়?'

ওই একই কথা ভাবছিলেন সার্জন। ফরসেপ দিয়ে আহত ঠোঁটটা চেপে ধরলেন তিনি, তারপর দ্রুত দু'বার ছুরি চালিয়ে বড় একটা টুকরো কেটে ফেললেন। ভয়াবহ ঘড়ঘড়ে এক চিৎকার ছেড়ে বিছানায় উঠে বসলেন মহিলা। নেকাব খুলে পড়ে গেল মুখ

থেকে। হতভম্ব হয়ে গেলেন সার্জন, এই মুখ যে তাঁর ভীষণ পরিচিত! ঠোঁট রক্তে মাখামাখি হওয়া সত্ত্বেও চিনতে মোটেই অসুবিধে হলো না। কাটা জায়গাটায় বার বার হাত তুলে সমানে চিৎকার করে চলেছেন মহিলা। ছুরি আর ফরসেপ হাতে বিছানায় বসে পড়লেন ডগলাস স্টোন। পুরো ঘরটা যেন তাঁকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ধীরে ধীরে, কানে এসে আছড়ে পড়ছে দূর সাগরের গর্জন। এখন পাশে যে কেউ থাকলে বলত, সার্জনের চেহারা এই মুহূর্তে মহিলার কাটা মুখের চেয়েও বিশ্রী হয়ে গেছে। এর মাঝেই যেন স্বপ্নের ঘোরে তিনি দেখলেন, তুর্কী ভদ্রলোক তাঁর চুল ও দাড়ি খুলে রাখলেন টেবিলের ওপর, আর সেখানে কোমরে হাত রেখে উপহাসের হাসিতে ফেটে পড়লেন লর্ড স্যানক্স। চিৎকারের শব্দ নেই আর, মহিলা আবার লুটিয়ে পড়েছেন বিছানায়। নিশ্চল বসে আছেন ডগলাস স্টোন, আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে হেসে চলেছেন লর্ড স্যানক্স।

'ম্যারিয়নের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল এটা, এই অপারেশনটা,' বললেন তিনি। 'তবে শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবে।'

সামনে ঝুঁকে বিছানার চাদরের ঝালর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন ডগলাস স্টোন। হাত থেকে ছুরি পড়ে গেল মেঝেতে, রয়ে গেল ফরসেপ আর অন্যান্য জিনিসগুলো।

'অনেক দিন থেকেই ঘটনাটা ঘটাতে চাইছিলাম আমি,' নরম স্বরে বললেন লর্ড স্যানক্স। 'আপনার গত বুধবারের চিঠিটা আমার হাতে চলে এসেছে, এখন ওটা আমার পকেট-বুকের ভাঁজে। চিঠিটা পেয়েই আমি পরিকল্পনা এঁটে ফেলি। অবশ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে আমাকে কিছু ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। আর ক্ষতটা আমি সৃষ্টি করেছি আমার সিগনেট রিঙের আঁচড়ে।'

নীরব সার্জনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কোটের

পকেটে রাখা ছোট্ট রিভলভারটা কক করে নিলেন তিনি। কিন্তু ডগলাস স্টোন তখনও চাদরের ঝালর ধরে টানাটানি করছেন।

'আর যা-ই হোক আপনি কিন্তু আপনার এনগেজমেন্ট রক্ষা করেছেন,' বললেন লর্ড স্যানক্স।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন ডগলাস স্টোন। লম্বা এই হাসি শুনে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল লর্ড স্যানক্সের, একটা আতঙ্ক পেয়ে বসল তাঁকে। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বাহিরে দাঁড়িয়েছিল বয়স্কা সেই মহিলা।

'জ্ঞান ফিরলে তোমার কর্ত্রীর কাছে থেকো,' বললেন লর্ড স্যানক্স। তারপর তিনি নেমে গেলেন রাস্তায়। তাঁকে দেখে হ্যাটে হাত ছুঁইয়ে অভিবাদন জানাল ক্যাবচালক।

'জন,' বললেন লর্ড স্যানক্স, 'প্রথমে ডাক্তারকে বাড়ি পৌছিয়ে দেবে। সম্ভবত নিচতলায় তাঁকে ধরে নামাতে হবে। তাঁর খানসামাকে বলবে যে একটা অপারেশন করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

'জী, স্যার।'

'তারপর লেডি স্যানক্সকে বাড়ি নিয়ে যেয়ো।'

'আর আপনি কোথায় যাবেন, স্যার?'

'আগামী কয়েক মাসের জন্যে আমার ঠিকানা—হোটেল দ্য রোমা, ভেনিস। লক্ষ রেখো যেন চিঠিগুলো আমার হাতে ঠিকভাবে পৌছে। আর স্টিভেন্‌সকে বোলো যেন আগামী সোমবার সব লাল ক্রিসানথিমামগুলো প্রদর্শনীতে নিয়ে যায় আর তার করে ফলাফল জানায় আমাকে।

মূলঃ আর্থার কোনান ডয়েল
রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

অভিনেত্রী

এক

রঙ্গমঞ্চের নিচতলায়, দর্শকদের চতুর্থ সারিতে বসে ছিল দারিদ্র্যক্লিষ্ট চেহারার লোকটা। মঞ্চের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চঞ্চল চোখ জোড়া সরু হয়ে এল তার।

'ন্যান্সি টেলর।' বিড়বিড় করল সে। 'বাই দা লর্ড, সেই ন্যান্সি টেলর!'

হাতে ধরা প্রোগ্রামে চোখ নামাল লোকটা। বেশ কিছু নাম ছাপানো কাগজটাতে। একটি নাম অন্যগুলোর চেয়ে বড় বড় হরফে লেখা।

'ওলগা স্টোরমার! তাহলে এ নামেই আজকাল নিজের পরিচয় দিচ্ছে সে। নিজেকে তারকার পরিচয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা, অ্যাঁ? টাকাও নিশ্চয়ই ভাল কামাচ্ছ। হয়তো ন্যান্সি টেলর নামটার কথা তুমি ভুলেই গেছ। জেক লেভিট তখন সব কথা মনে করিয়ে দিলে তোমার প্রতিক্রিয়া কি হবে তাই ভাবছি।'

নাটকের প্রথম পর্বের অভিনয় শেষ। পর্দা পড়ে গেল মঞ্চে। প্রচণ্ড হাততালিতে বিস্ফোরিত হলো গোটা অডিটরিয়াম। ওলগা স্টোরমার, বিখ্যাত আবেগী অভিনেত্রী, যে গত কয়েক বছরের মধ্যে হয়ে উঠেছে ঘরে ঘরে উচ্চারিত একটি নাম, তার সাফল্যের মুকুটে আজ আবার একটি জয়ের পালক সংযোজিত হলো 'দ্য অ্যাভেঞ্জিং অ্যাঞ্জেল'-এ 'কোরা'র ভূমিকায় দুর্দান্ত অভিনয় করে।

তবে উচ্ছ্বসিত দর্শকের হাততালিতে অংশ নিল না জেক লেভিট। তার মুখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল শয়তানী হাসি। ঈশ্বর! ভাগ্য কাকে বলে! সে যখন প্রায় ডুবতে বসেছে তখন এরকম একটা সুযোগের আগমন। মেয়েটা ওর সাথে প্রতারণার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু জেককে ধাপ্পা দেয়া সহজ নয়। সোনার খনির সন্ধান পেয়ে গেছে সে। এবার শুধু মাথা খাটিয়ে খনি থেকে সোনা তোলার অপেক্ষা!

দুই

পরদিন সকাল। নিজের বিলাসবহুল ড্রইংরূমে বসে একটি চিঠি পড়ছিল ওলগা স্টোরমার। চিঠির লেখক জেক লেভিট। বার দুই চিঠিটি পড়ল ওলগা, তারপর গভীর ভাবনায় ডুবে গেল। তার অপূর্ব সুন্দর ধূসর-সবুজ চোখে কোন ভাব ফুটল না। যদিও মনের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে হুমকি দেয়া চিঠিটি পড়ে।

কিছুক্ষণ পরে মিষ্টি গলায়, যে কণ্ঠ শুনে আবেগে বিহ্বল হয়ে ওঠে দর্শক, ডাক দিল ওলগা, 'মিস জোনস!'

চশমা পরা, পরিচ্ছন্ন চেহারার এক তরুণী ঢুকল ঘরে, এক হাতে শর্টহ্যান্ড প্যাড, অন্য হাতে ধরে আছে পেন্সিল।

'মি. ডানাহানকে একটু ফোন করো তো, প্লীজ। আসতে বলো এখুনি।'

একটু পরে ওলগার ঘরে ঢুকল তার অভিজ্ঞ ম্যানেজার সিড ডানাহান। অভিনেত্রীকে শান্ত মেজাজে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। হঠাৎ জরুরী তলবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল সে। ওলগা তাকে দেখে চিঠিটি এগিয়ে দিল।

'পড়ো এটা।'

সস্তা কাগজে, আঁকাবাঁকা হাতে লেখা চিঠি।

প্রিয় ম্যাডাম,

গত রাতে আপনার 'দ্য অ্যাভেঞ্জিং অ্যাঞ্জেল' দেখলাম। খুবই ভাল লেগেছে। আপনার কি মনে আছে আমাদের দুজনের এক বন্ধু ছিল শিকাগোতে, মিস ন্যান্সি টেলর? তাকে নিয়ে লেখা একটি রচনা শীঘ্রি প্রকাশিত হবে পত্রিকায়। আপনি এ বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহ বোধ করলে, আপনার সুবিধে মত যে কোন সময়ে আপনার বাড়িতে হাজির হতে পারব।

আপনার বিশ্বস্ত
জেক লেভিট

ডানাহান চিঠি পড়া শেষ করে ওলগার দিকে তাকাল।

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কে এই ন্যান্সি টেলর?'

'একটা মেয়ে। যার মরে যাওয়াই ভাল ছিল, ড্যানি,' কর্কশ শোনাল ওলগার কণ্ঠ, উদ্বেগটাকেও গোপন করল না সে। 'যে মেয়েটার মৃত অতীতকে এই লোভী কাকটা আবার খুঁড়ে এনেছে নতুন করে।'

'তার মানে...'

'হ্যাঁ, ড্যানি। আমিই সেই ন্যান্সি টেলর।'

'ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে লোকটা, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল ওলগা। 'ঠিক তাই। আর ব্ল্যাকমেইলিংটা সে ভালই পারে।'

ভুরু কুঁচকে গেল ডানাহানের। বিষয়টা নিয়ে ভাবছে। হাতের তালুতে থুতনি রেখে গভীর চোখ দিয়ে তাকে লক্ষ করছে ওলগা। 'সবকিছু অস্বীকার করে বসলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করল ডানাহান। 'শুধু চেহারার মিল দেখে লোকটা এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত না-ও হতে পারে।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ওলগা।

'লেভিটের পেশাই হলো মহিলাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করা। সে কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে কাজ করে না।'

'পুলিশে খবর দিই?' বলেই বুঝল বোকার মত হয়ে গেছে প্রশ্নটা।

বাঁকা হাসি দিয়ে ওলগা বুঝিয়ে দিল সে পুলিশে খবর দিতে আগ্রহী নয়। চৌত্রিশ বছরের এই মহিলা, যাকে মঞ্চে কখনোই মধ্য পঁচিশের বেশি মনে হয় না, এর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অসম্ভব, জানে ডানাহান। আর তার বিষণ্ন চেহারায় মনের ভাব কখনোই ফুটে ওঠে না। কাজেই বলা মুশকিল ওলগা এ মুহূর্তে কি ভাবছে।

তবু সাহস করে কথাটা বলেই ফেলল ডানাহান, 'আ-ইয়ে আপনি কি মনে করেন না স্যার রিচার্ডকে বিষয়টা জানানো উচিত? উনি হয়তো কোন সমাধান দিতে পারবেন।'

এমপি স্যার রিচার্ড এভারার্ডের সাথে হপ্তা কয়েক আগে অভিনেত্রীর বাগদান হয়ে গেছে।

'রিচার্ড আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সময়ই ওকে সব কথা খুলে বলেছি।'

'বাহ্, বুদ্ধিমতীর মত একটা কাজ করেছেন!' প্রশংসার গলায় বলল ডানাহান।

মৃদু হাসল ওলগা।

'এর মধ্যে বুদ্ধির প্রশ্ন নেই, ড্যানি ডিয়ার। তুমি আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না। এই লেভিট যে হুমকি দিচ্ছে তা যদি সে করে দেখায়, আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। রিচার্ডের পার্লামেন্টারি ক্যারিয়ার সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। নাহ্, আমার সামনে শুধু দুটো পথই খোলা আছে।'

'কি রকম?'

'টাকা দিতে হবে–এবং বলাবাহুল্য সহজে খাই মেটানো যাবে না লেভিটের। অথবা অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আবার নতুন করে সব কিছু শুরু করতে হবে।'

ওলগার গলায় আবার সেই উদ্বেগ আর শঙ্কার সুর।

'তবে যে কাজ আমি করেছি তার জন্যে অনুতপ্ত নই মোটেই। তখন সাংঘাতিক দুর্দশাময় জীবন-যাপন আমাকে করতে হয়েছে, ড্যানি। কতদিন না খেয়ে থেকেছি! মেরুদণ্ড খাড়া করে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। ওই সময় একটা লোককে, লোক নয় পশু, ওকে গুলি করি আমি। তবে গুলিটা পাওনা ছিল ওর। যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ওকে আমি হত্যা করেছি তাতে পৃথিবীর কোন বিচারক আমাকে শাস্তি দিতে পারবেন না। এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও তখন বুঝিনি। তখন আমার বয়স ছিল খুবই কম–প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডানাহান।

'এই লেভিটটাকে ধরার কোন উপায় নেই?' প্রশ্ন করল সে।

মাথা নাড়ল ওলগা।

'লোকটা একটা ভীতুর ডিম। সামনাসামনি কিছু করার সাহস নেই,' তেতো শোনাল তার কণ্ঠ।

'স্যার রিচার্ড ওকে ধরে হুমকি-টুমকি দিলে...' পরামর্শ দিল ডানাহান।

'রিচার্ডকে এর মধ্যে জড়াতে চাই না আমি। ও সাংঘাতিক মাথা গরম মানুষ। কি করতে কি করে বসে! যাকগে, তুমি এখন কথা বোলো না। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। একটু ভাবতে দাও।' ডানাহান চুপ হয়ে গেল। ওলগা ঝুঁকে, দু'হাতের চেটোতে অনেকক্ষণ মুখ ডুবিয়ে রাখল। তারপর সিধে হলো।

'যে মেয়েটা আমার বদলে মাঝে মাঝে প্রক্সি দেয় ওর নামটা যেন কি? মার্গারেট রায়ান, না? আমার মত চুল?'

'হ্যাঁ, আপনার মত চুল,' ওলগার সোনালি ব্রোঞ্জ রঙের একমাথা চুলের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল ডানাহান। 'আপনার চেহারার সাথে তার যথেষ্ট মিলও আছে। তবে অভিনয় কিচ্ছু জানে না। আগামী হপ্তায় ওকে বাদ দিয়ে দেব ভাবছি।'

'তার দরকার নেই,' হাত নেড়ে মানা করে দিল ওলগা। 'সব ঠিকঠাক মত চললে ওকে 'কোরা'র ভূমিকায় প্রক্সি দিতে বোলো আচ্ছা, ড্যানি। একটা সত্যি কথা বলো তো। আমি কি সত্যি অভিনয় করতে পারি? প্রকৃত অভিনয়ের কথা বলছি। নাকি চমৎকার সব পোশাক পরে, সুন্দর চেহারা নিয়ে খামোকা স্টেজে ঘুরে বেড়াই?'

'অভিনয়? মাই গড! ওলগা, আপনার মত অভিনয় আর কে জানে?'

'তাহলে ওই লেভিট কাপুরুষটা, যেভাবে প্ল্যান করেছি আমি, আমার ফাঁদে পড়ে যাবে। না, এখনই তোমাকে সব কথা বলা যাবে না। রায়ানকে খবর দাও। বলো কাল রাতে আমার বাড়িতে ওর ডিনারের দাওয়াত। জলদি যেন আসে।'

'অবশ্যই আসবে।'

'একটা জিনিস আমার দরকার–দুই/তিন ঘণ্টা কাউকে অজ্ঞান করে রাখার মত ওষুধ। তবে ওটা যে খাবে তার যেন খুব বেশি অসুবিধে না হয়।'

মুচকি হাসল ডানাহান।

'ও জিনিস যার পেটে যাবে তার একটু-আধটু মাথা ব্যথা যে থাকবে না তার গ্যারান্টি দিতে পারব না তবে ওরচে' বড় কোন সমস্যা হবে না।'

'বেশ তাহলে এখন যাও। বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

গলা চড়িয়ে ডাকল সে, 'মিস জোনস!'

চশমা পরা তরুণী আবার এসে ঢুকল তার জিনিসপত্র নিয়ে।

'একটা নোট নাও, প্লীজ।'

পায়চারি করতে করতে তার সেক্রেটারিকে ডিকটেশন দিয়ে গেল ওলগা। সারাদিনের রুটিন। শুধু একটা চিঠি সে লিখল নিজের হাতে।

ওই চিঠিটি হাতে পেয়ে মুচকি হাসল জেক লেভিট। এরকম একটা খাম আশা করেছিল সে। খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করল সে।

ডিয়ার স্যার,

যে মহিলার নাম আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তার কথা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। কারণ অনেকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সবার নাম মনে রাখার প্রয়োজনও পড়ে না। যা হোক, আমি যে কোন সমসাময়িক অভিনেত্রীকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আজ রাত ন'টায় আমার বাড়িতে এলে আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে।

আপনার বিশ্বস্ত
ওলগা স্টোরমার।

বিজ্ঞের মত মাথা দোলাল লেভিট। চতুর লেখা! মহিলা স্বীকার করেনি কিছুই। আবার ওর সাথে দেখা করতেও অনাগ্রহ প্রকাশ করছে না। সোনার খনির কাছে যাবার সুযোগ তাহলে হলো।

রাত ন'টার সময় লেভিট এসে দাঁড়াল অভিনেত্রীর ফ্ল্যাটের দরজার সামনে। টিপল কলিংবেল। কেউ সাড়া দিল না আবার বেল টিপতে যাচ্ছে, টের পেল দরজাটা ভেজানো। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল হলঘরে ঢুকল লেভিট। ডান দিকে একটা খোলা দরজা। ওপাশে আলোকিত একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। লাল আর কালো পর্দা দিয়ে ঘেরা। লেভিট ও ঘরে পা বাড়াল। টেবিলের

ওপর, ল্যাম্পের নিচে একটা চিরকুট চোখে পড়ল ওর। তাতে লেখা,

আমি না আসা পর্যন্ত অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন–

ও. স্টোরমার।

চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল লেভিট। একটু পরে কেমন অস্বস্তি লেগে উঠল ওর। ফ্ল্যাটটা বড্ড বেশি নিস্তব্ধ ভৌতিক নীরবতার মধ্যে গা ছমছম করে।

এখানে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেনি। কি ঘটবে? শুধু ঘরটা অস্বাভাবিক নীরব, এই যা। কিন্তু লেভিটের বার বার মনে হচ্ছে এ ঘরে ও একা নয়, আরও কেউ আছে ধ্যাত, কি আবোল তাবোল ভাবছে সে। কপালের ঘাম মুছল লেভিট হাতের চেটো দিয়ে। কিন্তু মনের খচখচানি দূর হচ্ছে না কিছুতেই। ও একা নয় এ ঘরে! বিড়বিড় করতে করতে উঠে দাঁড়াল লেভিট। পায়চারি শুরু করে দিল ঘরে। মহিলা কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। তারপর–

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লেভিট। আঁতকে উঠেছে ভয়ানক। জানালায় টাঙানো কালো মখমলের পর্দার নিচ দিয়ে বেরিয়ে আছে একটা হাত। হাতটা ধরল লেভিট ঠাণ্ডা–ভয়ানক ঠাণ্ডা–মরা মানুষের হাত

একটা চিৎকার দিয়ে পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিল লেভিট। এক মহিলা শুয়ে আছে ওখানে। উপুড় হয়ে। একটা হাত শরীরের পাশে ছড়ানো, অন্য হাতটা ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে বুকের নিচে। সোনালি-ব্রোঞ্জ চুলের ঝলমলে রাশি এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে ঘাড়ের ওপর।

ওলগা স্টোরমার! কাঁপতে কাঁপতে বরফ ঠাণ্ডা কব্জি ধরল লেভিট। খুঁজে পেল না পালস। যা ভেবেছে তাই মারা গেছে মহিলা। সবচে সহজ পথটা বেছে নিয়েছে। মরে লেভিটের কবল

থেকে বেঁচেছে।'

লেভিটের চোখ আটকে গেল একজোড়া লাল রশির শেষ দুই প্রান্তে। প্রান্তজোড়া ফিতের মত আটকানো, অর্ধেকটা আড়াল হয়ে আছে ওলগার ঘন চুলের ভেতরে। সাবধানে রশিটা ধরে টান দিল লেভিট। সাথে সাথে মাথাটা ঝাঁকি খেয়ে ঝুলে পড়ল নিচের দিকে। পলকের জন্যে ভয়ংকর, বেগুনি মুখটা দেখতে পেল লেভিট। একটা আর্তচিৎকার দিয়ে লাফ মেরে উঠল ও। মাথাটা ঘুরে উঠল বোঁ করে। বেগুনি মুখটা দেখেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে লেভিট। আত্মহত্যা নয়, খুন! খুন করা হয়েছে মহিলাকে শ্বাস রোধ করে। আর এ ওলগা স্টোরমার নয়।

হঠাৎ পেছনে মৃদু শব্দ হতে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল লেভিট। মেইড সার্ভেন্টের ভয়ার্ত দৃষ্টির সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে পিঠ দিয়ে। পরনের ক্যাপ আর অ্যাপ্রনের মতই সাদা তার মুখ। ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা।

'হা, ঈশ্বর! তুমি ওকে খুন করেছ!'

লেভিট এখনও সামলে উঠতে পারেনি কোনমতে বলল, 'না! না! আমি ওকে মৃত অবস্থায় দেখেছি।'

'আমি নিজের চোখে দেখলাম তুমি রশি ধরে টান দিয়েছ। দম বন্ধ করে মেরেছ ওকে। ওর গলার ঘড়ঘড়ে আওয়াজও শুনতে পেয়েছি আমি।'

দরদর করে ঘামতে শুরু করল লেভিট। একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করছে। সে যখন রশির দুই প্রান্ত ধরে টান মেরেছে ঠিক তখন চাকরানীটা ঘরে ঢুকেছে; দেখেছে মাথাটা ঝুলে পড়ছে। নিজেই চিৎকার করে উঠেছে সে। কিন্তু ভেবেছে মহিলা চিৎকার দিয়েছে। হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল লেভিট চাকরানীর দিকে। মেয়েটার চোখে নির্জলা আতঙ্ক সেই সাথে বোকা বোকা একটা ভাব নির্ঘাত পুলিশকে বলে দেবে

বলবে নিজের চোখে খুন হতে দেখেছে। লেভিটের কথা বিশ্বাস করবে না কেউ। তারপর কি ঘটবে ভাবতেই শিউরে উঠল ও কিন্তু ওর কি বাঁচার কোন উপায় নেই?

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল লেভিট, 'এই মহিলা তোমার মনিবনী নয়, দেখতে পাচ্ছ না?'

'জানি,' এখনও ফোঁপাচ্ছে চাকরানী,' উনি আমার মালকিনের বান্ধবী–তবে কেউ কাউকে দেখতে পারেন না। আজ রাতেও ওঁরা দু'জনে খুব ঝগড়া করছিলেন।'

এটা একটা ফাঁদ! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে লেভিট।

'তোমার মালকিন কোথায়?'

'দশ মিনিট আগে বাইরে গেছেন।'

সত্যিই একটা ফাঁদ! ফাঁদটা সযত্নে তার জন্যে পেতে রেখেছিল ধূর্ত চূড়ামণি ওলগা স্টোরমার। আর সে বোকার মত ফাঁদে পা দিয়ে বসেছে। ওলগা নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিয়েছে আর লেভিট সে ফাঁদে পড়ে এখন পস্তাচ্ছে। খুন! গড, খুন করার জন্যে ওরা খুনীকে ফাঁসিতে লটকায়। কিন্তু সে তো কোন অপরাধ করেনি–সে নির্দোষ!

খসখস করে একটা শব্দ হতে বাস্তব জগতে ফিরে এল লেভিট। চাকরানী দরজার দিকে এগোতে শুরু করেছে। টেলিফোনের দিকে তাকাচ্ছে, তারপর আবার ফিরে চাইছে দরজার দিকে। প্রথমে মেয়েটাকে হাবাগোবা মনে হয়েছিল লেভিটের। এখন আর মনে হচ্ছে না এ মেয়ের কারণে সে জন্মের মত ফেঁসে যেতে পারে। যেভাবেই হোক এর মুখ বন্ধ করতে হবে। এটাই একমাত্র উপায় মেয়েটার কাছে কোন অস্ত্র নেই, তার কাছেও অবশ্য নেই। তবে তার শক্তিশালী হাত জোড়াই বা কম কিসে। গলা টিপে ধরলে...বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। মেয়েটার পাশের টেবিলে, হাতের

ঠিক নিচে, শুয়ে আছে রত্নখচিত ছোট একটি রিভলভার। অস্ত্রটা যদি আগে হাতে নিতে পারে–

নিজের ইন্সটিংক্ট কিংবা লেভিটের চাউনি, যে কারণেই হোক সতর্ক করে তুলল মেয়েটাকে। লেভিট পিস্তলটা নেয়ার জন্যে লাফ মেরেছে, তার আগেই মেয়েটা ঝট করে তুলে নিল ওটা। তাক করে ধরল লেভিটের বুক লক্ষ্য করে! ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল, এত কাছ থেকে মিস হবার প্রশ্নই নেই। বুক হিম হয়ে গেল লেভিটের। নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ওলগা স্টোরমারের মত মহিলার রিভলভার গুলি ভর্তি থাকারই কথা।

তবে বাঁচার উপায় এখনও আছে। মেয়েটা দরজার কাছ থেকে সরে এসেছে। লেভিট যদি ওকে হামলা না করে, মেয়েটা না-ও গুলি করতে পারে। যা হোক, ঝুঁকি ওকে নিতেই হবে একেঁবেঁকে দৌড় দিল সে দরজার দিকে। এক ছুটে পার হয়ে এল হলঘর, তারপর বেরিয়ে পড়ল সদর দরজা দিয়ে। দড়াম করে বন্ধ করল দরজা। শুনল মেয়েটা কাঁপা, ভোঁতা গলায় চেঁচাচ্ছে 'পুলিশ! খুন!' বলে। পুলিশ ডাকার কথা কাউকে শোনাতে হলে আরও জোরে চেঁচাতে হবে মেয়েটকে। তার আগেই কেটে পড়বে লেভিট। ঝড়ের বেগে নেমে এল সে সিঁড়ি বেয়ে, চলে এল খোলা রাস্তায়। তারপর ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগল। মিশে গেল পথচারীদের ভিড়ে। ওকে দ্রুত পৌঁছুতে হবে গ্রেভসেন্ডে। ওখানে একটা বোট অপেক্ষা করছে তার জন্যে। লেভিটকে অনেক দূরের এক জায়গায় নিয়ে যাবে। বোটের ক্যাপ্টেনকে চেনে সে। লেভিটের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করবে না। একবার বোটে উঠে সমুদ্রে যেতে পারলেই হয়, লেভিটের টিকিটির খোঁজও পাবে না কেউ।

তিন

রাত এগারোটার সময় বেজে উঠল ডানাহানের ফোন। ওলগার কণ্ঠ।

'মিস রায়ানের জন্যে একটা চুক্তি সই করে ফেলো, কেমন? ওকে দিয়ে 'কোরা'র পার্টটা করাব ভাবছি। আজ রাতে ও আমার যে উপকার করেছে তাতে ওর জন্যে আমার কিছু একটা করা দরকার। কি বললে? ও হ্যাঁ, ঝামেলা শেষ হয়েছে। হ্যাঁ, মিস রায়ানের কফির মধ্যে তোমার ওই ওষুধটা মিশিয়ে দিয়েছিলাম। বেশ কাজ হয়েছে। ওর মুখে বেগুনি আঠা লেপে দিয়েছি আর বাঁ হাতে টরনিকোয়েট বেঁধে দিয়েছি। ওই যে শিরা চেপে ধরার যন্ত্রটা। রহস্যময় মনে হচ্ছে? কাল সকাল পর্যন্ত রহস্যের মধ্যেই থাকো। এখন সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারব না। আমার কাজের মেয়েটা নাটক দেখে ফেরার আগেই ক্যাপ আর অ্যাপ্রন খুলে ফ্রেশ হয়ে নিতে হবে। মেয়েটা বলেছিল কি একটা খুব ভাল নাটক দেখবে। তবে সবচে' সেরা নাটকটা আজ ও মিস করল। জীবনের সবচে' ভাল অভিনয় করেছি আমি আজ রাতে, ড্যানি। জেক লেভিট যে সত্যি একটা ভীতুর ডিম তা প্রমাণ করে দেখাল। আর ড্যানি, আমি যে সত্যি অভিনয় জানি তাও নিজের কাছে প্রমাণ হয়ে গেল।'

মূলঃ আগাথা ক্রিস্টি
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

হিচ-হাইকার

নতুন একটা গাড়ি কিনেছি আমি। বি.এম.ডব্লিউ. মডেলের, হালকা নীল। বেশ বড় গাড়ি, ঘণ্টায় সর্বোচ্চ স্পীড ১২৯ মাইল। বসার সিটগুলো গাঢ় নীল, জেনুইন লেদারে তৈরি। বাটনে চাপ দিলে দরজা আপনা থেকে খুলে যায়, ছাদও তাই। রেডিওর সুইচ অন করলেই এরিয়ালটা খাড়া হয়ে যায়। আর যেই সুইচ অফ করি, অদৃশ্য হয়ে যায় জিনিসটা। গাড়ির ইঞ্জিন দারুণ শক্তিশালী। সম্ভবত একারণেই স্লো স্পীডে ওটা রীতিমত ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করতে থাকে। কিন্তু ষাটে উঠলেই ঘোঁতঘোঁতানি বন্ধ হয়ে যায়। মনে হয় যেন হৃষ্ট চিত্ত বেড়াল আনন্দে গরগর করছে।

গাড়িটা কেনার কয়েকদিন পরে আমি লণ্ডনের পথে যাত্রা শুরু করলাম। জুনের ঝকঝকে একটি দিন। রাস্তার দু'পাশে শস্য খেত, সোনালি রঙের ঝুমকো ফুল ফুটে আছে। দেখতে ভালই লাগছে। আমি সত্তর মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছি। সিটে হেলানো গা, হালকা ভাবে হাত দুটো রেখেছি হুইলে। মনের আনন্দে শিস বাজাচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল লোকটাকে। রাস্তার ধারে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। থামতে বলছে আমাকে, স্পীড কমিয়ে আনলাম, লোকটার পাশ ঘেঁষে দাঁড় করালাম গাড়ি। হিচ-হাইকারদের লিফট দিতে কখনও আপত্তি করি না আমি। একা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পাশ দিয়ে অগ্রাহ্য করে ছুটে যাওয়া গাড়ি দেখে নিজেকে কেমন অসহায় লাগে ভালই জানা আছে আমার। দেখেও না

দেখার ভান করে যে সব ড্রাইভার তাদের মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করে আমার। বিশেষ করে তিন তিনটে সিট খালি থাকা সত্ত্বেও যারা গাড়ি থামায় না, তাদেরকে।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বড় গাড়ির মালিকরা হিচ-হাইকারদের খুব কমই লিফট দেয়। ছোট, লঝঝরে গাড়ির মালিকরা এসব ব্যাপারে বেশ উদার। আর দেখেছি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যেসব বাবা-মা ঘুরতে বেরোয় তারাও লিফট দিতে কার্পণ্য করে না।

আমার গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিল লোকটা। 'স্যর কি লণ্ডনের দিকে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'উঠে পড়ুন।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লোকটা। গাড়ি ছেড়ে দিলাম আমি।

লোকটা ছোটখাট, চেহারাটা ইঁদুরের মত। কালো চোখে সতর্ক এবং ধূর্ত দৃষ্টি। কানজোড়া আগার দিকে সামান্য ছুঁচলো। কাপড়ের একটা ক্যাপ মাথায়। পরনের ধূসর রঙের জ্যাকেটে অনেকগুলো পকেট। ধূসর জ্যাকেট, চকচকে চোখ, ছুঁচলো কান, সব মিলে লোকটাকে আমার কেমন ইঁদুর ইঁদুর মনে হতে লাগল।

'লণ্ডনের কোথায় যাবেন আপনি?' জানতে চাইলাম।

'এপসমে,' জবাব দিল সে। 'ঘোড়দৌড় দেখতে। আজ রেস আছে ওখানে।'

'তাই?' বললাম আমি। 'আপনার সাথে যেতে পারলে ভালই লাগত আমার। রেসে বাজি ধরতে পছন্দ করি আমি।'

'আমি ওসব বাজি টাজি ধরি না,' বলল সে। 'এমনকী ঘোড়াদের দৌড়ও দেখি না। গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে বিশ্রী লাগে।'

'তা হলে ওদিকে কেন যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

লোকটার কপাল কুঁচকে উঠল। মনে হলো অনধিকার চর্চা করে ফেলেছি। মুখ অন্ধকার করে সে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল, বলল না কিছু।

'আপনি রেসের টিকেট বিক্রি করেন নাকি?' হালকা গলায় প্রশ্ন করলাম।

'ও তো আরও জঘন্য কাজ,' জবাব দিল সে। 'টিকেট বিক্রির মধ্যে কোনও মজাই নেই। একটা নির্বোধও ও কাজ ভাল পারে।'

তারপর অনেকক্ষণ কেউ কিছু বললাম না। ঠিক করলাম লোকটার কাছে আর কিছু জানতে চাইব না। কোথায় যাচ্ছেন? কেন যাচ্ছেন? আপনি কী কাজ করেন? বিয়ে করেছেন? গার্ল-ফ্রেণ্ড আছে? নাম কী তার? আপনার বয়স কত? ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন একজন হিচ-হাইকারকে কী পরিমাণ বিব্রত করে তোলে তা আমার চেয়ে কেউ ভাল জানে না। আগে যখন রাস্তায় কারও লিফট চাইতাম এরকম বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত আমাকে। খুবই রাগ লাগত। এসব আউল-ফাউল প্রশ্নের কোনও মানে নেই। আরে বাবা, দয়া করে লিফট দিয়েছ, ব্যস। গন্তব্যে পৌঁছে দিলে দাও, না হলে নামিয়ে দাও গাড়ি থেকে। হ্যানোত্যানো প্রশ্ন করার কী দরকার?

'দুঃখিত,' বললাম আমি। 'আপনি কী করেন জানতে চাওয়া ঠিক হয়নি আমার। আসলে সমস্যা কী—আমি একজন লেখক। আর লেখকদের বাজে অভ্যেস আছে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর।'

'আপনি গল্প লেখেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।'

'গল্প লেখা ভাল কাজ,' বলল লোকটা। 'দক্ষতা প্রয়োজন, এটাকে আমি সেরকম একটা কাজ বলে মনে করি। আমিও এমন একটা কাজের সাথে জড়িত, যাতে দক্ষতা লাগে। তবে যাদের

পেশায় দক্ষতা দেখাবার কিছু নেই সে সব লোকদের আমি দু'পয়সাও দাম দিই না। আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'জীবনের গোপন রহস্য হলো,' বলল সে, 'সবচেয়ে শক্ত কাজে সবচেয়ে ভাল দক্ষতা প্রদর্শন।'

'আপনি নিশ্চয়ই তা করে থাকেন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'অবশ্যই আপনার মতই।'

'আপনি কী করে বুঝলেন আমি আমার পেশায় খুব দক্ষ?' লোকটাকে বাজিয়ে দেখতে চাইলাম। 'বাজারে তো প্রচুর আজেবাজে লেখক আছেন।'

'নিজের পেশায় খুব ভাল কাজ দেখাতে না পারলে এত বড় গাড়ি আপনি চালাতে পারতেন না,' বলল সে। 'গাড়িটা নিশ্চয়ই খুব দামি।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি।

'সর্বোচ্চ স্পীড কত?'

'ঘণ্টায় একশো উনত্রিশ মাইল।'

'উঁহুঁ, বিশ্বাস হয় না।' এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে। দামি হলেও গাড়িটা এত স্পীড তুলতে পারবে না।'

'অবশ্যই পারবে ' তীক্ষ্ণ গলা আমার।

'গাড়ির কোম্পানিগুলো বেশিরভাগই মিথ্যাবাদী,' বলল সে। 'বিজ্ঞাপনে যতই বড়াই করুক না কেন, আসল কাজে সব লবডঙ্কা আর ভুয়া।'

'আমার গাড়ি অন্তত ভুয়া নয়,' ধমথমে গলায় বললাম আমি।

'তা হলে যাচাই হয়ে যাক,' বলল লোকটা। 'দেখান আপনার গাড়ির কারিশমা'

জিদ চেপে গেল আমার। অ্যাকসেলারেটরে দাবিয়ে দিলাম পা, ঘোড়ার মত সামনের দিকে লাফ মারল আমার গাড়ি। কয়েক

সেকেণ্ডের মধ্যে স্পীড উঠে এল নব্বুইতে

'বাহ্! বাহ্!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা 'তোফা চলছে! চালিয়ে যান!'

অ্যাকসেলেরেটরে পায়ের চাপ বাড়ল আমার, সেই সাথে বেড়ে চলল গতি।

'একশো!' চিৎকার করতে থাকল হিচ-হাইকার। '...একশো পাঁচ!'...একশো দশ!...একশো পনেরো! চালিয়ে যান! থামবেন না!'

বিদ্যুৎ গতিতে অসংখ্য গাড়িকে পাশ কাটাতে লাগলাম আমরা। মনে হলো সবগুলো যেন স্থির দাঁড়িয়ে আছে-একটা সবুজ মিনি, ক্রিম কালারের একটা বড় সিত্রো, সাদা রঙের একটা ল্যাণ্ডরোভার, কণ্টেইনার বোঝাই বিরাট এক ট্রাক, কমলা রঙের একটা ফক্সওয়াগন মিনিবাস...।

'একশো বিশ!' উত্তেজনায় আমার যাত্রী লাফাতে শুরু করল। 'চালান! চালান! একশো উনত্রিশে নিয়ে যান!'

ঠিক এই সময় পুলিশের সাইরেন শুনতে পেলাম আমি। এত জোরে, মনে হলো গাড়ির পাশেই যেন শব্দটা বাজছে। পরমুহূর্তে এক পুলিশ অফিসারের মোটরসাইকেল দেখলাম, আমাদের পাশ কাটাল। হাত তুলে থামতে বলল অফিসার।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলাম আমি। 'এবার আর রক্ষা নেই!'

পুলিশ অফিসার নিশ্চয়ই একশো ত্রিশ মাইল স্পীডে চালাচ্ছিল। কারণ তার বাহনের গতি কমাতে বেশ সময় নিল সে। শেষে রাস্তার ধারে মোটরসাইকেল দাঁড়া করাল। আমি গাড়ি নিয়ে তার পেছনে চলে এলাম। 'পুলিশের মোটরসাইকেল এত দ্রুত চলে জানতাম না,' মৃদু গলায় বললাম আমি।

'এটা পারে,' বলল আমার যাত্রী। 'ওটা আপনার মডেলেরই তো। বি.এম.ডব্লিউ। রাস্তার রাজা বলে লোকে এই

বাইকগুলোকে। আর এই বাইকগুলোই পুলিশের লোকেরা আজকাল ব্যবহার করছে।'

পুলিশ অফিসার মোটরসাইকেল থেকে নামল। হাতের গ্লাভস খুলে সাবধানে রাখল সিটের ওপর। ধীর গতিতে কাজগুলো করছে সে, কোনও তাড়া নেই। বাগে পেয়েছে সে আমাদেরকে।

'সমস্যা হবে মনে হচ্ছে,' বললাম আমি 'লোকটার ভাবগতিক সুবিধের ঠেকছে না।'

'যা জিজ্ঞেস করবে তার অতিরিক্ত কিছু বলতে যাবেন না, আমার সঙ্গী সতর্ক করে দিল। 'এখন চুপচাপ বসে থাকুন।'

যেন সিংহ এগিয়ে এল তার সহজ শিকারের দিকে, পুলিশ অফিসার ধীরে সুস্থে পা বাড়াল আমাদের লক্ষ্য করে। পেট মোটা লোকটা মাংসের একটা পাহাড়, কাপড় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে গোবদা উরু। হেলমেটের ওপর গগলস তুলে দিয়েছে, প্রশস্ত থুতনিঅলা মুখটা টকটকে লাল।

স্কুল পালানো ছেলেরা হাতেনাতে ধরা পড়লে যেমন হয়, সেরকম মুখ করে বসে থাকলাম দু'জনে।

'লোকটার চেহারা দেখেছেন?' ফিসফিস করে বলল আমার সহযাত্রী। 'যেন নরক থেকে উঠে এসেছে।'

পুলিশ অফিসার গাড়ির খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, মাংসল একখানা হাত রাখল চৌকাঠে। 'এত তাড়া কীসের?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কোনও তাড়া নেই, অফিসার,' বললাম আমি।

'মনে হয় আসন্ন প্রসবা কোনও মহিলাকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়াচ্ছিলেন?'

'জী না, অফিসার।'

'নাকি আপনার বাড়িতে আগুন লেগেছে আর আপনি আপনার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ছুটছেন?' লোকটার কণ্ঠ ভয়ঙ্কর রকম

শান্ত। ঝড় ওঠার পূর্বাভাস।

'আমার বাড়িতে আগুন লাগেনি, অফিসার।'

'তা হলে,' বলল সে। 'আমাকে ধরে নিতে হচ্ছে বেহুদাই আপনি ছোটাছুটি করছিলেন। জানেন, এখানে সর্বোচ্চ গতি সীমা কত?'

'সত্তর,' বললাম আমি।

'তা হলে কি আপনি অনুগ্রহ করে বলবেন কত মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিলেন?'

শুধু কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। জবাব দিলাম না। যেন বাজ পড়ল গাড়িতে। লাফিয়ে উঠলাম আমি, গলার সব শক্তি একত্র করে চেঁচাতে চেঁচাতে অফিসার বলল, 'ঘণ্টায় একশো উনত্রিশ মাইল বেগে আপনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন স্পীড লিমিটের পঞ্চাশ মাইলেরও ওপরে!'

মুখ ঘুরিয়ে একদলা থু থু ফেলল সে। গাড়ির উইং-এ গিয়ে পড়ল ঘিনঘিনে জিনিসটা, পিছলে নামতে শুরু করল নীচের দিকে। আবার আমাদের দিকে ফিরল অফিসার, কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল আমার সহযাত্রীর দিকে। 'আপনি কে?' ধারাল গলায় জানতে চাইল সে

'একজন হিচ-হাইকার' জবাব দিলাম আমি 'ওকে লিফট দিচ্ছি।'

'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি ওকে জিজ্ঞেস করেছি

'আমি কি আপনার কোনও সমস্যা করেছি?' গলায় এক পাউণ্ড মাখন লাগিয়ে বলল আমার সহযাত্রী

'তারচেয়েও বেশি,' বলল অফিসার 'যাক গে আপনি সাক্ষী হিসেবে থাকবেন আমি আপনার সাথে একটু পরে কথা বলছি। ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখি।' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল সে, হাত বাড়িয়ে দিল।

লাইসেন্স তুলে দিলাম আমি অফিসারের হাতে।

বাঁ দিকের ব্রেস্ট-পকেট খুলে সে টিকেট দেয়ার বই বের করল। লাইসেন্স থেকে আমার নাম আর ঠিকানা সতর্কভাবে টুকে নিল। তারপর ওটা আবার ফিরিয়ে দিল আমাকে। শরীর মুচড়ে গাড়ির সামনে চলে এল অফিসার, নাম্বার প্লেট দেখল ভাল করে। লিখল নাম্বার। তারিখ, সময় এবং আমার বক্তব্য। এক এক করে টুকল সব। তারপর টিকেটের মূল কপিটা ছিঁড়ে নিল বই থেকে। তবে আমাকে দেয়ার আগে ভাল করে কার্বন কপির ওপর নজর বোলাল কোনও কিছু বাদ পড়েছে কিনা দেখতে। সব শেষে বইটা টিউনিকের পকেটে রেখে বোতাম আটকাল।

'এবার আপনি।' ঘুরে গাড়ির অন্য পাশে চলে এল অফিসার অন্য ব্রেস্ট-পকেট থেকে ছোট, কালো রঙের একটা নোটবই বের করল। 'নাম কি?' ধমকে উঠল সে।

'মাইকেল ফিশ,' বলল আমার সহযাত্রী।

'ঠিকানা?'

'চোদ্দ, উইণ্ডসর লেন, লুটন।'

'নাম-ঠিকানা আসল কিনা প্রমাণ দেখান।' বলল পুলিশ অফিসার

মাইকেল ফিশ তার অগুণতি পকেট হাতড়াল দ্রুত, তারপর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বের করে দেখাল, অফিসার নাম আর ঠিকানা পরীক্ষা করে লাইসেন্সটা ফিরিয়ে দিল। 'কী কাজ করেন?' কঠোর গলা তার।

'আমি একজন যোগানদার।'

'কী?'

'রাজমিস্ত্রীর যোগানদার।'

'মানে?'

'মানে আমি রাজমিস্ত্রীর জন্যে...ইট, সুরকি, বালু ইত্যাদি

যোগান দিই।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি কার সঙ্গে কাজ করেন?'

'বিশেষ কারও সঙ্গে না। যার যখন প্রয়োজন পড়ে আমাকে ডাকলেই পায়।'

পুলিশ অফিসার মাইকেল ফিশের সব কথা লিখে নিল তার কালো নোটবুকে। বইটা পকেটে ঢুকিয়ে বোতাম লাগাল।

'থানায় আমার সাথে দেখা করবেন। আপনার আরও কিছু চেকিং-এর দরকার আছে,' বলল অফিসার।

'সেকী! আমি আবার কী করলাম?' ইঁদুর মুখো মাইকেল ফিশ অবাক হলো।

'কিছুই করেননি। কিন্তু আপনার চেহারাখানা আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না,' জবাব দিল অফিসার। 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমাদের ফাইলে যেন আপনার ছবি দেখেছি।' ঘুরে সে আমার জানালার পাশে চলে এল।

'আশা করি বুঝতে পেরেছেন, আপনি এখন বেশ বিপদের মধ্যে আছেন,' বলল অফিসার।

'জী, তা বুঝতে পারছি,' বললাম আমি।

'আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বাহারে গাড়ি আপনি চালাতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, অনেক দিন কোনও গাড়ি চালাবার সুযোগই আপনার হবে না। আর আশা করি অহেতুক তর্কাতর্কির দায়ে ওরা আপনাকে শ্রীঘরে ঢোকাবে।'

'তার মানে জেলখানায়?' সাবধানে প্রশ্ন করলাম আমি।

'জী, হ্যাঁ,' টাকরায় অদ্ভুত একটা শব্দ করল সে, 'গারদখানায় অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে আপনাকে ওখানে ঢোকানো হবে। আর বেশি কথা বলার জন্য জরিমানা তো হবেই। আর আদালতে আপনাদের দু'জনের সাথে দেখা হলে আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না। তা যাতে হয় সে ব্যবস্থা আমি

করব।'

ঘুরে দাঁড়াল মোটু। থপথপিয়ে এগোল তার মোটরসাইকেলের দিকে। চড়ে বসল। তারপর গর্জন তুলে একটু পরেই চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

'ফু!' সশব্দে শ্বাস ফেললাম আমি। 'ব্যাটা ঠিকই আমাদের কোর্টে হাজির করবে।'

'আপনি এখন কী করবেন, স্যর?' জানতে চাইল মাইকেল ফিশ।

'লণ্ডন পৌঁছেই আমার আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করব,' বলে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম আমি।

'ও জেলে ঢোকাবে বলল আর আপনি তা বিশ্বাস করে বসলেন?' বলল মাইকেল ফিশ। 'স্রেফ স্পীড বাড়ানোর দায়ে কখনও জেল হয় না।'

'আপনি ঠিক জানেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অবশ্যই,' মাথা দোলাল সে। 'এর শাস্তি বড় জোর লাইসেন্স কেড়ে নিয়ে মোটা অঙ্কের জরিমানা। ব্যস, ওখানেই ঘটনা শেষ।'

শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। 'আচ্ছা,' প্রশ্ন করলাম আমি, 'ওকে আপনি মিথ্যা বললেন কেন?'

'কে, আমি?' বলল ফিশ। 'কী মিথ্যা বলেছি?'

'এই যে বললেন আপনি রাজমিস্ত্রীর যোগানদার। কিন্তু আপনিই তো একটু আগে বললেন আপনি নাকি খুব ভাল একটা পেশার সাথে জড়িত?'

'আসলেও তাই,' বলল সে। 'কিন্তু ঠোলাদের কাছে সব কথা বলতে নেই।'

'আমাকে বলতে আপত্তি আছে?' মাইকেল ফিশ ইতস্তত করছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলতে লজ্জা পাচ্ছেন নাকি?'

'লজ্জা?' চিৎকার করে উঠল ফিশ। 'আমি লজ্জা পাব? তাও

আমার পেশা নিয়ে? সবচেয়ে সেরা পেশার মানুষটির চেয়ে আমার কাজ কোনও অংশে কম গর্বের নয়।'

'তা হলে বলতে চাইছেন না কেন?'

'আপনারা, লেখকরা বড় বেশি জিদ্দি।' বলল সে। 'আসল কথা না জানা পর্যন্ত শান্তি নেই মনে।'

'বললে বলবেন, না বললে না-ই!' অনাগ্রহের ভান করলাম আমি।

চোখের কোণ দিয়ে আমাকে দেখল ফিশ। 'মুখে বললেও বুঝতে পারছি ভেতরে ভেতরে আপনি ঠিকই আগ্রহে মরে যাচ্ছেন।'

ধরা পড়ে লজ্জা পেলাম। কিন্তু চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলাম।

'তবে আমার পেশাটা সত্যি অদ্ভুত,' বলল মাইকেল ফিশ। 'পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত পেশার লোক আমি।'

চুপ করে থেকে লোকটাকে কথা বলতে দিলাম।

'আর এজন্য আমাকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়। আমার পেশার কথা আপনাকে বলতে পারি। তার আগে বলুন আপনি সাদা পোশাকের কোনও টিকটিকি নন তো?'

'আমাকে কি টিকটিকির মত দেখায়?'

'তা অবশ্য দেখায় না,' স্বীকার করল ফিশ।

পকেট থেকে তামাকের কৌটা আর সিগারেট পেপারের প্যাকেট বের করল সে। সিগারেট বানাতে শুরু করল। আড়চোখে তার কার্যকলাপ লক্ষ করছি আমি। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে সিগারেট বানিয়ে ফেলল সে। এত দ্রুত গতি জীবনেও দেখিনি আমি। কাগজের দুই কিনারে আলতোভাবে জিভ দিয়ে স্পর্শ করল ফিশ, কাগজটা মুড়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজল। যেন শূন্য থেকে একটা লাইটার চলে এল তার হাতে। সিগারেটে আগুন ধরাল। আবার

চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল লাইটারটা। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে কাজটা করল সে।

'এত দ্রুত সিগারেট বানাতে আগে কখনও দেখিনি,' বললাম আমি।

'আচ্ছা।' জোরে ধোঁয়া টানল ফিশ। 'আপনি তা হলে আমাকে লক্ষ করছিলেন।

'লক্ষ করব না, বলেন কী! এ তো অসাধারণ একটা ব্যাপার।'

পেছনে হেলান দিল সে, মুচকি হাসি ঠোঁটে। 'কী করে এত দ্রুত কাজ করলাম জানতে ইচ্ছে করে না?' প্রশংসায় খুশি হয়েছে ফিশ।

'অবশ্যই।'

'দ্রুত কাজ করতে পারি আমার এই অসাধারণ আঙুলগুলোর জন্যে।' হাতজোড়া উঁচু করে দেখাল সে। 'পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা পিয়ানো বাদকের চেয়েও এই হাতের মুভমেণ্ট অনেক বেশি দ্রুত।'

'আপনি তা হলে পিয়ানো বাজান?'

'দূর, কী যে বলেন!' বলল ফিশ। 'আমার চেহারা পিয়ানো বাদকের মত নাকি?'

আমি ফিশের আঙুলের দিকে তাকালাম। লম্বা, সরু খুব সুন্দর দশটা আঙুল। মানুষটার চেহারার সাথে আঙুলগুলোর অভিজাত আকৃতি কিছুতেই মেলে না। যেন ব্রেন সার্জন কিংবা ঘড়ি নির্মাতার হাত হলেই বেশি মানাত।

'আমার কাজ,' বলে চলল সে, 'পিয়ানো বাজানোর চেয়েও অনেক কঠিন। যে কেউ পিয়ানো শিখতে পারে। আজকাল তো পিচ্চিপাচ্চাগুলোও একেকজন ওস্তাদ পিয়ানো বাদক। তাই না?'

'কম বেশি অনেকেই,' সায় দিলাম।

'কিন্তু আমার যে কাজ তা দশ লক্ষেও একজন পারবে কিনা

সন্দেহ। ভুল বললাম, এক কোটিতেও একজন। শুনে কেমন মনে হচ্ছে?'

'দারুণ,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ। আমার পেশাটাকে দারুণ বলতেই হবে,' আত্ম তুষ্টি ফিশের কণ্ঠে।

'আমার মনে হয় আপনার পেশার রহস্যটা আমি ধরে ফেলেছি,' উৎসাহী গলায় বললাম আমি। 'আপনি জাদুর খেলা দেখান। আপনি একজন জাদুকর, না?'

'আমি?' নাক কোঁচকাল সে। 'খেয়েদেয়ে তো আর কাজ নেই, বাচ্চাদের পার্টিতে গিয়ে জাদু দেখাব!'

'তা হলে আপনি তাসের রাজা। তাসখেলায় বিভিন্ন ট্রিকস দেখিয়ে লোকজনকে বোকা বানান।'

'দূর দূর!' আহত হলো ফিশ। 'তাস পেটার মত বিশ্রী জিনিস দুনিয়ায় আর দু'টি নেই।'

'তা হলে আর বলতে পারছি না।' হাল ছেড়ে দিলাম আমি।

গাড়ি এখন বেশ আস্তে চালাচ্ছি আমি। ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল স্পীডে। কারণ চাই না পথে আবার কোনও ইউনিফর্মধারী আমাদের থামাক। আমরা লণ্ডন-অক্সফোর্ডের মূল রাস্তায় চলে এসেছি। এখন ডেনহ্যামের দিকে চলেছি।

হঠাৎ মাইকেল ফিশ কালো চামড়ার একটা বেল্ট দেখাল আমাকে। 'জিনিসটা কখনও দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল সে। বেল্টের ব্রাশ বাকলে অদ্ভুত ডিজাইন।

'আরে!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'এটা তো আমার বেল্ট! আপনি পেলেন কোথায়?'

মুচকি হাসল সে। এদিক ওদিক বেল্টটা নাড়তে নাড়তে বলল, 'আপনার কী মনে হয়, কোত্থেকে পেয়েছি?' অবশ্যই আপনার ট্রাউজারের ওপরের অংশ থেকে।'

সাথে সাথে কোমরে হাত চলে গেল আমার। বেল্টটা নেই। 'গাড়ি চালানোর সময় কাজটা করেছেন নিশ্চয়ই?' বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা ঝাঁকাল সে। কুঁতকুঁতে চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে।

'তা কী করে সম্ভব।' বিস্মিত ভাবটা এখনও কাটেনি আমার। 'বেল্ট খুলতে হলে আগে আপনাকে বাকল খুলতে হয়েছে। তারপর সবগুলো লুপ দিয়ে জিনিসটাকে টেনে বের করতে হয়েছে। অথচ আমি দেখা দূরে থাক, টেরই পাইনি।'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল মাইকেল ফিশ। বেল্টটাকে কোলে ফেলল, ভোজবাজির মত তার আঙুলের ফাঁকে চলে এল বাদামী রঙের জুতোর ফিতে। 'আর এগুলো কার, জনাব?' ফিতেটা নাড়তে লাগল সে আমার মুখের সামনে।

'কার মানে?' বললাম আমি।

'এখানে কারও জুতোর ফিতে চুরি গেছে কি?' ঠোঁটে মুচকি হাসিটা ধরাই আছে ফিশের।

চট করে জুতোর দিকে নজর চলে গেল আমার। এক পায়ের জুতোর ফিতে উধাও। 'মাই গড!' রীতিমত আঁতকে উঠলাম আমি। 'এ কী করে হলো? আমি তো আপনাকে মাথা নীচু করতেই দেখিনি।'

'আপনি কিছুই দেখেননি,' অহঙ্কারী গলায় বলল ফিশ। 'আপনি আমাকে এক ইঞ্চি এদিক ওদিক নড়তে দেখেননি। কেন জানেন?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'আপনার ওই অসাধারণ আঙুলগুলোর জন্যে।'

'একেবারে ঠিক বলেছেন,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ব্যাপারটা খুব দ্রুত ধরে ফেলেছেন আপনি।' সিটে হেলান দিল মাইকেল ফিশ, হাতে বানানো একটা সিগারেট ধরাল। উইণ্ডশিল্ডের দিকে ছুঁড়ে

দিল ধোঁয়ার হালকা একটা স্রোত। আমাকে দুটো ট্রিকস দেখিয়ে বোকা বানিয়ে মজায় আছে সে। 'ক'টা বাজে বলুন তো?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সে।

'সামনেই তো ঘড়ি আছে,' বললাম আমি।

'গাড়ির ঘড়ির প্রতি আমার কোনও আস্থা নেই,' বলল সে। 'আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে?'

কব্জির আস্তিন গোটালাম সময় দেখার জন্যে। নেই। ঘড়িটাও উধাও। ফিশের দিকে ঝট করে তাকালাম। আমার চোখে চোখ রেখে হাসল সে।

'ঘড়িটাও নিয়ে নিয়েছেন!' বললাম আমি।

হাত বাড়াল ফিশ। মুঠো খুলল। তালুতে আমার রিস্টওয়াচ। 'আপনার ঘড়িটা খুব সুন্দর,' মন্তব্য করল সে। 'দামী এবং ভাল কোয়ালিটির। আঠারো ক্যারেট গোল্ড আছে এটাতে। সহজেই হাতে পরা যায়। খোলাও যায়। আসলে ভাল জাতের জিনিস খুলে নিতে সমস্যা হয় না।'

'কিছু মনে না করলে ঘড়িটা আমাকে ফিরিয়ে দেন,' ম্লান গলায় বললাম আমি।

সামনে; চামড়ার একটা ট্রে-র ওপর ঘড়িটা যত্নের সাথে রেখে দিল মাইকেল ফিশ, বলল, 'আমি আপনার কোন জিনিস মেরে দেব না, স্যর। কারণ আপনি এখন আমার বন্ধু। লিফট দিয়ে আমার বেশ বড় উপকার করেছেন।'

'শুনে খুশি হলাম,' শুকনো কণ্ঠ আমার।

'এখন আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দেব,' বলল ফিশ। 'আপনি আমার পেশার কথা জানতে চেয়েছিলেন। তা এখন বলব।'

'আপনি আমার কাছ থেকে আর কী কী জিনিস নিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আবারও হাসি ফিরে এল তার মুখে। জ্যাকেটের পকেট থেকে একটার পর একটা জিনিস বের করতে লাগল সে। সবগুলোই আমার জিনিস–ড্রাইভিং লাইসেন্স, চারটে চাবিসহ চাবির রিঙ, কয়েকটা পাউণ্ড, কিছু কয়েন, আমার প্রকাশকের একটা চিঠি, ডায়েরী, ভোঁতা একটা পেন্সিল, সিগারেট লাইটার, আর সবশেষে মুক্তো বসানো আমার স্ত্রীর অপূর্ব সুন্দর নীলকান্তমণির আংটিটি। আমি আংটিটা নিয়ে লণ্ডনের এক জুয়েলারীতে যাব ঠিক করেছিলাম। ওটার একটা মুক্তো হারিয়ে গেছে।

'এই জিনিসটাও খুব সুন্দর,' আঙুলে আংটিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল মাইকেল ফিশ। 'এটা অষ্টাদশ শতাব্দীর আংটি। আমার ধারণা জিনিসটা রাজা তৃতীয় জর্জের আমলের।'

'ঠিক বলেছেন।' লোকটার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ আমি। 'একদম ঠিক।' অন্য জিনিসগুলোর সাথে আংটিটাও সে চামড়ার ট্রে-তে রেখে দিল।

'তা হলে আপনার কাজ হচ্ছে মানুষের পকেট কাটা,' বললাম আমি।

'শব্দটা পছন্দ হলো না আমার,' প্রতিবাদ করল মাইকেল ফিশ। 'পকেট কাটা বা পকেট মারা কথাটাই কর্কশ এবং অশ্লীল। এ লাইনে অপেশাদার লোকদের আমরা পকেটমার বলি। এরা বড়জোর অন্ধ মহিলাদের পকেট কাটার সামর্থ্য রাখে।'

'তা হলে কী সম্বোধন করলে আপনি খুশি হন?'

'আমি? আমি একজন আঙুল বাজ। পেশাদার আঙুল বাজ।' গর্ব ফুটে উঠল তার কণ্ঠে, যেন সে রয়েল কলেজ অভ সার্জনস-এর প্রেসিডেন্ট কিংবা ক্যান্টারবারির বিশপ।

'এধরনের সম্বোধন জীবনেও শুনিনি,' বললাম আমি। 'নিজের আবিষ্কার বুঝি?'

'তা কেন হবে,' বলল সে। 'এই পেশায় যারা সবচেয়ে দক্ষ

তাদের "আঙুল বাজ" বলে সম্বোধন করা হয়। আমি আঙুলের কাজে সিদ্ধ হস্ত। তাই আমি আঙুলবাজ।'

'কাজটা নিঃসন্দেহে ইন্টারেস্টিং।'

'অসাধারণ বলুন,' বলল মাইকেল ফিশ।

'তা হলে আঙুলের কাজ করতেই আপনি ঘোড়দৌড় দেখতে যাচ্ছেন, তাই না?'

'রেসে কাজটা করা খুব সহজ,' বলল সে। 'রেস শেষ হবার পরে আপনি নিজে তার ওপর নজর রাখুন। এবং সুযোগ বুঝে তার টাকাটা হাতিয়ে কেটে পড়ুন। আর যে লোক সবচে' বেশি টাকা পেয়েছে তার পেছনে লেগে থাকুন। তারপর চান্স পেলেই...কিন্তু তাই বলে আমাকে ভুল বুঝবেন না, স্যর। আমি হারু পার্টিদের টাকা কখনও মারি না, গরিবদেরটাও না, আমি শুধু ধনী লোকদের পকেট খালি করি।'

'সে আপনার অভিরুচি,' বললাম আমি। 'কিন্তু এ পর্যন্ত ধরা খেয়েছেন ক'বার?'

●'ধরা?' অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল মাইকেল ফিশ। 'আমি খাব ধরা! ধরা খায় শুধু পকেটমাররা। আঙুল বাজদের টিকিও কেউ ছুঁতে প্যারে না। শুনুন, আমি চাইলে মুখ থেকে আপনার নকল দাঁতও খুলে আনতে পারি, টেরও পাবেন না।'

'আমার নকল দাঁত নেই,' বললাম আমি।

'আমিও জানি নেই,' বলল সে। 'থাকলে অনেক আগেই হাতিয়ে নিতাম।'

কথাটা বিশ্বাস হলো আমার। ওই লম্বা, মসৃণ আঙুলগুলো যা খুশি তাই করতে পারে।

বেশ খানিকক্ষণ কেউ কোনও কথা বললাম না। চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে গেলাম।

'পুলিশ অফিসারটা তো আপনার সম্পর্কে ঠিকই খোঁজ-খবর

নেবে,' একসময় বললাম আমি। 'ভাবছেন না ব্যাপারটা নিয়ে?'

'কেউ আমার ব্যাপারে খোঁজ নেবে না,' জবাব দিল ফিশ।

'অবশ্যই নেবে। অফিসার তার কালো নোট বইতে আপনার নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে গেল। নিজের চোখে দেখলাম।'

ধূর্ত হাসি ফুটল ইঁদুর মুখে। 'তাই, না?' বলল সে। 'কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি লোকটার স্মৃতিতে আমার কথা একদম নেই। আমি কখনও শুনিনি ঠোলাদের স্মৃতি শক্তি খুব ভাল হয়। অনেকে তো নিজের নামও মনে রাখতে পারে না।'

'স্মৃতিশক্তি দিয়ে কী হবে?' বললাম আমি, 'তার তো মনে রাখার দরকার নেই। নাম-ঠিকানা সবই তো লেখা আছে নোট বুকে।'

'হ্যাঁ, স্যর। তা আছে। কিন্তু সমস্যা হলো সে তার নোটবইটা হারিয়ে ফেলেছে, সাথে টিকেট বুকটাও। যেটার মধ্যে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ছিল।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ফিশের ডান হাতে ধরা আছে পুলিশ অফিসারের সেই নোট বুক দুটো। হাতিয়ে নিয়েছে সে অফিসারের পকেট থেকে।

'এত সহজ কাজ জীবনে করিনি আমি,' সগর্বে ঘোষণা করল মাইকেল ফিশ।

উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলাম আমি, 'ঠোলা ব্যাটা এখন আর আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ আমি নিশ্চিত ওই লোকের স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল।'

'আপনি সত্যি একটা জিনিয়াস!' চিৎকার করে বললাম আমি।

'ঠোলার কাছে এখন আমাদের কারও নাম নেই, নেই ঠিকানা, গাড়ির নাম্বার কিংবা অন্য কিছু,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে চলল সে।

'আপনি অসাধারণ বুদ্ধিমান!'

'আমার মনে হয় কিছুক্ষণের জন্যে গাড়িটা থামালে ভাল

করবেন আপনি,' বলল মাইকেল ফিশ। 'এই জঞ্জাল দুটো যত তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ফেলা যায় ততই মঙ্গল।'

'আপনার তুলনা নেই,' আরও জোরে চেঁচালাম আমি।

'ধন্যবাদ, স্যর,' নড করল আঙুল বাজ। 'প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে, বলুন?'

মূলঃ রোল্ড ডাহ্‌ল
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

চারপেয়ে

সেপ্টেম্বরের এক শুক্রবার, বিকেল পাঁচটায় হোমসের ছোট্ট মেসেজটা এল হাতে। ওতে লেখা:

'এক্ষুণি বাসায় চলে এসো–যত কাজই থাকুক তবুও এসো,'–শা. হো.।

বাহ্, আদেশের কী ছিরি?

শখের গোয়েন্দাপ্রবরের খেয়ালী মনের অন্যতম একটা ঘুঁটি যেন আমি। তাঁর পাইপ, টোবাকো আর অদ্ভুত জটিল সব কেসের মত আমিও হয়ে উঠেছি তাঁর অন্যতম ব্যবহারিক উপাদান। অপরাধের গন্ধ পেলেই হলো, আমাকেও হোমসের সাথে তাঁর যত বিতিকিচ্ছিরি চোর ঠ্যাঙানিতে অংশ নিতে হবে। তবে আমার অন্য ব্যবহারও রয়েছে। এটা সত্যি যে, তদন্তের বিভিন্ন পর্যায়ে হোমস আমার সাথে আলোচনা সেরে নেয়। গুরুত্ব দিয়ে শোনে আমার মতামত।

হোমসের বেকার স্ট্রীটের বাসায় ঢুকে দেখি আগুনের পাশে লম্বা আর্ম চেয়ারে আধ শোয়া অবস্থায় পাইপ টেনে চলছে সে। চেহারা দেখেই বুঝলাম–গভীর চিন্তায় মগ্ন। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। আমি যে একটা মানুষ, ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই তাঁর। এক সময় তাঁর স্বপ্নভঙ্গ ঘটল। আমার দিকে ফিরে সাদর আমন্ত্রণ জানাল, 'এসো ওয়াটসন, ভেতরে এসো। আমার ব্যবহারে কিছু মনে নিয়ো না। অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে গেছে

এদিকে। গত চব্বিশটা ঘণ্টা কেবল ভেবেই মরছি। কোনও কূলকিনারা তো হচ্ছেই না, উল্টো আমার অতি সাধারণ বুদ্ধিগুলোও কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। ভাবছি গোয়েন্দাগিরিতে কুকুরের ভূমিকা আর উপকারিতা নিয়ে কিছু লেখালেখি করব।'

'কিন্তু হোমস, এ তো অনেক পুরোনো ব্যাপার,' আমি বললাম।

'না ওয়াটসন, না। রহস্যময় আরও কিছু এরপরেও থেকে যায়। কোনও পরিবারের পোষা কুকুর দেখলে সেই পরিবার সম্পর্কে অনেক কিছুই ধারণা করতে পারবে তুমি। কিন্তু কখনও কি কোনও আনন্দঘন পরিবারে দুঃখের ওজনে নতজানু হয়ে পড়া কুকুর দেখতে পেয়েছ? অথবা একটি সুখী কুকুর কোনও দুঃখী পরিবারে?'

মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝে হাঁ করে তাকিয়েই রইলাম। হোমস সোজা হয়ে বসে আবার পাইপে অগ্নিসংযোগ করল।

'সমস্যাটা হলো: কেন প্রফেসর প্রেসবারির পোষা কুকুরটা তাঁর মনিবকে কামড়াতে গিয়েছিল?' হোমস এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল।

এখনও শূন্য ঠেকছে ওর কথা। যদিও এই হলোগে হোমসের স্টাইল। বলল, 'হায়রে, সেই পুরোনো ওয়াটসন! কখনও বুঝলে না ছোট ছোট ক্লুর উপরই দাঁড়িয়ে থাকে প্রকাণ্ড সব সিরিয়াস ব্যাপার-স্যাপার। প্রেসবারি, কেমব্রিজের বিখ্যাত গবেষক এবং বিজ্ঞানী, এ পর্যন্ত দু'বার তাঁর সাধের পোষা কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। এ থেকে কী বুঝলে?'

'কুকুরটা অসুস্থ,' মন্তব্য করলাম।

'সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু কুকুরটা অন্য কাউকে কামড়েছে সে-খবর এ নাগাদ পাইনি—একমাত্র নিজের মনিবকে ছাড়া। ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে ওয়াটসন, বড় বেশি ভাবাচ্ছে।'

দরজায় কড়া নাড়ল কেউ, হোমসের সাড়া পেয়ে এক তরুণ ঘরে প্রবেশ করল। বয়স খুব বেশি হলে ত্রিশ, পোশাকে-আশাকে ফিটফাট। চেহারা থেকে ছাত্র ছাত্র ভাবটা এখনও দূর হয়নি। হোমস সম্ভাষণ জানাল তাঁকে।

'আহ, মি. বেনেট, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার অতি পুরনো বন্ধু, ডা. ওয়াটসন। ওয়াটসন, ইনি মি. বেনেট, প্রফেসর প্রেসবারির সেক্রেটারি। তবে এটুকুই শেষ না, প্রফেসর সাহেবের একমাত্র কন্যার সাথে শীঘ্রি বিয়ে হতে চলেছে এর।'

'ডা. ওয়াটসন কি সব শুনেছেন?' তরুণ জিজ্ঞেস করল।

'না, তবে এক্ষুণি বলতে যাচ্ছিলাম,' জবাব দিল হোমস। 'ইউরোপের নামী দামী বিজ্ঞানীদের একজন এই প্রফেসর প্রেসবারি। বেশ ক'বছর আগে স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে তাঁর। সংসারে আপন বলতে একমাত্র মেয়ে, এডিথ। শক্ত প্রকৃতির, কিঞ্চিত রগচটা টাইপের ভদ্রলোক এই প্রেসবারি।

'পরিবর্তনটা মাস কয়েক আগে ধরা পড়ে। একষট্টি বছর বয়স্ক প্রফেসর প্রেসবারি হঠাৎ প্রফেসর মরফির সবচেয়ে ছোট মেয়েটির প্রেমে পড়লেন। ঠাণ্ডা, নিরুত্তাপ প্রেম নয়, যৌবনের বন্য প্রেমে উন্মত্ত হয়ে পড়লেন তিনি। স্বভাবতই পরিচিত সবাই তাঁর এই পাগলামিতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

'এ সময় হঠাৎ করেই প্রফেসরের আচরণ আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। আগে কখনও করেননি এমন অদ্ভুত সব কাণ্ড করে বেড়াতে লাগলেন তিনি। একদিন কাউকে না জানিয়েই গৃহত্যাগ করলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ কাটালেন অজ্ঞাতবাসে। যখন ফিরলেন, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। একদিন মি. বেনেট প্রফেসরকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটা চিঠি উদ্ধার করেন। প্রাগ থেকে জনৈক বন্ধু তাঁর ওখানে কটা দিন কাটানোর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পাঠিয়েছিলেন চিঠিটা। এভাবেই জানা গেল ওই দুটো সপ্তাহ

প্রফেসর কোথায় কাটিয়েছিলেন।

'এরপর আরও আশ্চর্য হয়ে ওঠে তাঁর কাজকারবার। নিজের চারপাশে একটা গোপন দেয়াল গড়ে তুললেন তিনি। বাসায় কেউ তাঁর মাঝে পুরনো মানুষটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশ্য মানসিকভাবে তিনি সম্পূর্ণ শান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসও নিচ্ছেন চমৎকার। মি. বেনেট, আপনি বরং চিঠিগুলোর কথা ওয়াটসনকে বলুন।'

'বলছি,' মি. বেনেট শুরু করল। 'আমার ওপর প্রফেসর বরাবরই অগাধ আস্থা রাখতেন। অনেক সময় ব্যক্তিগত সেক্রেটারির মত তাঁর চিঠিপত্রগুলো খুলে পরীক্ষা করতে হত আমাকে। কিন্তু প্রাগ থেকে ফিরে সম্পূর্ণ বদলে গেলেন তিনি। প্রায়ই খামের ওপর ক্রস আঁকা চিঠি আসে তাঁর কাছে। বিশেষ করে এই ক্রস চিহ্ন আঁকা খামগুলো না ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্যে কঠোরভাবে নির্দেশ দেন আমাকে। প্রফেসর ওই বিশেষ চিঠিগুলোর জবাব দিতেন কিনা, তাও দেখিনি।'

'আর বাক্সটা?' হোমস বলল।

'ও হ্যাঁ, বাক্সটার প্রসঙ্গে আসি। ছোট্ট কাঠের একটা বাক্স প্রফেসর নিয়ে এসেছিলেন। সম্ভবত জার্মানীর তৈরি। লাইব্রেরিতে রাখা হয়েছে ওটা। একদিন কী একটা জিনিস খুঁজতে গিয়ে এক পর্যায়ে বাক্সটা হাতে তুলে নিই আমি। তা দেখে প্রফেসর রেগেমেগে প্রচণ্ড ধমক লাগালেন আমাকে। রীতিমত অভাবনীয় ব্যাপার! এত তুচ্ছ কারণে এর আগে কখনও তাঁকে পাড়া কাঁপিয়ে চেঁচামেচি করতে দেখিনি। যতই বোঝাই বাক্সটা খোলার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না, ততই অবুঝ হয়ে ওঠেন তিনি। জুলাই-এর দুই তারিখের ঘটনা এটা।'

'ধন্যবাদ, তারিখটা এক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর,' হোমস বলল।

'এরপর থেকে প্রফেসর প্রেসবারির ওপর সতর্ক নজর রাখতে থাকি,' মি. বেনেট বলে চললেন। 'সেই একই দিন—জুলাই-এর দুই তারিখে—কুকুরটা তাঁকে আক্রমণ করে। জুলাই-এর ১১ আর ২০ তারিখেও কুকুরটা আক্রমণ করে তাঁকে। সেই থেকে চব্বিশ ঘণ্টা ওটাকে শিকলবন্দী করে রাখা হয়েছে।'

খানিকটা অন্যমনস্কের সুরে হোমস বলল, 'সত্যিই অস্বাভাবিক।...এরপরে আর কোনও উল্টো পাল্টা আচরণ লক্ষ্য করেছেন তাঁর মধ্যে?'

'হ্যাঁ, এই সেপ্টেম্বরেরই চার তারিখ, মানে গত পরশু রাতের কথা,' জবাবে শুরু করল মি. বেনেট। বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে এখন তাঁকে। 'অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাবে কাজ করে মাত্র বিছানায় শুয়েছি। রাত প্রায় দুটো হবে তখন। বাইরে প্যাসেজ থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেলাম। দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে দেখি, কী যেন একটা চুপিসারে প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে। এক সময় বারান্দার আলোতে এল ওটা। চমকে উঠে দেখি, স্বয়ং প্রফেসর প্রেসবারি ক্রল করে এগোচ্ছেন। একবার ভাবুন মি: হোমস, তাঁর মত একটা মানুষ হাতে পায়ে ভর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হামাগুড়ি খাচ্ছে। আমাকে দেখে লাফ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁরস্বরে একটা হাঁক ছেড়ে এক ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। হতভম্ব হয়ে প্রায় ঘণ্টা খানেক ওখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু প্রফেসর আর ফেরেননি।'

আমার দিকে তাকিয়ে হোমস প্রশ্ন করল, 'কী বুঝলে?'

'ভদ্রলোক সম্ভবত অসুস্থ। এমন একটা অসুখ যার প্রভাবে তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে অক্ষম,' আমি ভেবেচিন্তে বললাম।

'সম্ভবত, কিন্তু মি. বেনেট কী বললেন শুনলে না? তাঁকে দেখেই প্রফেসর লাফিয়ে উঠে পালান।'

'তাঁর স্বাস্থ্য কখনও ভাল দেখিনি,' মি. বেনেট বলল। 'কিন্তু

গত পরশু রাতে তাঁর ক্ষিপ্রতার যে নমুনা দেখলাম বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। এখন কী যে করি...অথচ এডিথ, মানে মিস্ প্রেসবারি আর আমি দুজনেই বুঝি কিছু একটা করতে হবে। আর খুব তাড়াতাড়ি।'

'বড় অদ্ভুত সমস্যা। তোমার কী মনে হয়, ওয়াটসন,' হোমস বলল।

আমি উত্তর দিলাম, 'ডাক্তার হিসেবে আমার মনে হচ্ছে সমস্যাটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে জড়িত। বোধহয় ওই তরুণী মেয়েটার প্রেমে পড়ে প্রফেসরের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। তিনি নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিলেন হয়তোবা মেয়েটাকে ভুলতেই। আর ওই চিঠিগুলো এবং বাক্সটার ব্যাপার আলাদা হতে পারে–সম্ভবত অর্থ সম্পর্কিত কোনও বিষয় হবে।'

'তা হলে পোষা কুকুরটার খ্যাপাটে আচরণের কারণও কি অর্থ সম্পর্কিত বিষয় বলে মনে করো?'

হোমস হেসে বলল। 'না, ওয়াটসন, ভেতরে আরও রহস্য রয়েছে।'

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী। মি. বেনেটের পাশে এসে দাঁড়াল সে।

হোমস বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই মিস প্রেসবারি, যদি না আমার ভুল হয়ে থাকে–'

'মি. হোমস, আমার বাবার জন্যে কি কিছু করতে পারেন না?' তরুণী প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে বলে উঠল।

'পুরো ঘটনা এখনও ঝাপসা ঠেকছে। তবুও কথা দিচ্ছি, সাধ্যের বাইরে চেষ্টা করব আমি। এখন আপনি কি নতুন কিছু শোনাতে পারেন?'

'গতকাল গোটা দিনই বাবার আচরণ ভীষণ অন্যরকম ঠেকছিল,' মেয়েটা শুরু করল। 'গতরাতে কুকুরটার ডাকে হঠাৎ

ঘুম ভেঙে যায়। আমার বেডরুম তিনতলাতে। শুয়ে শুয়েই জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। মাই গড! বললে বিশ্বাস করবেন না–বাবাকে দেখতে পেলাম আমি। উহ্! কী কঠিন মুখে তাকিয়েছিল। বিস্ময়, আতঙ্ক আর অবিশ্বাসে আমার তখন আধমরা অবস্থা। নড়ব, সেই শক্তিটুকুও পাচ্ছিলাম না। বাবা প্রায় আধমিনিট ওভাবে হিংস্র চেহারা বানিয়ে তাকিয়ে ছিলেন তারপর একরকম হঠাৎ করেই যেন মিলিয়ে গেলেন আঁধারে। সকাল থেকেই ভীষণ খাপ্পা মেজাজে রয়েছেন উনি। যদিও গত রাতের প্রসঙ্গ নিয়ে কোনও কথা হয়নি আমাদের মধ্যে। আমার নিজে থেকেও ও নিয়ে কোনও কথা তুলতে ইচ্ছে করছিল না।'

'আপনার ঘরের জানলা পর্যন্ত পৌঁছানোর উপায় কী?' হোমস জিজ্ঞেস করল।

'কোনও উপায় নেই,' মিস্ প্রেসবারি জবাব দিল। 'মাটি থেকে ত্রিশ ফুট উপরে ওটা। অথচ বাবা অত উঁচুতে ঠিকই উঠেছিলেন।'

'গতকাল, অর্থাৎ পাঁচ তারিখের ঘটনা এটা,' হোমস বলল। 'কেমন যেন হ-য-ব-র-ল ঠেকছে...যাকগে মি. বেনেট, এ মুহূর্তে আমাদের একটাই করণীয়। প্রফেসর সাহেবের সাথে দেখা করা। কালই আমরা দুজনে কেমব্রিজ যাচ্ছি।'

সোমবার সকালে কেমব্রিজগামী ট্রেনে চেপে বসলাম দুজনে। স্টেশনে নেমে হোটেলে না পৌঁছানো পর্যন্ত একটা কথাও বলল না হোমস।

হোটেলে পৌঁছে মুখ খুলল হোমস। 'লাঞ্চের আগেই প্রফেসরের সাথে দেখা করা দরকার, ওয়াটসন।'

'তাঁর ওখানে যে যাব, কী কারণ দেখাব?' আমি জিজ্ঞেস করি।

হোমস একটা কাগজের টুকরো বের করে চোখ বোলাল।

'মি. বেনেটের দেয়া তারিখগুলোর লিস্ট এটা। দেখা যাচ্ছে ২৬ আগস্ট প্রফেসরের মাঝে পাগলামির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। এ ধরনের আচরণের কথা সুস্থ অবস্থায় তাঁর মনে না থাকারই কথা। কাজেই তাঁর সাথে অ্যাপয়েনমেন্ট ছিল এ ধরনের একটা ভান আমরা অনায়াসে করতে পারি।'

শহরের দক্ষিণে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রফেসর প্রেসবারির বাড়ি। বিরাট প্রাসাদ, চমৎকার একটা বাগান ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে। রহস্যময় বিজ্ঞানীর লাইব্রেরি রুমে আমরা প্রবেশ করলাম। ভদ্রলোকের মুখের ভাব দেখে এতটুকু অস্বাভাবিক মনে হলো না তাঁকে। যথেষ্ট লম্বা তিনি, মুখে সিরিয়াস একটা ভাব। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং পরিষ্কার।

'বসুন আপনারা। কী করতে পারি আপনাদের জন্যে,' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমিও আপনাকে সেই একই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, প্রফেসর,' হোমস জবাব দিল।

'এর অর্থ?'

'বোধহয় কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। আমাদের বলা হয়েছিল আপনি নাকি আমাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন।'

'তাই?' ধূসর রঙের একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ যেন ভস্ম করে ফেলবে হোমসকে। 'জানতে পারি কী, কে আপনাদের খবর পাঠিয়েছিল?'

'দুঃখিত, প্রফেসর, ব্যাপারটা গোপনীয়,' হোমস বলল। 'এখন মনে হচ্ছে লোকটা ভুল খবর পাঠিয়েছিল।'

প্রফেসরের কণ্ঠ গমগম করে উঠল, 'আপনার বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ওই লোকের পাঠানো চিঠি কিংবা টেলিগ্রাম দেখাতে পারেন?'

'না, প্রফেসর।'

প্রেসবারি দরজার কাছে হেঁটে গেলেন। গলা চড়িয়ে ডাকলেন তাঁর সেক্রেটারিকে।

'ভেতরে এসো, বেনেট। এই ভদ্রলোক বলছেন তাঁকে নাকি এখানে আসার জন্যে খবর দেয়া হয়েছে। মনে করে বলো তো, হোমস নামে কারও কাছে তুমি চিঠি পাঠিয়েছিলে কিনা?'

'না, স্যর,' মিন মিন করে জবাব দিল সেক্রেটারি।

'দ্যাট ইজ ফাইনাল।' গলার রাগিনী আরও এক পর্দা চড়ল।

'এবার মি. হোমস, আমি নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা আশা করতে পারি।'

দরজা আর আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি। থর থর করে কাঁপছে তাঁর হাত দুটো। রক্তচক্ষু মেলে মাপছেন আমাদের। প্রস্তুত আমিও। দরকার হলে তাঁকে ঠেলেই 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' করতে করতে ছুট দেব।

বেনেট চেঁচিয়ে উঠল, 'দোহাই, স্যর, আপনার পজিশনের কথা একবার ভাবুন। মি. হোমসও একজন নামকরা গোয়েন্দা। তাঁর সাথে আপনি এরকম ব্যবহার করতে পারেন না।'

অবশেষে প্রফেসর পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। আমরাও আর কথা না বাড়িয়ে খুশি মনেই বাগানে এলাম। হোমসকে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। বেনেটও আমাদের পিছু নিয়ে আসছিল। বলল, 'আমি দুঃখিত, মি. হোমস। স্যরের এরকম মারমুখো মূর্তি আমি আগে কখনও দেখিনি। এখন তো বুঝলেন, কেন আমরা এত চিন্তিত হয়ে পড়েছি। অথচ এরপরও কিন্তু উনি মানসিকভাবে সুস্থ।'

'হুঁ, একটু বেশিই সুস্থ,' হোমস বলল, 'ভাল কথা, মিস্ প্রেসবারির বেডরুমটা কোন্‌দিকে?'

বাড়ির এক প্রান্তে আমাদের নিয়ে এল বেনেট।

'ওই যে, দেখা যাচ্ছে,' আঙুল তুলে তিনতালার একটা জানলা

দেখাল সে। 'আপনিই বলুন, ওখানে পৌঁছানো সম্ভব কি না? দেয়াল ঘেঁষা ওই উঁচু গাছটা থাকলেও ওটা বেয়ে অত ওপরে ওঠা সম্ভব না—অন্তত আমার পক্ষে। তা ছাড়া কাজটা বিপজ্জনকও, নয়কি? ও হ্যাঁ, আপনার জন্যে রেখেছিলাম...এই কাগজটা নিন। জনৈক লণ্ডনবাসীর নাম আর ঠিকানা। প্রফেসরের কাছে চিঠি লিখেছিল, আমি ক্রস আঁকা একটা খামের ওপর থেকে নাম ঠিকানা টুকে রেখেছি।

বেনেটের দেয়া কাগজের ওপর চোখ বুলাল হোমস।

'ডোরাক—বেশ অদ্ভুত নাম তো! সম্ভবত চেক্ নাগরিক। নাটকে তাঁর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এখন তা হলে আসি, মি. বেনেট। ওয়াটসন আর আমি আগামীকাল লণ্ডনের ট্রেন ধরব।'

'কিন্তু এদিকটায় কী হবে?' সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করল।

'ধৈর্য ধরুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস আজ থেকে ঠিক একহপ্তা পরের শনিবারটা হবে নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। ওদিন আবার আপনার সাথে দেখা হবে। আর এই ক'টা দিন মিস্ প্রেসবারিকে অন্য কোথাও সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন।'

হোটেলে ফিরে হোমস একটা টেলিগ্রাম পাঠাল। বিকালের মধ্যে চলে এল উত্তর।

'আমার লণ্ডনের এজেন্ট পাঠিয়েছে উত্তরটা,' হোমস ব্যাখ্যা করল। 'ডোরাক চেকোস্লোভাকিয়ার কেমিস্ট। বোধহয় প্রেসবারির প্রাগ যাত্রার সাথে লোকটার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত তা হলে অন্তত একটা কিছুর সাথে আরেকটার কোনও সম্পর্ক পাওয়া গেল,' আমি বললাম। 'চোখের সামনে এতগুলো সূত্রঃ খ্যাপাটে কুকুর, প্রফেসরের মধ্য ইওরোপের কোনও এক শহরে অভিযান, তাঁর রাতের আঁধারে

হামাগুড়ি দেয়া, অতগুলো তারিখের লিস্ট–অথচ সবই যেন কেমন ছাড়া ছাড়া। কারও সাথে কোনওটার যোগসূত্র নেই।'

হোমস মুচকি হেসে পাইপ ধরাল।

'প্রথমে তারিখগুলোর কথা ভাবো,' বলল সে। 'প্রতি নবম দিনে প্রফেসরের পাগলামি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ব্যাপারটা দৈব কিছু নয়, নয়দিনের ব্যবধানে কমপক্ষে আটবার এরকম কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি।'

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

হোমস বলে চলল, 'কাজেই আমার সাজেশন হলো, প্রতি নবম দিনে প্রফেসর প্রেসবারি নিশ্চয়ই কোনও ধরনের ড্রাগ সেবন করেন। এর প্রভাব সাথে সাথে শুরু হয়ে যায়। এমনিতেই রগচটা মানুষ, আর ড্রাগটা নিয়ে হয়ে ওঠেন আরও ভয়ঙ্কর। প্রাগভ্রমণের সময় বোধহয় ওষুধটার সন্ধান পেয়েছিলেন। সেখান থেকে হয়তো কেউ ওটা তাঁর কাছে পাঠাচ্ছে। আর মাঝখানে মিডিয়া হিসাবে কাজ করছে লণ্ডনে বসবাসরত চেক নাগরিক ডোরাক।'

'কিন্তু কুকুরের আক্রমণ? জানলায় প্রফেসরের মুখ? তাঁর হামা দিয়ে হাঁটা? এসবের কী ব্যাখ্যা?'

'যাত্রা তো সবে শুরু, বৎস। এখন চলো, লণ্ডন ফেরার আগে এই সুন্দর শহরটা এক পাক ঘুরে দেখি।'

লণ্ডনে ফেরার পরের ক'টা দিন হোমসকে প্রেসবারির কেসটা নিয়ে এতটুকুও মাথা ঘামাতে দেখলাম না। তবে পরবর্তী সোমবার বিকেলে তাঁর মেসেজ পেলাম। পরদিন সকালে আমার জন্যে সে রেলস্টেশনে অপেক্ষা করবে জানিয়েছে।

কেমব্রিজ পৌঁছে প্রথমেই বেনেটকে খবর দিলাম।

'গত হপ্তায় কোনও রকম ঝুটঝামেলা হয়নি,' হোটেলের কক্ষে ঢুকে সে জানাল। 'স্যরের আচরণ পুরোপুরি স্বাভাবিক। আজও

অবশ্য ডোরাক একটা বাক্স আর চিঠি পাঠিয়েছে। বরাবরের মত ডাকে।'

'গুড, আশা করছি আজরাতেই সব সমাধান হয়ে যাবে।' হোমস বলল। 'আজ ঘুম হারাম। প্রফেসরকে চোখে চোখে রাখতে হবে। আপনার প্রথম কর্তব্য হলো রাত জেগে কান খাড়া করে রাখা। প্যাসেজে প্রফেসরের সাড়া পাওয়া মাত্র তাঁকে চুপিচুপি অনুসরণ করবেন। তবে ভুলেও বাধা দেবেন না। আমি আর ডাক্তার ওয়াটসন কাছাকাছিই থাকব। অবস্থা বুঝে সাড়া দেব আমরা। এখন আসুন, ভোর হবার আগেই দেখা হবে আশা করি।'

মাঝরাত পার হয়ে গেছে। প্রেসবারির বাড়ির সামনে ঘন ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছি দুজনে। বেশ শীত লাগছে—ভ্যাগ্যিস দুজনেই আমরা গরম পোশাকে বেরিয়েছিলাম।

হোমস ধীরে ধীরে বলছিল, 'আমার নয় দিনের থিয়োরি যদি অচল না হয়, প্রফেসর আজ উন্মাদ হতে বাধ্য। প্রাগভ্রমণের পর পরই তাঁর আচরণ আশ্চর্যজনকভাবে বদলে যায়। লণ্ডনে বসবাসকারী চেকোস্লোভাকিয়ানকে গোপনে চিঠি লেখেন তিনি। লোকটা সম্ভবত প্রাগের এজেন্ট। এই লোকটাই বাক্স পাঠাচ্ছে প্রেসবারির কাছে। সবগুলো পয়েন্ট ধাবিত হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দিকে। তবে এখনও বুঝিনি ঠিক কী জাতীয় ওষুধ তিনি গ্রহণ করছেন এবং কেন। তুমি কি তাঁর হাত দুটো লক্ষ্য করেছিলে, ওয়াটসন?'

'না তো।'

'হাতের দিকে আগে দৃষ্টি পড়া উচিত। অস্বাভাবিক রকমের মোটা আর রুক্ষ তাঁর হাত দুটো অনেকটা যেন—'

অকস্মাৎ থেমে গেল হোমস। কী যেন গভীর ভাবে ভাবছে সে। হঠাৎ মাথার চুল খামচে ধরে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল,

'ওহ্, ওয়াটসন, আস্ত একটা গবেট আমি! হ্যাঁ, এটাই সম্ভব, যদিও...যদিও অবিশ্বাস্য! কিন্তু সম্ভব অবশ্যই। কীভাবে এসবের যোগসূত্র আমার চোখ এড়িয়ে গেল? হাত–হাতের ব্যাপারটা ভুললাম কীভাবে? আর কুকুর, কিংবা দেয়াল ঘেঁষে বেড়ে ওঠা গাছটার কথা? দেখো, ওয়াটসন, ওই উনি এসে পড়েছেন। নিজের চোখে সব দেখো।'

সদর দরজাটা সন্তর্পণে খুলে গিয়েছিল। রাত্রিবাস পরা প্রেসবারিকে আবিষ্কার করলাম। বদলে গেছে তাঁর চলার ভঙ্গি। তাঁর শরীরটা নীচু হলো। এরপর হাত আর পায়ের ওপর ভর দিয়ে ক্রলিং শুরু করলেন। লনের সামনে এভাবে কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করার পর বাড়ির একপ্রান্তে চলে গেলেন তিনি। বেনেটকেও দেখলাম চুপিসারে তাঁকে অনুসরণ করে যাচ্ছে।

'এগোও, ওয়াটসন!' উত্তেজিত কণ্ঠে হোমস নির্দেশ দিল। প্রফেসরকে আরও ভালভাবে দেখতে পাবার আশায় সেদিকটাতে ছুটে গেলাম দুজনে। দেয়াল ঘেঁষা উঁচু গাছটার চারপাশে কয়েকবার ঘুরপাক খেলেন তিনি। হঠাৎ ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে গাছটাতে চড়ে বসলেন। বানরের মত ক্ষিপ্রগতিতে তর তর করে উঠে যাচ্ছেন ওপরে। বার কয়েক এভাবে ওঠা-নামা করলেন তিনি। চাঁদের আলোয় তাঁর মুখখানা দেখে মনে হলো বেশ ফুর্তিতেই আছেন ভদ্রলোক।

সম্ভবত পরিশ্রান্ত হয়েই একসময় ক্ষান্ত হলেন তিনি। লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেন, এরপর সেই একইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলেন কুকুরের ছোট্ট ঘরের দিকে। চেইন বাঁধা অবস্থাতেই হঠাৎ বেরিয়ে এল কুকুরটা। ওই অবস্থাতেই কতগুলো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে একটার পর একটা ছুঁড়তে থাকলেন প্রফেসর। কুকুরটার বিকট চিৎকারে ভেঙে খান খান হয়ে পড়ল জমাট নীরবতা। ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল জানোয়ারটার দাপাদাপি আর

হুঙ্কার। চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে প্রফেসরের মত একজন পণ্ডিত এভাবে হাতে পায়ে হামা দিতে দিতে কুকুরটাকে খ্যাপাতে পারেন।

এবং খানিক পরেই ঘটল দুর্ঘটনা। টানাহেঁচড়ার চোটে কুকুরের চেইন গেল ছিঁড়ে। মুহূর্তে আকাশ ফাটানো চিৎকার দিয়ে পোষা কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর মনিবের ওপর। দুজনে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে এখন। প্রফেসর চিৎকার করে উঠলেন। কুকুরটা তাঁর গলা কামড়ে ধরেছে। তিনজন দৌড়ে এসে অচেতন প্রফেসরকে উদ্ধার করলাম। বেনেট জানোয়ারটাকে শান্ত করতে লাগল।

প্রফেসরকে ধরাধরি করে তাঁর বেডরুমে নিয়ে এলাম। পরীক্ষা শেষে তাঁর গলায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম আমি। ক্ষতটা বেশ ভালভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল। যমখাটুনি গেল আমার ওপর দিয়ে। আপাতত বিপদ কেটে গেছে।

'ওকে হাসপাতালে নেয়া দরকার,' আমি বললাম।

বেনেট আঁতকে উঠল। 'মাথা খারাপ! এখন কেবল বাড়ির লোকজন জানে ব্যাপারটা। এতে ঘাবড়াই না। কিন্তু এর বেশি জানাজানি হলে অবস্থা কী দাঁড়াবে, ভাবতে পারেন? স্যরকে ডিপার্টমেণ্ট ছাড়তে হবে। ওঁর মেয়ের দিকটাও একবার ভাবুন।'

হোমস বলল, 'তাই হোক। আমরাও না হয় মুখে তালা মেরে রাখব। তবে ভবিষ্যতে যাতে আর এরকম কিছু না ঘটে সেদিকে আপনাদের কড়া নজর রাখতে হবে। এবার দেখা যাক প্রফেসরের রহস্যময় বাক্স ঘেঁটে কী পাওয়া যায়।'

বাক্সের ভেতরে আহামরি কিছু ছিল না। তবে যা পাওয়া গেল, যথেষ্ট। একটা খালি ওষুধের বোতল আর কয়েকটা চিঠি। প্রায় সবগুলো চিঠিই পাঠিয়েছে ডোরাক। কেবল একটা খামের ওপর প্রাগের পোস্টমার্ক দেখলাম।

'এই-ই তা হলে ফাইনাল ক্লু!' হোমস বলে উঠল। এরপর চিঠিটা খুলল সে।

জনাব,

আমার এখানে আপনার আগমনের পর থেকে আপনার কেসটা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা সারতে হয়েছে। আপনার মানসিক অবস্থা আমি বুঝি। জানি এর পিছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে আপনার, তবু আপনাকে সতর্ক করে দেয়াটা প্রয়োজন মনে করি। আমার ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মারাত্মক এবং খুব তাড়াতাড়ি তা আরম্ভ হয়ে যায়। আপনি বোধকরি অবগত আছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই প্রজাতির বাঁদরের বাস। এক হলো অ্যানথ্রোপোয়েড যা কিনা মানবসদৃশ, অপরটি লেঙ্গুর। আপনাকে এ মুহূর্তে লেঙ্গুর উদ্ভুত নমুনটাই পাঠানো সম্ভব। এ শ্রেণীর বাঁদর হামাগুড়ি এবং উঁচু কোনও কিছুতে বেয়ে উঠতে সিদ্ধহস্ত। যা হোক, লণ্ডনে আমার এজেন্ট ডোরাক আপনার সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ বজায় রাখবে।

হান্স লোয়েনস্টেইন

লোয়েনস্টেইন! প্রাগের এই বিজ্ঞানী সম্বন্ধে মাঝখানে বেশ কিছুদিন পত্রিকাগুলোতে গরম গরম খবর ছাপা হচ্ছিল। যৌবনের স্থায়িত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি নাকি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। যদিও তাঁর গবেষণা সম্পর্কে পরে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। এখন যেন খানিকটা আঁচ করতে পারলাম।

'এতসবের পিছনে আসল কারণটা হলো বুড়ো বয়সে প্রেসবারির অকস্মাৎ প্রেমে পড়া,' হোমস বলে চলল। 'বোঝা যাচ্ছে প্রথমে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁর হৃতযৌবন ফিরে পেতে হবে। কাজেই নিয়মমাফিক ওষুধটা সেবন করতে লাগলেন তিনি। এদিকে কুকুরটাই প্রথম টের পায় মনিবের পরিবর্তন। প্রভুর বাঁদরামি সহ্য করতে না পেরে আক্রমণ করে বসে। আর

বানরের যে বদমায়েশি স্বভাব, কুকুরটাকে খেপিয়ে মজা লুটতে লাগলেন প্রফেসর। গাছ বেয়ে ওঠানামাও ছিল নিছক বানরসুলভ খেলা।...এখন ওঠো হে, ওয়াটসন। হোটেলে ফিরে কষে একটা ঘুম দিতে হবে।'

হাঁউমাঁউ করে বিকট এক হাই তুলল শার্লক হোমস।

মূলঃ আর্থার কোনান ডয়েল
রূপান্তরঃ মাহবুবুর রহমান শিশির

ডুয়েল

যৌবনে সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলাম আমি। থাকতাম ছোট্ট এক শহরে। জীবনটা ছিল বড় একঘেয়ে। মেয়েদের দেখা পাওয়া যেত না, অন্যান্য অফিসারদের মুখ দর্শন করতে হত প্রতিদিন। পানাহার আর তাস পেটানো চলত তাদের সাথে।

একরকম চলে যাচ্ছিল এভাবে। একদিন এক আগন্তুক ছোট শহরটায় বাস করতে এল। অফিসার নয় সে, তবে কোনও এক সময় সেনাবাহিনীতে ছিল। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ তার রাশিয়ানদের মত হলেও, নামটা ইতালিয়ান–সিলভিও।

রহস্যময় লোক এই সিলভিও। প্রচুর টাকার মালিক, অথচ পরনে পুরনো পোশাক আর বাস করত দু'কামরার ছোট এক বাড়িতে।

প্রায়ই অফিসারদের ডিনারে দাওয়াত দিত সে। সাদামাঠা খাবার পরিবেশন করলেও, পর্যাপ্ত ওয়াইনের ব্যবস্থা রাখত। রোজই মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতাম আমরা।

সিলভিও কোত্থেকে এসেছে, কেউ জানত না, এবং জিজ্ঞেসও করত না। আমরা সবাই খানিকটা ভয় পেতাম ওকে।

পঁয়ত্রিশ ছুঁইছুঁই সিলভিওকে বয়স্ক দেখাত আমাদের মত তরুণদের চোখে। ওর প্রিয় হবি ছিল শূটিং। পিস্তলের বড়সড় সংগ্রহ ছিল তার। নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি চালাতে পারত ও। সুদক্ষ মার্কসম্যান ছিল।

আমরা তরুণরা ডুয়েলিঙে ভারি আগ্রহী ছিলাম। প্রায়ই কথা উঠত এ ব্যাপারে। সিলভিওকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কখনও ডুয়েল লড়েছে কিনা। 'হ্যাঁ' বলে দায়সারা জবাব সেরেছে সে। কথা বাড়াতে চায় না বুঝতে বেগ পেতে হয়নি। হয়তো অনেকের রক্তে হাত রাঙিয়েছে সে।

একদিন নতুন এক অফিসার এল আমাদের শহরে। সিলভিওর বাসায় দাওয়াত ছিল, ফলে তাকেও সাথে করে নিয়ে গেলাম আমরা। ডিনারের পর বসলাম তাস পেটাতে।

প্রচুর শ্যাম্পেন টানা হলো। নেশা ধরে গেছে সবার। নতুন অফিসারটি তাস খেলতে বসে ভুল করে বসল। সিলভিও ভুলটা ধরিয়ে দিতেই খেপে গেল সে।

'আমি চুরি করেছি বলতে চান?' গর্জন ছাড়ল সে সিলভিওর উদ্দেশে।

ধকধক করে জ্বলছে সিলভিওর চোখ, কিন্তু মুখে তালা। নীরবে একদৃষ্টে চেয়ে রইল অফিসারটির দিকে।

ক্ষিপ্ত অফিসারটি হঠাৎ একটা বোতল তুলে নিয়ে সিলভিওর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। সময় মত সরে যাওয়ায় লাগল না, ওর পেছনে দেয়ালে গিয়ে চূর্ণ হলো ওটা।

'আপনি দয়া করে আমার বাসা থেকে বেরিয়ে যান,' ধীর, শীতল কণ্ঠে মেহমানকে উদ্দেশ্য করে বলল সিলভিও।

আমাদের ধারণা ছিল, সিলভিও নির্ঘাত অফিসারটিকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ জানাবে। কিন্তু কয়েক দিন চলে গেল, কিছুই ঘটল না। বিস্মিত হলাম আমরা। আরও অবাক হলাম যখন দেখলাম, সিলভিও ক্ষমা চাইল লোকটার কাছে। সিলভিও কি তবে কাপুরুষ? ডুয়েলে অফিসারটিকে চ্যালেঞ্জ করল না কেন সে?

আমি একা, সিলভিওর গোমর আবিষ্কার করলাম। অন্যরা কেউ ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা টের পেল না।

শুক্রবার দিনটা বড় উত্তেজনায় কাটে আমাদের। মেইল কোচ আসে এদিন—চিঠি-পত্র, পার্সেল আর খবরের কাগজ নিয়ে। আমরা একজন আরেকজনকে নিজেদের চিঠি পড়ে শোনাই এবং যে বেচারার কাছে চিঠি আসে না তার জন্যে বেদনা বোধ করি।

সিলভিওর কাছে কখনও চিঠি আসতে দেখিনি। কিন্তু এক শুক্রবার, চিঠি এল ওর নামে। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে এসেছে। আমি ওটা পৌঁছে দিলাম ওর কাছে। তখুনি খুলে পড়ে ফেলল সে চিঠিটা।

'আজ রাতে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে,' উত্তেজিত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলে ভাল লাগবে আমার। সাতটার ডিনারে সব অফিসারকে নিয়ে আমার ওখানে এসো, প্লীজ।'

ঠিক সাতটায় হাজির হয়ে গেলাম আমরা। কয়েকটা কেসে মালপত্র সব গোছগাছ করে ফেলেছে সে। ডিনারের পর সবার কাছ থেকে আলাদা ভাবে বিদায় নিল ও। আমার হাতটা ধরে, শান্ত সুরে বলল, 'ওরা চলে যাক, তোমার সাথে কথা আছে।'

অতিথিরা বিদায় না নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। এক পর্যায়ে সিলভিও আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোমাকে আমি সবসময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভেবেছি। আর হয়তো কোনওদিন আমাদের দেখা না-ও হতে পারে, কাজেই তোমাকে আমি কিছু কথা বলে যেতে চাই।

'আমার মাথা সই করে বোতল ছুঁড়েছিল, সে অফিসারটার কথা মনে আছে তোমার?' শুরু করে সিলভিও। 'তুমি আশা করেছিলে আমি ওকে চ্যালেঞ্জ জানাব, তাই না? আমাকে তুমি হয়তো ভীরু-কাপুরুষ ভেবেছিলে। আমাকে আজ আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দাও। সেদিন জানের ওপর ঝুঁকি নেয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। ছয় বছর আগে আমার জানের দুশমন আমার

মুখে আঘাত করে। সে লোক এখনও জীবিত। আমি শপথ নিই ওকে খুন করব। সেজন্যে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।'

'তুমি কি সে কারণেই চলে যাচ্ছ?' প্রশ্ন করি আমি।

চুপ করে রইল সিলভিও। একটা কেস খুলে অফিসারদের ব্যবহারযোগ্য একখানা টুপি বার করল। তারপর মাথায় চাপাল ওটা। দেখতে পেলাম বুলেটের এক ফুটো রয়েছে ওতে।

'অশ্বারোহী বাহিনীর সৈনিক ছিলাম আমি,' বলল সিলভিও। 'বয়স ছিল কম, প্রচুর মদ খেতাম আর এর-ওর সাথে ফাইট করতাম। প্রতিদিনই ডুয়েল হত। কখনও হারতে হয়নি আমাকে। আমি ছিলাম সবার সেরা।

'কিন্তু একদিন অভিজাত পরিবারের এক তরুণ এসে যোগ দিল ক্যাভলরিতে। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি সুদর্শন আর সাহসী। ভাগ্যটাও ফেভার করত তার জুয়ার আসরে। সেন্ট পিটার্সবার্গের মেয়েরা একরকম পাগল ছিল ওর জন্যে।

'হঠাৎই দু'নম্বরে নেমে গেলাম আমি। এ লোক সব কিছুতেই সেরা। ওকে ঘৃণা করতে শুরু করি আমি। খুন করার জন্যে হাত নিশপিশ করতে থাকে।

'এক রাতে, এক ডিনার পার্টিতে দেখা হয় আমাদের। ওকে খেপিয়ে তুলতে চাই আমি। ইচ্ছে করে দুর্ব্যবহার করি। কাজ হয় এতে। আমাকে মুখে মেরে বসে ও, ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করে। ঠিক হয় পরদিন সকালে, শহরের বাইরে পিস্তলে ফাইট হবে আমাদের।

'পরদিন আলো ফোটার আগেই ওখানে পৌছলাম আমি। কিছুটা দেরি করে এল ও। হাসি মুখে এগিয়ে এল আমার দিকে। রাস্তা থেকে কুড়ানো চেরি টপাটপ খাচ্ছে। ভোরের আলোয় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে।

'পয়সা টস করে ঠিক করা হলো কে আগে শূট করবে। ও

জিতল। চিরকালই সে ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছে।

'বারো পা দূরত্ব রেখে দাঁড়ালাম আমরা। পিস্তল তুলে গুলি করল ও। আমার টুপি ভেদ করে চলে গেল গুলি। সহজেই খুন করতে পারত, কিন্তু মিস করল ইচ্ছা করে।

'এবার আমার পালা। এত কাছ থেকে মিস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ও-ও জানে সে কথা। সটান দাঁড়িয়ে থাকল, চেরি খাচ্ছে আর হাসছে। মৃত্যু ভয় নেই ছেলেটার!

'গুলি করতে পারলাম না আমি। পিস্তল নামিয়ে ফেললাম। ওকে বললাম, কেবল মরণের দিনই আমার দেখা পাবে সে, তার আগে নয়। দিনটা আমি সাবধানে বাছব। যেদিন জানব ও বাঁচতে চায়, ঠিক সেদিন আবার দেখা হবে। তখন খুনটা করব।'

গল্পটা শেষ করার পর ফ্যাকাসে হয়ে গেল সিলভিওর মুখের চেহারা। জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল, ঘাবড়ে গেলাম আমি।

'সে সময় কি এসেছে?' জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ! ও বিয়ে করেছে!' বলল সিলভিও।

করমর্দন করলাম আমরা। ওকে বিদায় চুম্বন দিতে ব্যর্থ হলাম আমি। কেন জানি ভয়ঙ্কর দেখাল ওকে আমার চোখে। এক মুহূর্ত আগে সে আগুনের মত গরম ছিল, আবার পরমুহূর্তে বরফের মত শীতল হয়ে গেল।

ক্যারিজে চেপে রওনা হয়ে গেল সে। ওর সাথে আর কোনওদিন দেখা হয়নি।

পাঁচ বছর পর, আমার বাবা মারা গেলে, গ্রামের বাড়িতে চলে যাই আমি। কাউন্ট ও কাউন্টেস ব্র্যাগয় আমাদের প্রতিবেশী। বেশির ভাগ সময় তাঁরা সেন্ট পিটার্সবার্গে থাকেন।

কাউন্ট ও তাঁর স্ত্রী একদিন গাঁয়ে বেড়াতে এলেন। আমি

গেলাম দেখা করতে।

লাইব্রেরিতে বসতে বলল এক ভৃত্য। চমৎকার সব বই আর পেইন্টিং সারা ঘর জুড়ে সাজানো। একটা ছবি আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল। ওটা দেখছি, এমনি সময় কাউন্ট ও কাউন্টেস ঘরে প্রবেশ করলেন।

'আমার পোর্ট্রেট দেখছেন বুঝি?' বললেন কাউন্ট।

'জ্বি, স্যর,' বললাম। 'কিন্তু এটায় একটা গুলির ফুটো দেখতে পাচ্ছি যে?'

'একটা নয়, দুটো,' জানালেন কাউন্ট। 'দ্বিতীয় গুলিটা প্রথম ফুটোটা ভেদ করে গেছে বলে একটা মনে হচ্ছে।'

'দারুণ তো,' বললাম। 'আমি একজনকে চিনতাম এরকম নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করতে পারত। ওর চেয়ে দক্ষ মার্কসম্যান আমি আর দেখিনি।'

'কী নাম সেই ভদ্রলোকের?' কাউন্টের প্রশ্ন।

'সিলভিও।'

'সিলভিও!' আঁতকে উঠলেন কাউন্টেস। মুখের চেহারা ম্লান তাঁর। ধপ করে এক চেয়ারে বসে পড়লেন। কাউন্ট ছুটে গিয়ে তাঁর একখানা হাত তুলে নিলেন। 'ও লোকের নাম আর কোনওদিন শুনতে চাই না আমি!' বললেন কাউন্টেস।

'কিন্তু মেহমানকে একটা ব্যাখ্যা দেয়া উচিত আমাদের,' বললেন কাউন্ট। তারপর আমার দিকে ফিরে জানালেন, 'সিলভিওকে আমরাও চিনি।'

সহসাই উপলব্ধি করলাম, এ সেই লোক, যে সিলভিওর সাথে ডুয়েল লড়েছিল। 'ও কি ফিরে এসে আপনাকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল?'

'হ্যাঁ,' জবাবে বললেন কাউন্ট। 'পাঁচ বছর আগে, আপনি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ও সেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

'আমাদের তখন সবে বিয়ে হয়েছে। হানিমুন করতে এখানে এসেছি,' বলে যান কাউন্ট। 'কাজের লোক এসে জানায়, কে একজন ব্যবসায়িক আলাপ করতে চায় আমার সাথে। লাইব্রেরিতে এসে দেখি সিলভিও। ডুয়েলটা শেষ করতে এসেছে।

'পয়সা টস করল সে কে আগে শূট করবে ঠিক করতে। জিতলাম আমি, কিন্তু বিয়ের শুরুতেই খুনোখুনির মধ্যে যেতে চাইলাম না। ওর মাথার ওপর দিয়ে ফায়ার করলাম। আমার পোর্ট্রেটের দু'চোখের মাঝখান দিয়ে চলে গেল বুলেট।

'এবার সিলভিওর পালা। কিন্তু আমার স্ত্রী প্রথম গুলির শব্দ পেয়ে ছুটে এসেছে লাইব্রেরিতে। সিলভিও আমার দিকে পিস্তল তাক করেছে দেখে, আমাকে আগলে দাঁড়ায় সে।

'দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকে সিলভিও। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটা দেয়। ও বোঝে আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, এবং এখন আমি বেঁচে থাকতে চাই। এরপর অদ্ভুত এক কাণ্ড করে সে। চলে যাওয়ার আগে, আমার ছবিটার দিকে পিস্তল তাক করে। একটা ফায়ার করলে পরে বুলেট সেঁধিয়ে যায় দু'চোখের ফাঁক গলে। মানে আমার তৈরি ফুটোটার ভেতর দিয়ে। তারপর চলে যায় সে, ওকে আর কোনওদিন দেখিনি।'

'সিলভিও এখন কোথায় আছে, কী করছে কিছু জানেন?' জানতে চাই আমি।

'তুর্কীদের সাথে যুদ্ধে মারা গেছে খবর পেয়েছি। ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন।'

মূল: আলেকসান্দর পুশকিন
রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

ঝাড়ুদার ইগনাশিয়াস

নাইজেরিয়ার অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাবার পরে খুব কম মানুষই ইগনাশিয়াস আগারবিয়র প্রতি কৌতূহল দেখিয়েছে। অবশ্য এর কারণও আছে একটা। গত ষোলো বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ষোলোবার, মন্ত্রী বদল হয়েছে। ইগনাশিয়াস সতেরো নম্বর অর্থমন্ত্রী।

পার্লামেণ্টে নবাগত হিসেবে প্রথম ভাষণে ইগনাশিয়াস প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন দুর্নীতি, নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন যাঁরা নিষ্কলুষ জীবন-যাপন করবেন না তাঁদের কারও রাষ্ট্র যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার কোনও অধিকার নেই। বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে, 'আমি নাইজেরিয়ার ঈজিয়ান আস্তাবল ঝাড়ু দিয়ে সাফ করব।'

অর্থমন্ত্রীর এ বক্তৃতায় নতুনত্ব কিছু নেই বলে লাগোস টাইমস-এ এ নিয়ে কিছুই লেখা হলো না। কারণ সম্পাদক ভেবেছেন, গত ষোলোজন মন্ত্রী একই সুরে বক্তৃতা ঝেড়েছেন যদিও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কাজেই নতুন অর্থমন্ত্রীর এ ভাষণ পাঠকদের কাছে নতুন কিছু মনে না হওয়াই স্বাভাবিক।

তাঁর ওপর লোকের বিশ্বাসের অভাব জেনেও হতাশ হলেন না ইগনাশিয়াস। তিনি শক্তি এবং সংকল্প নিয়ে নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাবার কয়েকদিনের মধ্যে খাদ্য

মন্ত্রণালয়ের নিম্নস্তরের এক কর্মচারীকে তিনি জেলে ঢোকালেন। লোকটার অপরাধ সে শস্য আমদানির ভুয়া কাগজপত্রের সঙ্গে জড়িত। এরপরে ইগনাশিয়াসের নতুন ঝাঁটার শলার খোঁচা খেলেন শীর্ষস্থানীয় এক লেবানিজ বিনিয়োগকারী। কণ্ট্রোল রেগুলেশনের চুক্তি ভঙ্গের দায়ে তাঁকে দেশ ছাড়া করা হলো। এমনকী আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও তিনি পেলেন না। এক মাস পরে যে কাণ্ডটি করলেন ইগনাশিয়াস তা তাঁর নিজের কাছেই ব্যক্তিগত ক্যু বলে মনে হলো: ঘুস নেয়ার অপরাধে পুলিশ প্রধানকে গ্রেফতার করলেন তিনি। লাগোসের নাগরিকদের কাছে চাকরি এবং ঘুস সমার্থক শব্দ ছিল। চার মাস বাদে বিচারে যখন পুলিশ প্রধানের আঠারো মাসের জেল হয়ে গেল, নতুন অর্থমন্ত্রী অবশেষে লাগোস টাইমস-এর প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেলেন। মধ্য পাতার এক নেতা ইগনাশিয়াসকে অভিহিত করলেন, 'ঝাড়ুদার ইগনাশিয়াস' বলে। অর্থমন্ত্রীর এ ঝাড়ুকে প্রতিটি মানুষ ভয় পেতে লাগল। একের পর এক গ্রেফতার চলতে লাগল সে সঙ্গে 'ঝাড়ুদার' হিসেবে ইগনাসিয়াসের খ্যাতি বেড়ে চলল। এমনও গুঞ্জন শোনা গেল। রাষ্ট্রপতি জেনারেল অটবির বিরুদ্ধেও নাকি তাঁর অর্থমন্ত্রী তদন্ত শুরু করেছেন।

ইগনাশিয়াস এখন অফিসে একা একা বসে বিভিন্ন বিদেশী যোগাযোগের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখেন। এর সঙ্গে একশো মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ জড়িত। ইগনাশিয়াসের শত্রুপক্ষ অর্থমন্ত্রীর প্রতিটি সিদ্ধান্তের কঠোর ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেও তাঁর বিরুদ্ধে সামান্যতম স্কাণ্ডাল সৃষ্টির সুযোগ পায়নি।

ইগনাশিয়াস অর্থমন্ত্রী হিসেবে যখন দ্বিতীয় বছরের দায়িত্ব পালন শুরু করলেন, তাঁর ব্যাপারে নাক কোঁচকানো, ঠোঁট ওল্টানো নৈরাজ্যবাদীরাও তাঁর কাজের প্রশংসা করতে লাগল। ইগনাশিয়াস এতদিনে রাষ্ট্র প্রধানের এতটাই আস্থা অর্জন করেছেন

যে জেনারেল অটবি তাঁকে একদিন অনির্ধারিত একটি কনসালটেশনে ডেকে পাঠালেন।

অর্থমন্ত্রীকে ডারডেন ব্যারাকে স্বাগত জানালেন দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অটবির স্টাডিরুমের আরামদায়ক চেয়ারে বসলেন ইগনাশিয়াস। স্টাডি রুম থেকে প্যারেড গ্রাউণ্ড পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়।

'ইগনাশিয়াস, আমি কিছুক্ষণ আগে লেটেস্ট বাজেট রিপোর্টে চোখ বুলিয়েছি। তোমার উপসংহার দেখে আমি শংকা বোধ করেছি। তুমি লিখেছ বিদেশী কোম্পানিগুলো দালালদের ঘুষ দেয়ার কারণে এক্সচেকার প্রতিবছর মিলিয়ন ডলার হারাচ্ছে। ঘুসের টাকা কাদের পকেটে যাচ্ছে সে ব্যাপারে তোমার কোনও ধারণা আছে? এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতেই তোমাকে ডেকেছি।'

চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে আছেন ইগনাশিয়াস, রাষ্ট্রপতির ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সরেনি চোখ। 'আমার সন্দেহ, ঘুসের বিরাট একটা অংশ প্রাইভেট সুইস ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে। তবে এ মুহূর্তে বিষয়টি আমি প্রমাণ করতে পারব না।'

'বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য তোমার যা যা দরকার হবে সব আমি জোগাব,' বললেন জেনারেল অটবি। 'এ দুর্বৃত্তদের মুখোশ খুলে দিতে তোমার যা খুশি তা-ই করতে পার। আমার কেবিনেটের, অতীত ও বর্তমান প্রতিটি সদস্যের ব্যাপারে তদন্ত শুরু করে দাও। তারা যে পদেই আসীন থাকুক না কেন, কিংবা যতই ক্ষমতাবান তারা হোক না কেন, এদের কাউকে তোমার ভয় পেতে হবে না। কারও প্রতি পক্ষপাতিত্বেরও প্রয়োজন নেই।

'এ কাজে সফল হতে হলে আপনার সই করা বিশেষ অনুমতিপত্র আমার প্রয়োজন হবে, জেনারেল...

'আজ সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে তোমার টেবিলে অনুমতিপত্র পৌঁছে যাবে,' বললেন রাষ্ট্রপতি।

'আমি দেশের বাইরে গেলে আমাকে রাষ্ট্রদূতের সমপরিমাণ ক্ষমতা দিতে হবে।'

'পাবে।'

'ধন্যবাদ,' বললেন ইগনাশিয়াস, বৈঠক শেষ ভেবে চেয়ার ছাড়লেন।

'এটা তোমার কাজে লাগতে পারে,' অর্থমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দরজায় পা বাড়ালেন অটবি। ইগনাশিয়াসের হাতে ক্ষুদ্রকায় একটি অটোমেটিক পিস্তল গুঁজে দিলেন। 'আমার ধারণা, এখন থেকে আমার মত তোমারও শত্রুর অভাব হবে না।' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অস্ত্রটি নিয়ে পকেটে পুরলেন ইগনাশিয়াস, বিড়বিড় করে ধন্যবাদ দিলেন।

আর কোনও কথা হলো না দু'জনে। নেতাকে রেখে গাড়ি নিয়ে নিজের মন্ত্রণালয়ে চলে এলেন ইগনাশিয়াস।

নাইজেরিয়ার স্টেট ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং সিনিয়র কর্মকর্তাদের কিচ্ছুটি না জানিয়ে নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইগনাশিয়াস। রাতের বেলা গবেষণা করেন তিনি, দিনের বেলা বিষয়টি নিয়ে আপন-মনে নিজের সঙ্গে কথা বলেন। তিন মাস পরে তিনি আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

আগস্টে অকস্মাৎ বাইরে যাবার প্রোগ্রাম করলেন অর্থমন্ত্রী। এ সময় বেশিরভাগ নাইজেরিয়ান ছুটি কাটাতে যায়। কাজেই ইগনাশিয়াসের অনুপস্থিতি নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তুলবে না।

সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের জন্য অরল্যাণ্ডোগামী ফ্লাইটের টিকেট করতে। প্লেনের ভাড়া তিনি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে শোধ করলেন।

ফ্লোরিডা পৌঁছে পরিবারকে নিয়ে স্থানীয় ম্যারিয়ট হোটেলে উঠলেন ইগনাশিয়াস। তারপর স্ত্রীকে কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই জানালেন নিউ ইয়র্কে ক'দিনের জন্য যাচ্ছেন জরুরি কাজে। কাজ

শেষে পরিবারের সঙ্গে যোগ দেবেন ছুটির বাকি দিনগুলো কাটাতে। পরদিন সকালে ইগনাশিয়াস পরিবারকে ডিজনিওয়ার্ল্ডের রহস্যের জগতে রেখে নিউ ইয়র্কের ফ্লাইট ধরলেন। লাগুয়ারদিয়া থেকে ট্যাক্সিতে কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। ওখানে পোশাক বদলে, নগদ অর্থে একটি রিটার্ন ট্যুরিস্ট টিকেট কিনে সবার অগোচরে সুইস এয়ার ফ্লাইটে চেপে বসলেন ইগনাশিয়াস।

সুইটজারল্যাণ্ডের রাজধানীতে পৌঁছে, সস্তা একটি হোটেলে উঠলেন তিনি। বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং টানা আটঘণ্টা ঘুমালেন। পরদিন সকালে নাস্তা খেতে খেতে ব্যাংকের তালিকায় চোখ বুলালেন ইগনাশিয়াস। নাইজেরিয়ায় বসে অত্যন্ত সাবধানে এ তালিকা তৈরি করেছেন তিনি। সিদ্ধান্ত নিলেন কাজ শুরু করবেন Gerber et cie থেকে। এ ব্যাংক ভবনটি ইগনাশিয়াসের হোটেলের বেডরুম থেকে দেখা যায়। এভিন্যু ডি পারচিনে ব্যাংকটি। তিনি ওই ব্যাংকে ফোন করলেন। বেলা বারোটায় ইগনাশিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান।

হাতে জীর্ণ একটি ব্রিফকেস নিয়ে নাইজেরিয়ার অর্থমন্ত্রী সুইস ব্যাংকে হাজির হলেন নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগে। মার্বেল পাথরে মোড়া হলঘরে তাঁকে স্বাগত জানাল ধূসর সুট, সাদা শার্ট এবং ধূসর সিল্কের টাই পরিহিত এক সপ্রতিভ তরুণ। সে ইগনাশিয়াসের জন্য অপেক্ষা করছিল। বো করে নিজের পরিচয় দিল চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে। জানাল সে-ই মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে চেয়ারম্যানের অফিসে নিয়ে যাবে। তরুণ নির্বাহী অপেক্ষমাণ লিফটে উঠে পড়ল ইগনাশিয়াসকে নিয়ে। এগারো তলায় এসে লিফট থামল, তবে লিফটে কেউ কোনও কথা বলেনি। চেয়ারম্যানের অফিস কক্ষের দরজায় মৃদু

টোকা দিল তরুণ। 'ভেতরে আসুন।' শোনা গেল। তরুণ ইগনাশিয়াসকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

'নাইজেরিয়ার অর্থমন্ত্রী, সার।'

ডেস্কের পেছনে খাড়া হলেন চেয়ারম্যান, অতিথিকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন কয়েক কদম। ইগনাশিয়াস লক্ষ না করে পারলেন না যে চেয়ারম্যানও ধূসর রঙের সুট, সাদা শার্ট এবং ধূসর সিল্ক টাই পরেছেন।

'সুপ্রভাত, মাননীয় মন্ত্রী,' বললেন চেয়ারম্যান। 'বসুন, প্লীজ।' ঘরের দুই প্রান্তে একটি নিচু গ্লাস টেবিলকে ঘিরে রাখা কতগুলো আরামদায়ক আসনের দিকে হাত তুলে দেখালেন তিনি। 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমরা দু'জনে এক সঙ্গে কফি পান করব।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ইগনাশিয়াস। নিজের চেয়ারের পাশে, মেঝের ওপর নামিয়ে রাখলেন ভাঙাচোরা ব্রিফকেসটি। তারপর বৃহৎ আকারের প্লেট-গ্লাস জানালায় তাকালেন। চমৎকার সুন্দর একটি ঝর্না দেখা যাচ্ছে। রুদ্ধশ্বাস দৃশ্যটির প্রশংসা করে মামুলী দু'একটা কথা বললেন ইগনাশিয়াস। ইতিমধ্যে একটি মেয়ে এসে রেখে গেছে তিন কাপ কফি।

তরুণী চলে যাবার পরে সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন ইগনাশিয়াস।

'আমার রাষ্ট্রপতি আমাকে আপনার ব্যাংকে পাঠিয়েছেন একটু অন্যরকম অনুরোধ নিয়ে,' শুরু করলেন তিনি। চেয়ারম্যান কিংবা তাঁর তরুণ সহকারীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র ফুটল না। 'আপনার ব্যাংকে নাইজেরিয়ান নাগরিকদের যে সব অ্যাকাউন্ট আছে সে ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে বলেছেন তিনি আমাকে।'

চেয়ারম্যানের ঠোঁট নড়ে উঠল, 'কারও অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে

কথা বলার স্বাধীনতা আমার–'

'কথাটা আগে শেষ করতে দিন,' একটা হাত তুললেন মন্ত্রী। 'প্রথমেই জানিয়ে দিই আমি এখানে এসেছি আমার সরকারের তরফ থেকে পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে।'

ইগনাশিয়াস পকেট থেকে একটি খাম বের করে চেয়ারম্যানকে দিলেন। চেয়ারম্যান খাম থেকে চিঠি বের করে ধীরে সুস্থে পড়লেন।

পড়া শেষ করে গলা খাঁকারি দিলেন ব্যাংকার। 'আপনার এই ডকুমেন্ট, সার, সবিনয়ে জানাচ্ছি, আমার দেশে এর কোনও বৈধতা নেই।' চিরকুট খামে ঢুকিয়ে ওটি তিনি ফেরত দিলেন ইগনাশিয়াসকে। 'তবে আমার কোনও সন্দেহই নেই যে,' বলে চললেন চেয়ারম্যান, 'আপনি আপনার রাষ্ট্র প্রধানের পুরোপুরি সমর্থন নিয়েই এ দেশে এসেছেন, একজন মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদূত হিসেবে। কিন্তু তাতে ব্যাংকের রুল অভ কনফিডেনশিয়ালিটির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না। আমাদের অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের অনুমতি ছাড়া তাঁদের কারও নাম প্রকাশ করার এখতিয়ার আমাদের নেই। আমি আপনার কোনও সাহায্যে আসতে পারছি না বলে দুঃখিত। কারণ আমাদের ব্যাংকের আইন-কানুন যেমনটি আছে তেমনই থাকবে।' চেয়ার ছাড়লেন চেয়ারম্যান, ভেবেছেন আলোচনার বুঝি অবসান ঘটেছে এবং যা বলার তিনি বলে দিয়েছেন। কিন্তু ঝাড়ুদার ইগনাশিয়াসকে তো আর তিনি চেনেন না। এ বড় কঠিন চিজ।

'আমার রাষ্ট্রপতি,' গলার স্বর নরম করলেন ইগনাশিয়াস, 'ভবিষ্যতে আমার দেশ এবং সুইটজারল্যাণ্ডের মধ্যেকার সমস্ত যোগাযোগের জন্য মাধ্যম হিসেবে আপনার ব্যাংককে নিযুক্ত করার ক্ষমতা আমাকে দিয়েছেন।'

'আমাদের প্রতি আপনাদের আস্থার কথা জেনে সত্যি

নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি, মাননীয় মন্ত্রী,' বললেন চেয়্যারম্যান, দাঁড়িয়ে আছেন এখনও। 'তবে আশাকরি বুঝতে পেরেছেন এ প্রস্তাবেও আমাদের কাস্টমারদের প্রতি আমাদের আস্থার মনোভাবের কোনও পরিবর্তন ঘটবে না।'

নির্বিকার চেহারা ইগনিশিয়াসের।

'সেক্ষেত্রে আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মি. গার্বার, যে, জেনেভায় আমাদের রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দেয়া হবে যেন তিনি সুইস ফরেন অফিসে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন আপনাদের কাছে আমাদের নাগরিকদের বিষয়ে তথ্য চাওয়া সত্ত্বেও তা সরবরাহ করতে আপনারা অপারগতা প্রকাশ করেছেন।' শব্দগুলো মিলিয়ে যাবার সময় দিলেন ইগনাশিয়াস। 'Gerber et cie-তে আমাদের দেশের কে কে অ্যাকাউন্ট খুলছেন এবং অংকটা কত, এ তথ্যটুকু জানিয়ে দিলেই আপনাকে আর এ বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে না। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমাদের তথ্যের সোর্সের কথা আমরা প্রকাশ করব না।'

'আপনারা এ অভিযোগ করতেই পারেন, সার, এবং আমি নিশ্চিত আমাদের মন্ত্রী আপনাদের রাষ্ট্রদূতকে অত্যন্ত ভদ্রোচিত কূটনৈতিক ভাষায় ব্যাখ্যা করবেন যে সুইশ আইনে বিদেশ মন্ত্রণালয়কে এরকম কোনও অনুরোধ রক্ষা করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি।'

'সেক্ষেত্রে আমি আমার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেব এ নামগুলো প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত নাইজেরিয়া যেন কোনও সুইস নাগরিকের সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনও রকম বাণিজ্যিক লেনদেনে না যায়।

'সে আপনার ইচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী,' বললেন চেয়ারম্যান, ভাবলেশহীন অবয়ব।

'নাইজেরিয়ায় আপনার দেশের লোকেরা সম্প্রতি আমাদের

সঙ্গে যে সব চুক্তি করেছে সে সব চুক্তির ব্যাপারে নতুন করে আমাকে ভেবে দেখতে হবে। এবং এসব চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে সে বিষয়ে আমি ব্যক্তিগত ভাবে লক্ষ রাখব।'

'এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'মি. গার্বার, আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এরকম সিদ্ধান্ত নিতে আমি এক মুহূর্তের ঘুমও নষ্ট করব না।' বললেন ইগনাশিয়াস। 'আপনারা যদি হাতজোর করেও আমাকে অনুরোধ করতে আসেন, আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে পিছ পা হব না।'

'তবে তাই হোক,' বললেন চেয়ারম্যান। 'তবু এ ব্যাংক তার ক্লায়েন্টদের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে তাদের পলিসি কিংবা মনোভাব কোনটারই পরিবর্তন করবে না।'

'সেক্ষেত্রে, সার, আজই আমি আমাদের রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দেব যাতে তিনি জেনেভায় আমাদের দূতাবাস বন্ধ করে দেন এবং আমি লাগোসে আপনাদের রাষ্ট্রদূতকে আমার দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব।'

এই প্রথম চেয়ারম্যানের ভুরু টকাশ করে লাফ দিল। 'শুধু তাই নয়,' বলে চললেন ইগনাশিয়াস, 'আমি লণ্ডনে প্রেস কনফারেন্স ডাকব যে সংবাদ সম্মেলনের কথা ছড়িয়ে পড়বে গোটা বিশ্বে এবং সন্দেহ নেই সবাই জেনে যাবে এ ব্যাংক আমার রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে অসদাচরণ করেছে। এ ধরনের পাবলিসিটির ফলে আমি নিশ্চিত, আপনি দেখতে পাবেন আপনার বেশিরভাগ কাস্টমার আপনার ব্যাংকে তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিতে চাইছে, আর অতীতে যারা আপনার ব্যাংককে নিরাপদ স্বর্গ বলে মনে করত, তারা অন্য কোথাও অ্যাকাউন্ট খোলার চিন্তা-ভাবনা করছে।'

চেয়ারম্যান কিছু বলবেন প্রত্যাশা করলেন ইগনাশিয়াস। কিন্তু

ও পক্ষ নীরব।

'তা হলে আপনি আর আমার জন্য কোনও রাস্তা খোলা রাখলেন না,' চেয়ার ছাড়লেন ইগনাশিয়াস।

হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন চেয়ারম্যান, ভেবেছেন বিদায় নিচ্ছেন অর্থমন্ত্রী। কিন্তু আতংক নিয়ে দেখলেন ইগনাশিয়াস তাঁর জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট একটি পিস্তল বের করেছেন। নাইজেরিয়ার অর্থমন্ত্রী পিস্তলের মাজল ঠেসে ধরলেন চেয়ারম্যানের কপালে। দুই সুইস ব্যাংকার জায়গায় জমে গেলেন বরফ হয়ে।

'আমার ওই নামগুলো চাই, মি. গার্বার, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছি আমি। নামগুলো এক্ষুণি বলুন, নয়তো গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব। আমার কথা বুঝতে পারছেন?'

মৃদু মাথা দোলালেন চেয়ারম্যান, কপালে ফুটেছে বিন্দুবিন্দু ঘাম। 'নাম না বললে এরপরে ওকে গুলি করব,' তরুণ সহকারীর দিকে ইংগিত করলেন ইগনাশিয়াস। সে বেচারা কয়েক কদম দূরে বাক্যহারা হয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

'এ ব্যাংকে যে ক'জন নাইজেরিয়ান অ্যাকাউন্ট খুলেছে তাদের সবার নামের তালিকা আমার চাই।' শান্ত গলা ইগনাশিয়াসের, চোখ তরুণের দিকে, 'নতুবা তোমার চেয়ারম্যানের ঘিলুতে নোংরা হয়ে যাবে নরম কার্পেট। এখুনি নাম বলো,' ধমকে উঠলেন তিনি।

চেয়ারম্যানের দিকে তাকাল সহকারী। তিনি থরথর করে কাঁপছেন তবে পরিষ্কার গলায় বললেন, Non, Piere, Jamais

'D'accord,' ফিসফিস করল তরুণ।

'সুযোগ দেইনি এ কথা যেন বলবেন না আবার,' হ্যামার টানলেন ইগনাশিয়াস। চেয়ারম্যানের মুখ দিয়ে ঘামের স্রোত

গড়াচ্ছে। তরুণ সহকারী মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। কখন গুলিটা ছুটে আসবে সে ভয়ে তার আত্মা খাঁচা ছাড়া।

'চমৎকার,' বললেন ইগনাশিয়াস, চেয়ারম্যানের মাথা থেকে সরিয়ে নিলেন পিস্তল, ফিরে এলেন নিজের আসনে। দুই ব্যাংকারের শরীরের কাঁপুনি এখনও বন্ধ হয়নি, কথা বলতেও পারছেন না।

অর্থমন্ত্রী চেয়ারের পাশ থেকে জীর্ণ ব্রিককেসটি তুলে কাচের টেবিলে রাখলেন। হুড়কোয় চাপ দিতেই ঝড়াং করে খুলে গেল ডালা।

দুই ব্যাংকার চোখ ট্যারা করে দেখলেন ব্রিফকেস বোঝাই থরে থরে সাজানো একশো ডলারের নোট। ব্রিফকেসের এক ইঞ্চি জায়গাও খালি নেই। চেয়ারম্যান দ্রুত হিসেব কষলেন কম করে হলেও পাঁচ মিলিয়ন ডলার আছে ব্রিফকেসে।

'ভাবছি, সার।' বললেন ইগনাশিয়াস, 'আপনার ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খুললে কেমন হয়?'

মূলঃ জেফরি আর্চার
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

শত্রু

উপত্যকার দুই ধারে, পাথরের বড় বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে সুযোগ বুঝে পরস্পরের প্রতি গুলিবর্ষণ করছিল মিগুয়েল এবং ফার্নান্দেজ, এমন সময় আকাশ ফুঁড়ে মাটিতে এসে ল্যাণ্ড করল ফ্লাইং সসারটা। অদ্ভুত এয়ার শিপটার দিকে এবার দু'জনে পালাক্রমে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। সসারটার দরজা খুলে গেল, মসৃণ গতিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল পাইলট, ঢাল বেয়ে এগুলো মিগুয়েলের দিকে। বোল্ডারের পেছনে নিজেকে আড়াল করে শুয়ে শুয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে যত দ্রুত সম্ভব গুলি চালাচ্ছিল মিগুয়েল। প্রতিটি বুলেটের সাথে ওর মুখ থেকে অশ্রাব্য খিস্তিও বেরুচ্ছিল মেশিনগানের গুলির মত। মার্কসম্যান হিসেবে মোটেই দক্ষ নয় মিগুয়েল। উল্টো-পাল্টা গুলি ছুঁড়ছিল সে। অদ্ভুত চেহারার আগন্তুককে গুলি বৃষ্টির মধ্যেও অক্ষত দেহে হন হন করে এগিয়ে আসতে দেখে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। ফার্নান্দেজকে বাদ দিয়ে ফ্লাইং সসারের পাইলটকে শত্রু ঠাউরে খামোকাই এতক্ষণ টার্গেট করেছে মিগুয়েল। একটাও গুলি লাগাতে না পেরে হাল ছেড়ে দিল সে। রাইফেলটা ফেলে দিয়ে সর্বশেষ অবলম্বন ভারী ছুরিটা হাতের মুঠোয় নিয়ে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল মিগুয়েল।

'এবার আর রক্ষা নেই,' ছুরিটা এক চক্কর ঘুরিয়ে চিৎকার করে বলল সে। উত্তপ্ত মেক্সিকান সূর্যের ঝকঝকে আলোতে

ঝিকিয়ে উঠল ইস্পাতের ফলা। আগন্তুক ওর একেবারে সামনে এসে পড়েছিল, মিগুয়েল হুঙ্কার ছেড়ে ছুরির কোপ মারল তার গলা লক্ষ্য করে। বিদ্যুতের একটা হল্কা বয়ে গেল যেন মিগুয়েলের হাত বেয়ে, অসাড় হয়ে গেল অঙ্গটা। সবিস্ময়ে ও দেখল, পাইলটের ঘাড়ে বাড়ি খেয়ে ছিটকে গেল ছুরি, ডানা মেলল আকাশে। একই সাথে বিং-ই-ই করে ভ্রমরের গুঞ্জন তুলে ছুটে এল একটা বুলেট উপত্যকার ওপর থেকে। 'বাপরে!' বলে মিগুয়েল ডাইভ দিল বড় একটা পাথর লক্ষ্য করে, গড়িয়ে আড়ালে চলে গেল। পরমুহূর্তে আবার শোনা গেল গুলির আওয়াজ। আগন্তুকের বাঁ কাঁধে নীলচে একটা আলোর ঝলক দেখল মিগুয়েল এক সেকেণ্ডের জন্যে।

'এবার তুমি শেষ!' বলল মিগুয়েল মাথা তুলে। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়েছিল সে, মুখ তুলে ভেঙচি কাটল তার নতুন শত্রুর দিকে।

আগন্তুক একটু নড়ল না পর্যন্ত। বুলেটের আঘাতে তার কোনও ক্ষতি হয়েছে বলেও মনে হলো না। মিগুয়েল তীক্ষ্ণ চোখে তাকে জরিপ করল। লোকটার পরনে অদ্ভুত পোশাক। মাথায় ছোট্ট উজ্জ্বল নীল পালকের টুপি। তার নীচে মুখখানা কঠিন তবে সংযমী, যোগী পুরুষদের একটা ভাব আছে চেহারায়। মানুষটা খুবই রোগা, কম পক্ষে সাতফুট হবে লম্বায়। নিরস্ত্র বলেই মনে হচ্ছে। এই চিন্তাটা সাহস যোগাল মিগুয়েলকে। ছুরিটা কোথায় পড়েছে জানে না সে। তবে রাইফেলটা কয়েক হাত দূরে শুয়ে আছে মাটির ওপরে।

এগিয়ে এল আগন্তুক, দাঁড়াল মিগুয়েলের মাথার সামনে। 'উঠে দাঁড়াও,' হুকুম দিল সে। 'তোমার সাথে কথা আছে আমার।'

চমৎকার স্প্যানিশ বলে লোকটা। তবে কথা বলার সময় তার

ঠোঁট নড়তে দেখল না মিগুয়েল, যেন নির্দেশটা সরাসরি ওর মাথার ভেতর থেকে এসেছে।

'উঠে দাঁড়াতে পারব না,' সাফ জানিয়ে দিল মিগুয়েল। 'দাঁড়ালেই ফার্নান্দেজ আমাকে গুলি করবে। যদিও ওর হাতের নিশানা খুবই বাজে, তবু আমি বোকার মত কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নই। তা ছাড়া তুমি যা করছ ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার। ফার্নান্দেজ তোমাকে কত টাকা দিয়েছে?'

উদাস চোখে মিগুয়েলকে দেখল আগন্তুক।

'তুমি জানো আমি কোত্থেকে এসেছি?' প্রশ্ন করল সে।

'তুমি কোত্থেকে এসেছ তা জানতে আমার বয়েই গেছে।' হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছল মিগুয়েল। কয়েক গজ দূরে একটা বোল্ডারের দিকে তাকাল সে। ওখানে তার ছাগলের চামড়ার তৈরি মদের ঝোলাটা আছে। 'তুমি এসেছ পশ্চিম থেকে। তবে মেক্সিকান সরকারের কাছে তোমার আগমন সংবাদ গোপন থাকবে না। তোমার কাণ্ড-কারখানা সবই জানতে পারবে তারা।'

'মেক্সিকান সরকার কি খুনোখুনিতে মদত দেয়?'

'এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার,' জবাব দিল মিগুয়েল। 'পানির হিস্যা নিয়ে খুব কঠিন একটা সমস্যা। তা ছাড়া, এর সাথে আত্মরক্ষার ব্যাপারটিও জড়িত। উপত্যকার পুব ধারের ওই হারামজাদাটা আমাকে খুন করতে চাইছে। আর তোমাকে এনেছে গুপ্তঘাতক হিসেবে ভাড়া করে। ঈশ্বরের কোপানল থেকে তোমরা কেউই রক্ষা পাবে না।' হঠাৎ নতুন একটা বুদ্ধি গজাল তার মাথায়। 'আচ্ছা, ফার্নান্দেজকে হত্যা করতে কত নেবে?' আগ্রহী শোনাল তার কণ্ঠ। 'আমি তোমাকে তিন পেসো দেব। সেই সাথে সুন্দর দেখতে, নাদুসনুদুস একটা ছেলে।'

'এখানে আর মারামারি করা চলবে না,' শান্ত গলায় বলল লোকটা। 'আমার কথা কানে গেছে?'

'একথা ফার্নান্দেজকে গিয়ে বলছ না কেন?' চটে গেল মিগুয়েল। 'ওকে গিয়ে জানিয়ে এসো পাতকুয়াটার মালিক একা আমি। ও আমার কথা মেনে নিলে আর ঝামেলা থাকে না। আমি ওকে অক্ষত দেহে বাড়ি ফিরতে দেব।' লম্বা লোকটার দিকে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে মিগুয়েলের। আড়মোড়া ভাঙল ও। আর ঠিক তখন স্থির, গরম বাতাস কেটে ছুটে এল একটা বুলেট, বিশ্রী শব্দ করে কাছের ক্যাকটাসটার নরম গায়ে সেঁধিয়ে গেল।

আগন্তুক তার মাথার নীল পালকগুলোতে আঙুল বোলাল। 'আগে তোমার সাথে আমি আলোচনা শেষ করতে চাই। আমার কথা শোনো, মিগুয়েল।'

'তুমি আমার নাম জানলে কী করে?' অবাক হলো মিগুয়েল, একটা গড়ান দিয়ে উঠে বসল, হেলান দিল পাথরটার গায়ে। 'তা হলে আমার ধারণাই ঠিক। তোমাকে সত্যি ফার্নান্দেজ ভাড়া করেছে আমাকে হত্যা করার জন্যে।'

'তোমার নাম জানি, কারণ আমি তোমার মনের কিছু কিছু কথা পড়তে পারি। তবে খুব বেশি পারি না, কারণ তোমার মন অপরিচ্ছন্ন, নোংরা।

'তুমি নোংরা! তোমার গুষ্টি নোংরা!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল মিগুয়েল। আগন্তুকের নাকের পাটা ফুলে উঠল সামান্য, গালিটাকে অগ্রাহ্য করে নিজেকে সামলে নিল সে। 'আমি অন্য ভুবন থেকে এসেছি,' বলল সে। 'আমার নাম–' মিগুয়েল কথাটা উচ্চারিত হতে শুনল কুয়েটজালকোটল।

'কুয়েটজালকোটল?' ঠাট্টা করল মিগুয়েল। 'হ্যাঁ, তোমার মত মানুষের অমন নাম হওয়াই স্বাভাবিক। আর আমি হলাম সেইন্ট পিটার, যার কাছে স্বর্গে যাবার চাবি আছে।'

কুয়েটজালকোটলের পাতলা, ম্লান চেহারা ক্ষণিকের জন্য

লালচে হয়ে উঠল, তবে কথা বলল সে সম্পূর্ণ শান্ত সুরে। 'শোনো, মিগুয়েল। আমার ঠোঁটের দিকে তাকাও। দেখতেই পাচ্ছ কথা বলার সময় ওগুলো নড়ছে না। আমি টেলিপ্যাথীর সাহায্যে তোমার মাথার ভেতর থেকে কথা বলছি। আমার চিন্তা-চেতনাগুলো তুমি শব্দে রূপান্তর করে চলেছ। ফলে মনে হচ্ছে আমি কথা বলছি। আমার নামটা তোমার কাছে কঠিন মনে হয়েছে। তোমার মন এটাকে কুয়েটজালকোটল বলে অনুবাদ করেছে। ওটা আমার আসল নাম নয়।'

'বেশ বেশ!' বলল মিগুয়েল। 'ওটা তোমার আসল নাম নয় এবং আমার ধারণা, তুমি অন্য ভুবন-টুবন থেকেও আসোনি। তোমাদের মত ফালতু, ধড়িবাজ লোকদের আমার খুব চেনা আছে।'

কুয়েটজালকোটলের ধ্যানী চেহারার রঙ গাঢ় হয়ে উঠল।

'আমি এখানে এসেছি হুকুম দিতে,' গমগমে গলায় বলল সে। 'তোমার সাথে বৃথা তর্ক করতে নয়। শোনো, মিগুয়েল। তুমি ছোরা দিয়ে আমাকে হত্যা করতে পারলে না কেন? বুলেটের আঘাতেও আমার কিছু হলো না কেন?'

'তোমার যন্ত্র ওড়ে কেন?' মুখ বাঁকাল মিগুয়েল। এক মুঠো তামাক বের করে সিগারেট বানাতে শুরু করল। পাথরটা ঘুরে তার দৃষ্টি স্থির হলো লোকটার ওপর 'ফার্নান্দেজ নির্ঘাত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ফন্দি আঁটতে শুরু করেছে। এখন রাইফেলটা খুব দরকার আমার

'ও নিয়ে ভেব না,' বলল কুয়েটজালকোটল। 'ফার্নান্দেজ তোমার কোনওই ক্ষতি করতে পারবে না।'

কর্কশ গলায় হেসে উঠল মিগুয়েল।

'এবং তোমারও ফার্নান্দেজের কোনও ক্ষতি করা চলবে না,' দৃঢ় গলায় বক্তব্য শেষ করল কুয়েটজালকোটল।

'ফার্নান্দেজকে আমি বিশ্বাস করি না,' বলল মিগুয়েল। 'মাথার ওপর হাত তুলে ওকে হেঁটে আসতে দেখলেই কেবল বিশ্বাস করব ও শান্তি চায়। তারপরও ওকে আমার কাছাকাছি আসতে দিতে রাজি নই। কারণ ফার্নান্দেজ পোশাকের নীচে, পিঠে সবসময় একটা অস্ত্র নিয়ে চলে।'

যন্ত্র কুয়েটজালকোটল আবার তার নীল ইস্পাতের পালকে হাত বোলাল। ভুরু কুঁচকে গেছে।

'মারামারি বন্ধ করতে হবে তোমাকে। তোমাদের দু'জনকেই। চিরদিনের জন্যে,' বলল সে। 'গোটা ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের একমাত্র কর্তব্য হলো প্রতিটি গ্রহে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা।'

'যা ভেবেছিলাম তাই,' উৎফুল্লচিত্তে বলল মিগুয়েল।

'তুমি আসলে আমেরিকা থেকে এসেছ। তোমাদের কাজই তো সবার ওপর খবরদারি করা। তা তোমাদের দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারছ না কেন? নিউ ইয়র্কের সন্ত্রাসীরা তো আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিংগুলোর ছাদে উঠে গোলাগুলি করে। তার কী ব্যবস্থা করেছ শুনি? তোমাদের মতলব আর জানতে বাকি নেই আমাদের। শান্তির কথা বলে এদেশের তেল আর মূল্যবান খনিজ পদার্থগুলো হাতিয়ে নেয়ার তাল করেছ, না?'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল কুয়েটজালকোটলের। ঝকঝকে ইস্পাতের আঙুলের ডগা দিয়ে সক্রোধে লাথি বসাল সে একটা নুড়ি পাথরে।

'দাঁড়াও, তোমাকে বোঝাবার ব্যবস্থা করছি,' বলল সে। মিগুয়েলের ঠোঁটে ঝোলানো সিগারেটটার দিকে তাকাল। হাতটা শরীরের পাশ থেকে তুলল লোকটা, আঙুলের একটা আংটি থেকে সাদা, উত্তপ্ত একটা রশ্মি বেরুল চোখের পলকে, সিগারেটের ডগায় গিয়ে লাগল। জ্বলে উঠল আগুন। ভয়ে এবং বিস্ময়ে ঝাঁকি

খেয়ে উঠেছিল মিগুয়েল। এখন ধোঁয়া টানতে টানতে মাথা দোলাল বিব্রত ভঙ্গিতে। সাদা রশ্মিটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

'দারুণ দেখালেন, সিনর!' নিমেষে 'তুমি' থেকে 'আপনি'তে চলে এল মিগুয়েল।

কুয়েটজালকোটলের বর্ণহীন ঠোঁটজোড়া চেপে বসল পরস্পরের সাথে। 'মিগুয়েল,' বলল সে, 'কোনও আমেরিকানের পক্ষে কি একাজ করা সম্ভব?'

'মাথা খারাপ!' বিড়বিড় করল মিগুয়েল।

'আমেরিকান দূরে থাক, পৃথিবীর কোনও মানুষের পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব নয়। আর তুমি এতক্ষণে নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছ।'

মাথা ঝাঁকাল মিগুয়েল।

'ওই যে ক্যাকটাসটা দেখতে পাচ্ছ,' ইঙ্গিত করল কুয়েটজালকোটল, 'ওটাকে দু'সেকেণ্ডে ধ্বংস করে দিতে পারি আমি

'তাতে আমার কোনওই সন্দেহ নেই, সিনর।'

'ইচ্ছে করলে তোমাদের এই গ্রহটাকেও উড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখি আমি!'

'জী জী' বিনীত ভঙ্গিতে বলল মিগুয়েল 'আমি তোমার কথা শুনেছি আমি। কিন্তু আপনার মত মহাশক্তিধর মানুষ কেন যে আমাদের এই ক্ষুদে ব্যাপারটা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন, বুঝতে পারছি না।'

বাতাসে শিস কেটে পাশ দিয়ে চলে গেল একটা বুলেট

কুয়েটজালকোটল রাগত ভঙ্গিতে তার হাতের আংটি ঘষল।

'কারণ আমরা চাই এপৃথিবীতে কেউ ঝগড়াঝাঁটি করবে না' বলল সে গম্ভীর গলায়। অশুভ একটা ভাব ফুটে উঠল চেহারায় 'আর তা না হলে এই গ্রহ ধ্বংস করে দেব আমরা। শাস্তিতে,

সবাই মিলে ভাই-ভাই হয়ে না থাকতে পারার কোনও কারণই নেই।'

'একটা কারণ আছে, সিনর

'কী সেটা?'

'ফার্নান্দেজ,' বলল মিগুয়েল

'মারামারি না থামালে তোমাদের দু'জনকেই শেষ করে দেব।'

'সিনর একজন শান্তিকামী মহৎ মানুষ,' বেছে বেছে শব্দ চয়ন করছে মিগুয়েল। 'আমি সানন্দে মারামারি বন্ধ করে দেব যদি সিনর অনুগ্রহ করে বলেন ফার্নান্দেজের হাতে খুন হওয়া থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে পারি।'

'ফার্নান্দেজেরও মারামারি করা চলবে না।'

মিগুয়েল তার তোবড়ানো চওড়া কার্নিসঅলা চামড়ার হ্যাটটা নামাল মাথা থেকে, এক টুকরো লাঠির ওপর ওটা বসিয়ে বোল্ডারের কিনারে তুলে ধরল লাঠিটা। সাথে সাথে কান ফাটানো গুলির আওয়াজ হলো হ্যাটটা উড়ে গেল শূন্যে মাটিতে পড়ার আগেই ওটাকে ধরে ফেলল মিগুয়েল

'সিনর তো নিজের চোখেই সব দেখলেন,' নালিশের সুর মিগুয়েলের কণ্ঠে 'এখনও আপনি যদি কেস বলে থাকেন আমি আর মারামারির দিকে যাব না। তবে নিরাপদ এই ঘাঁটির থেকে আমি নিরস্ত্র অবস্থায় বেরোতে রাজি নই আমিও চাই আমাদের মধ্যে হানাহানি বন্ধ হোক। তবে আমার মনে হচ্ছে, আপনি চাইছেন আমি কিছু একটা করি কিন্তু কীভাবে, কী করব তা আপনি বলছেন না'

কুয়েটজালকোটাসের কপালে আরও গভীর ভাঁজ পড়ল। খানিক বিরতির পরে সে জানতে চাইল: 'মিগুয়েল, তোমাদের ঝগড়াটা কী নিয়ে, প্রথম থেকে বলো

'ফার্নান্দেজ আমাকে খুন করে আমার পরিবারকে ক্রীতদাস বানাতে চায়

'কিন্তু তা কেন করতে চাইবে সে?'

'কারণ ও একটা শয়তান,' জবাব দিল মিগুয়েল।

'ও শয়তান বুঝলে কী করে?'

'কারণ,' একটু ভেবে বলল মিগুয়েল, 'ও আমাকে হত্যা করতে চায় এবং আমার পরিবারকে ক্রীতদাস বানাতে চায়।'

আবার বিরতি। একটা রোড-রানারকে দেখা গেল গলা বাড়িয়ে মিগুয়েলের রাইফেলের ঝলমলে ব্যারেলের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিগুয়েল 'আমার ছাগলের চামড়ার ঝোলায় উৎকৃষ্ট মদ আছে। ওই ওখানে-' হাত বাড়িয়ে দেখাতে চাইল সে

বাধা দিল কুয়েটজালকোটল।

'পানির হিস্যা নিয়ে কী যেন বলছিলে?'

'ওহ্, ওই ব্যাপার,' বলল মিগুয়েল। 'এ দেশটা খুব গরিব, সিনর। পানির দাম এখানে সোনার চেয়েও বেশি। এবারের মওসুমে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। ঘরে ঘরে পানির জন্যে হাহাকার চলছে একটা কুয়ো আছে আমাদের এলাকায়। কুয়োর মালিক আমি নিজে। অথচ ফার্নান্দেজ আমাকে হত্যা করে আমার পরিবারকে...

'তোমাদের দেশে আইন নেই? আদালত নেই?'

'থাকবে না কেন! কিন্তু ওসব আইন-আদালতে কাজ হয় না।'

'ফার্নান্দেজের পরিবার নেই?' জিজ্ঞেস করল কুয়েটজালকোটল।

'আছে তবে ওরা খুব গরিব,' বলল মিগুয়েল। 'সংসারের কাজ না করলেই ফার্নান্দেজ ওদেরকে ধরে পিটুনি দেয়।'

'তুমি দাও না?'

'প্রয়োজন হলেই দিই,' বেশ অবাক হয়েছে মিগুয়েল এ প্রশ্নে। 'আমার বউটা যেমন মোটা তেমন অলস। আর বড় ছেলেটা, টিকোর, মুখে মুখে কথা বলার বদভ্যাস আছে। ওদের ভালর জন্যেই মাঝে মাঝে পিটুনি দিতে হয় আমাকে। এটা আমার কর্তব্য বলতে পারেন। তেমনি পানির হিস্যা আদায় করাও আমার কর্তব্য। বিশেষ করে যতক্ষণ পর্যন্ত শয়তান ফার্নান্দেজ আমাকে খুন করার...

দাবড়ানি দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল অধৈর্য কুয়েটজালকোটল 'খামোকা সময় নষ্ট করছ তোমরা। দেখি আমাকে একটু ভাবতে দাও।' সে আংটিটা আবার ঘষতে লাগল। চারপাশে একবার চোখ বোলাল। রোড-রানারটা রাইফেলের চেয়েও চিত্তাকর্ষক জিনিসের সন্ধান পেয়ে গেছে। একটা গিরগিটি ধরেছে পাখিটা। দুই ঠোঁটের ফাঁকে বন্দী প্রাণীটার লেজের ডগা তীব্র আক্ষেপে মোচড় খাচ্ছে।

মাথার ওপরে, পরিষ্কার নীল আকাশে দগদগে তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। শুকনো বাতাস নিশ্চল। নীচে, উপত্যকায় ফ্লাইং সসারটা ঝকমক করছে। অপার্থিব লাগছে দেখতে। 'তুমি এখানেই থাকো,' অবশেষে বলল কুয়েটজালকোটল। 'আমি ফার্নান্দেজের সঙ্গে কথা বলে আসি। ডাকলে আমার উড়ুক্কু বাহনের কাছে চলে এসো। ফার্নান্দেজকে নিয়ে আমি ওখানেই যাব।'

'আপনি যা বলেন, সিনর,' বিনয়ে বিগলিত হলো মিগুয়েল

'খবরদার, রাইফেলে হাত দেবে না,' ওকে সতর্ক করে দিল ভিনগ্রহবাসী।

'ছি ছি। তা কেন, সিনর।' এক হাত জিভ কাটল মিগুয়েল। কিন্তু স্থির হয়ে নিজের জায়গায় বসে থাকল সে লম্বা লোকটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর সাবধানে, শুকনো মাটির ওপর দিয়ে হামাগুড়ি মেরে এগোল রাইফেলের দিকে। খানিক খোঁজাখুঁজির

পরে ছুরিটারও সন্ধান মিলল। তারপর মদের থলেতে হাত দিল মিগুয়েল। প্রচণ্ড পিপাসা পেলেও মাত্র কয়েক ঢোক গিলল সে। রাইফেলে পুরো একটা ক্লিপ ঢোকাল, হেলান দিয়ে বসল একটা পাথরের গায়ে, মাঝে মাঝে চুমুক দিল ছাগলের চামড়ার মদের থলেতে।

এদিকে আগন্তুক দৃঢ় পায়ে পৌঁছে গেছে ফার্নান্দেজের কাছে। ফার্নান্দেজ তাকে লক্ষ্য করে অজস্র গুলি ছুঁড়েছে বটে, তবে যে ক'টা বুলেট লোকটার ইস্পাতে মোড়া শরীর ছুঁয়ে গেছে, তাতে তার কোনও ক্ষতিই হয়নি। শুধু নীলচে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতে দেখেছে ফার্নান্দেজ, গুলির কোনও হদিস পায়নি।

বিমূঢ় হয়ে শেষতক গুলি ছোঁড়া বন্ধ করেছে সে। ভিনগ্রহবাসী তার সাথে অনেকক্ষণ কী কথা বলল কে জানে, দেখা গেল ফার্নান্দেজের লুকানো আশ্রয় থেকে লম্বু বেরিয়ে আসছে মিগুয়েলের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে।

'জ়ী, সিনর,' মিগুয়েল গলা ফাটিয়ে চেঁচাল। রাইফেলটা পাথরের ওপর, হাতের নাগালের মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়াল সতর্ক ভঙ্গিতে, গুলির শব্দ হলো না।

আগন্তুকের পাশে এবার দেখা গেল ফার্নান্দেজকে। বিদ্যুৎ খেলে গেল মিগুয়েলের শরীরে, চট্‌ করে ঝুঁকে রাইফেলটা তুলে নিল সে, গুলি করবে।

মৃদু 'হিস্‌স্‌' একটা শব্দে হঠাৎ ভরে গেল উপত্যকা। মিগুয়েলের মুঠোতে ধরা রাইফেলটা নিমেষে টকটকে লাল হয়ে উঠল, যেন গরম লোহার রড। আর্তচিৎকার করে ফেলে দিল মিগুয়েল অস্ত্রটা, পর মুহূর্তে দুনিয়া আঁধার হয়ে এল।

'মরলে বীরের মত মরব,' ভাবল সে চকিতে, তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

যখন জ্ঞান ফিরে পেল, মিগুয়েল দেখল বিশাল ফ্লাইং

সসারটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ও। কুয়েটজালকোটল একটা হাত সরিয়ে নিল মিগুয়েলের মুখের ওপর থেকে। সূর্যের আলোতে ঝিকিয়ে উঠছে তার হাতের আংটিটা। মিগুয়েল হতভম্বের মত এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল।

'আমি বেঁচে আছি?' প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল ও।

তবে কুয়েটজালকোটল ওর দিকে তাকিয়ে নেই। ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে ফার্নান্দেজের দিকে। ফার্নান্দেজ লোকটার পেছনে দাঁড়িয়ে মুখ ভেংচাচ্ছিল মিগুয়েলকে ভিনগ্রহবাসী দেখে ফেলল দৃশ্যটা। তার হাতের আংটি ঝলসে উঠল আবার সরু একটা আলোক রেখা সোজা গিয়ে ঢুকল ফার্নান্দেজের চকচকে কাঁচের মত চোখে। একটা ঝাঁকি খেল ফার্নান্দেজ, বিড়বিড় করে কী যেন বলল, বোঝা গেল না। মিগুয়েল তার রাইফেল আর ছুরির আশায় চোখ ঘোরাল চারপাশে। নেই হয়ে গেছে ও দুটো। শার্টের মধ্যে হাত ঢোকাল, শেষ অস্ত্রটাও গায়েব হয়ে গেছে। ফার্নান্দেজের চোখে চোখ রাখল সে। 'আমাদের দু'জনেরই কম্ম সাবাড়, ডন ফার্নান্দেজ,' বলে উঠল সে। 'এই সিনর কুয়েটজালকোটল আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেলবেন। তবে ভেবে দুঃখ লাগছে তোমার জায়গা হবে নরকে আর আমি যাব স্বর্গে এ জীবনে আর দেখা হবে না।'

'কথাটা ভুল বললে,' খামোকাই নিজের ছুরিটা খুঁজল ফার্নান্দেজ। 'স্বর্গে তোমার জায়গা হবে না কোনওদিনই। কারণ তুমি একটা আস্ত মিথ্যেবাদী এবং জোচ্চোর।'

'আর তোমার মত পাপিষ্ঠ গোটা পৃথিবীতে নেই,' দাঁত কিড়মিড় করল মিগুয়েল।

'আহ্! কী শুরু করলে তোমরা?' ধমকে উঠল ভিনগ্রহবাসী। 'ফালতু বকবকানি বন্ধ করে আমার কথা শোনো। আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানকার বাসিন্দারা গোটা সৌরজগতে নিরবচ্ছিন্ন

শান্তি কায়েম করতে চায়। আমরা অত্যন্ত প্রগতিশীল একটি জাতি, এতই শক্তিশালী যা তোমরা কল্পনাও রতে পারবে না। তোমাদের যে সব সমস্যার কোনও সমাধান নেই তা আমরা সমাধা করে রেখেছি বহু আগেই। এখন আমাদের ওপর দায়িত্ব বর্তেছে সমস্ত শক্তি ভালর জন্যে, জগতের সুখের জন্যে ব্যয় করার। যদি বাঁচতে চাও, মারামারি, হানাহানি বন্ধ করতে হবে চিরদিনের জন্যে এবং আজ থেকে "ভাই ভাই" হিসেবে গলা জড়াজড়ি করে থাকতে হবে শান্তিতে। আমার কথা বোঝা গেছে?'

'আমিও তো তাই চাই, সিনর,' বলল ফার্নান্দেজ। 'কিন্তু এই ছাগলের নাতি আমাকে খুন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।'

'আর কোনও খুনোখুনি চলবে না,' ঘোষণা করল কুয়েটজালকোটল। 'হয় শান্তিতে থাকবে নয়তো মরতে হবে।'

মিগুয়েল এবং ফার্নান্দেজ একবার দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল তারপর তাকাল তালগাছের দিকে।

'সিনর মহা শান্তিকামী,' বিড়বিড় করল মিগুয়েল। 'এ কথা আগেও একবার বলেছি আমি। যেভাবে বললেন তাতে শান্তি স্থাপন করা সত্যি সম্ভব। কিন্তু আমাদের কাছে অন্তত ব্যাপারটা অত সহজ নয়। শান্তিতে বসবাস করা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু কীভাবে তা করব বলে দিন, সিনর।'

'বললামই তো, আর ঝগড়াঝাঁটি করা চলবে না,' চরম বিরক্তি প্রকাশ করল কুয়েটজালকোটল।

'কথাটা মুখে বলা খুব সহজ,' ফার্নান্দেজ এবার গলা চড়াল। 'তবে এখানে, সোনোরায় জীবন ধারণ মোটেই সহজ নয়। হয়তো আপনি যেখান থেকে এসেছেন...'

'ঠিক,' সায় দিল মিগুয়েল। 'পশ্চিমে ওরা সবাই খুব বড়লোক।'

'...হয়তো আপনার দেশে, সিনর,' বক বক করেই চলেছে

ফার্নান্দেজ। 'সাপ ইঁদুর খায় না, এবং পাখি সাপ ধরে না। হয়তো আপনার দেশে খাবার এবং পানির কোনওই অভাব নেই, পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতে সেখানে কাউকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয় না। কিন্তু এখানে তা হয়।'

মাথা দোলাল মিগুয়েল। 'একদিন নিশ্চয়ই আমরা সবাই ভাই ভাই হব। কাজটা খুব সহজ নয়, তবু চেষ্টা করব ভাল হতে। খুবই ভাল হত যদি একটা কথার যাদুতে সব কিছু বদলে যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত...' কাঁধ নাচাল সে।

'সমস্যার সমাধান করতে শক্তি প্রয়োগ না করলেই হলো,' দৃঢ় গলায় বলল কুয়েটজালকোটল। 'শক্তি হচ্ছে আসল শয়তান। তোমাদের এক্ষুণি মৈত্রী স্থাপন করতে হবে।'

'নইলে আপনি আমাদেরকে আস্ত রাখবেন না,' বলল মিগুয়েল। আবার শ্রাগ করল সে, তাকাল ফার্নান্দেজের চোখে। 'ঠিক আছে, সিনর। আপনার কথার ওপর আর কথা নেই। আমি রাজি। এখন কী করতে হবে?'

কুয়েটজালকোটল ঘুরল ফার্নান্দেজের দিকে।

'আমিও রাজি, সিনর,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল অপরজন। 'আপনি, সন্দেহ নেই, ঠিক কাজটিই করছেন। শান্তিই দরকার এখন আমাদের।'

'তা হলে দু'জনে হাতে হাত রাখো,' ঝিকঝিক করছে কুয়েটজালকোটলের চোখ। 'ভ্রাতৃত্বের শপথ নাও।'

হাত বাড়িয়ে দিল মিগুয়েল। ফার্নান্দেজ শক্ত মুঠোয় হাতটা ধরল, হাসল চোখে চোখ রেখে।

'দেখলে তো?' মহাপুরুষসুলভ হাসি উপহার দিল কুয়েটজালকোটল। 'ব্যাপারটা কঠিন কিছুই নয়। এখন তোমরা বন্ধু হয়েছ। সব সময় এরকম থাকবে।'

ঘুরে হাঁটা দিল সে ফ্লাইং সসারের উদ্দেশে। একটা দরজা

খুলে গেল আস্তে, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে ফিরল কুয়েটজালকোটল। 'সাবধান,' বলল সে। 'আমি কিন্তু সব লক্ষ করব।'

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না,' বলল ফার্নান্দেজ।

'বিদায়, সিনর।'

'খোদা হাফেজ,' হাত নাড়ল মিগুয়েল।

স্পেইস শিপের ভেতরে কুয়েটজালকোটল ঢুকে যেতে আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। খানিক পরে মসৃণ গতিতে শূন্যে উঠে গেল ফ্লাইং সসার, মাটি থেকে একশো ফুট ওপরে ঝুলে থাকল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বিদ্যুতের একটা ঝিলিক তৈরি করে সাঁ করে মিলিয়ে গেল আকাশে।

'যা ভেবেছিলাম,' মন্তব্য করল মিগুয়েল।

'পশ্চিম থেকেই এসেছিল ওই লোক।' কাঁধ নাচাল ফার্নান্দেজ। 'ভেবেছিলাম লোকটা আমাদের এমন কিছু পরামর্শ দেবে যা সত্যি কাজে লাগবে। ব্যাটার অনেক জ্ঞান আছে বটে, তবে কঠিন বাস্তব জীবন সম্পর্কে কোনওই ধারণা নেই।'

'ও রকম বড় বড় কথা সবাই বলে,' বলল মিগুয়েল। 'কিন্তু সোনোরায় তো আর সে থাকে না। থাকলে বুঝত কত ধানে কত চাল। আমরা এখানে থাকি, বুঝি জীবন কী জিনিস। তবে তোমার চেয়ে আমি সৌভাগ্যবান, ফার্নান্দেজ। কারণ আমার একটা কুয়ো আছে এটা না থাকলে সত্যি জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে যেত।'

'কুয়োটাতে তেমন পানি নেই,' বলল ফার্নান্দেজ। 'তবে ওতে কিন্তু তোমার কোনও অধিকার নেই। ওটা আমার জিনিস।' কথা বলতে বলতে সিগারেট বানিয়ে একটা মিগুয়েলকে দিয়ে বাকিটা নিজে ধরাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট ফুঁকল দু'জনে। তারপর কোনও বাক্য ব্যয় না করে আলগোছে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওরা

মিগুয়েল ফিরে গেল তার আগের জায়গায়। আনন্দের সাথে মদ গিলল ঢকঢক করে তারপর চারপাশে চোখ বোলাতে গিয়ে দেখল ওর ছুরি এবং রাইফেল কয়েক গজ দূরে পড়ে আছে। অস্ত্রগুলো উদ্ধার করল মিগুয়েল। প্রথমেই দেখে নিশ্চিন্ত হলো রাইফেলে পুরো ক্লিপ ভরাই আছে।

তারপর সে আস্তে আস্তে তার পাথুরে আশ্রয় থেকে মুখ তুলল। সাথে সাথে একটা বুলেট এসে লাগল তার নাকের কাছের পাথরটাতে। চমকে উঠে মুখ সরিয়ে নিল মিগুয়েল। পরক্ষণে তার হাতের রাইফেল গর্জে উঠল

কয়েক মুহূর্তের জন্যে নীরবতা নেমে এল উপত্যকায়। মিগুয়েল বসে বসে আরেক ঢোক মদ গিলল। হঠাৎ নজর আটকে গেল রোড-রানারটার দিকে। পাখিটার ঠোঁটে এখনও গিরগিটিটা ঝুলছে। তবে শিকারের প্রায় সমস্ত শরীর শিকারীর মুখের মধ্যে, শুধু ঠোঁটের কোণে লেজটা তড়পাচ্ছে এখনও।

মিগুয়েল নরম গলায় ডাকল, 'পাখি ভাই! গিরগিটি শিকার করা কিন্তু অন্যায়। খুব অন্যায়।'

রোড-রানারটা ওর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে শব্দ করে উঠল, তারপর দিল দৌড়।

মিগুয়েল রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করল। 'পাখি ভাই, গিরগিটি খাওয়া বন্ধ করো। না হলে তোমাকে আমি মারব।'

রোড-রানারটা দৌড়াতেই থাকল। 'থামতে বলছি, কানে যায় না?' মৃদু কণ্ঠে বলল মিগুয়েল। 'নাকি হাতে-কলমে শিখিয়ে দিতে হবে?'

থেমে দাঁড়াল রোড-রানার গিরগিটির লেজটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে তার মুখের ভেতরে।

'বেশ, বেশ!' স্বগতোক্তি করল মিগুয়েল।

'যদি কোনওদিন দেখি রোড-রানাররা বাগে পেয়েও গিরগিটি

খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, তখন আমি তোমাকে জানাব, ভিনদেশী বন্ধু। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে।'

ঘুরে বসল সে, আবার রাইফেল তাক করল উপত্যকার দিকে। শুরু করল জানের শত্রুর দিকে গুলি বর্ষণ।

মূলঃ হেনরী কুটনার
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

তারা-হাঁস

ঘ্যাঁচ করে র‍্যাফার্টির সবুজ গাড়িটা ব্রেক কষল বুড়ো এসপের খামার বাড়ির সামনে। একটু পিছিয়ে নিয়ে কাছের জাম গাছটার নীচে গাড়িটা পার্ক করল সে। তারপর বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী র‍্যাফার্টি, 'দি টাইমস' পত্রিকার সেরা রিপোর্টার। চারদিকে একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনল সে। এবার সামান্য বিস্ময় বাসা বেঁধেছে তার চোখে-মুখে। আশপাশে কোথায় তার সেই প্রত্যাশিত ভিড়? কোথায় পুলিশ? কোথায় অ্যাম্বুলেন্স? চারপাশে সুমসাম নীরবতা, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। শুধু দেখতে পেল, একটা শান্ত পুরানো খামার বাড়ি, একটা অবহেলিত বাগান, নীচে পড়ে থাকা চারপাশের ভাঙা বেড়া, মুরগির ঘর আর কাদায় ভরা খামার বাড়ির উঠোনটা। সামনের ভাঙা গেটটা আস্তে করে ধাক্কা দিল সে। মৃদু আপত্তি করে খুলে গেল সেটা। সামনে খামার বাড়িটার নড়বড়ে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। অগত্যা সেদিকেই এগোল সাংবাদিক সাহেব। পেছনের বারান্দায় উঠে আসতেই খুলে গেল কাঠের দরজাটা। বুড়োমত একজন লোক বেরিয়ে এল। পোশাক-আশাক আর হাব-ভাব দেখে র‍্যাফার্টির বুঝতে সময় লাগল না ইনিই মি. এসপ। মাথার হ্যাটটা একটু পেছনে নামাল সে, 'আমি র‍্যাফার্টি। দি টাইমসের র‍্যাফার্টি।'

'র‍্যাফার্টি?' একটু ঘাবড়ানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল এসপ। পরিষ্কার বোঝা গেল সে কখনও 'দি টাইমস' পড়েনি।

'আমি একজন সাংবাদিক। কিছুক্ষণ আগে একজন ফোন করে জানাল, এদিকেই আশপাশে নাকি একটা প্লেন ক্র্যাশ করেছে।'

চিন্তিত দেখে তাকাল মি. এসপ, তারপর মাথা চুলকিয়ে খুব ধীরে ধীরে বলল, 'না তো। না।'

র‍্যাফার্টি চুপচাপ চেয়ে থেকে ওকে আরও চিন্তা-ভাবনা করার সময় দিল। লোকটার চিন্তা যে খুব ধীরে ধীরে খোলে তা সে বুঝে গেছে। মি. এসপ ধীরে মাথা নেড়ে আবারও বলল, 'নাহ!'

পেছনে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এলেন মিসেস এসপ। স্বামীর চাইতে কিছুটা সপ্রতিভ মনে হলো তাঁকে। র‍্যাফার্টি কোনও ভণিতা না করে ফোনে পাওয়া খবরটা জানাল তাকে। স্বামীর মতই ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'নাহ্! না তো।'

বারান্দার রেলিংয়ে হাত রেখে ঘুরে দাঁড়াল র‍্যাফার্টি, সিঁড়ির গোড়ায় পা রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে একটা মিথ্যা খবর ছিল। প্রায়ই আমাদের অফিসে এ জাতীয় ফোন আসে দেখুন না, একটু হাসল সে, 'কেউ একজন ফোন করে বলল, সে নাকি আপনাদের মাঠে একটা অ্যারোপ্লেন নামতে দেখেছে আগুন নিয়ে। মানে, ওটার পেছন দিক থেকে নাকি আগুন বেরিয়ে আসছিল।'

মিসেস এসপের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ওহ্ হো!' বলে উঠল সে। 'হ্যাঁ, কথাটা তো ঠিক। কিন্তু ওটা ক্র্যাশ ছিল না। শুধু নীচে নেমে এসেছে। তা ছাড়া জিনিসটা ঠিক অ্যারোপ্লেনও নয়, ওটার তো কোনও পাখাই নেই।'

র‍্যাফার্টির পা থেমে গেল। একলাফে সে উঠে এল বারান্দায়। 'মাফ করবেন,' বলল সে। 'একটা অ্যারোপ্লেন নেমে এল? এবং আপনি বলছেন, সেটার কোনও পাখা নেই?'

'হ্যাঁ,' মিসেস এসপ জবাব দিল। 'ওটা এখন আমাদের গোলা-বাড়িতে আছে। যন্ত্রটা এমন কিছু লোকের, যারা নাকি হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটায়।'

'হুম!' মনে মনে ভাবল র‍্যাফার্টি, খবরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। 'উম্, সম্ভবত ওটা একটা হেলিকপ্টার?' সে জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল মিসেস এসপ। 'না, আমার তা মনে হয় না। হেলিকপ্টারের মত ওর কোনও পাখা নেই। আপনি যদি চান তো নিজের চোখেই সেটা দেখে আসতে পারেন। আলফ্রেড, তুমি ওকে একটু গোলাবাড়িতে নিয়ে যাও তো। দেখো, উনি যেন তক্তার ওপর দিয়ে হাঁটেন, মাটি যা পিচ্ছিল...'

মি. এসপের পেছন পেছন কাদায় ফেলে রাখা বড় বড় কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে এগোল র‍্যাফার্টি। 'শালা,' আপন মনেই বিড়বিড় করল সে। 'আমার এই চাকরি জীবনে কত যে অদ্ভুত আর কত যে নির্বোধ লোক চোখে পড়ল, কিন্তু এই জাতীয় মহাঅদ্ভুত আর মহানির্বোধ লোক দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'জানেন, এবছর খুব সুন্দর মুরগির ছানা ফুটিয়েছি আমি,' মি. এসপ খুব ধীরে ধীরে বলল। 'আর কখনও এত ভাল পাইনি আচ্ছা মি র‍্যাফার্টি, আপনি কি মনে করেন, মুরগির ছানাগুলো ওই দূরের তারার দেশে ভাল থাকবে?'

কোনও ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই আকাশের দিকে চোখ তুলল র‍্যাফার্টি। যা হবার তাই হলো। একটা পা গিয়ে পড়ল কাদায়। কাদামাখা পা-টা তাড়াতাড়ি টেনে তুলল সে। 'দূরের কোন্ দেশে?'

'আমি বলছিলাম ওই যে দূরের তারার দেশে,' স্বভাবসুলভ ধীর গতি আর শান্ত ভঙ্গিতে বলল মি. এসপ।

ততক্ষণে গোলাবাড়ির দরজায় পৌঁছে গেছে ওরা। র‍্যাফার্টিকে

পেছনে ফেলে সামনে গিয়ে দরজা ঠেলতে শুরু করল এসপ। 'আপনাকেও একটু আমার সাথে জোরে ধাক্কা দিতে হবে,' বলল সে। 'এটা মনে হয় শক্ত হয়ে গেছে।'

এসপের সাথে র‍্যাফার্টিও কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল দরজার ওপর। কিছুক্ষণ গড়িমসি করে হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে চোখ পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে র‍্যাফার্টি বুঝে গেল, ওর ছুটে আসাটা ব্যর্থ হয়নি। আসলেই এখানে দারুণ একটা গল্প সৃষ্টি হয়ে আছে।

ভেতরের জিনিসটাকে প্রকাণ্ড একটা আধ ফুলানো প্লাস্টিক বেলুনের মত লাগছে। এর ওপরের দিকটা গোল, আর নীচের দিকটা বেশ চ্যাপ্টা। র‍্যাফার্টি দেখতে পেল চ্যাপ্টা দিকটা গড়াগড়ি যাচ্ছে খড় বিছানো মেঝের উপর। অদ্ভুত জিনিসটা আকারে বেশ বড় হলেও গোলাবাড়ির দরজা দিয়ে ঢোকার পক্ষে যথেষ্ট ছোট। 'এটা নিশ্চয়ই কারও নড়বড়ে পরিকল্পনায় বানানো স্পেসশীপ,' ভাবল র‍্যাফার্টি। দিব্য চোখে সে দেখতে পেল আগামীকালের 'দি টাইমসের' প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে–

'স্থানীয় চাষীর অভূতপূর্ব আবিষ্কার–
চাঁদ ভ্রমণের মহাকাশযান'

'মি. এসপ,' আশান্বিত গলায় বলল সে, 'এটা নিশ্চয়ই আপনার তৈরি?'

হেসে ফেলল এসপ। 'না ভাই, না। শুধু এটুকু বলতে পারি, এই অদ্ভুত যন্ত্রটাতে চড়েই আমার বন্ধুরা এসেছে।'

এসপ ঠাট্টা করছে কিনা বোঝার জন্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল র‍্যাফার্টি। কিন্তু বুড়ো চাষীর মুখ পুরোপুরি সিরিয়াস দেখাল তার চোখে।

'আচ্ছা, আপনার এই যে বন্ধুরা, এরা কারা?'

'আপনি শুনে কী মনে করবেন, বুঝতে পারছি না,' এসপ

বলল। 'কিন্তু সত্যিই আমি জানি না ওরা কারা। আপনি দেখুন, আমরা যেভাবে কথা বলি, ওরা সেভাবে কথা বলে না। আসলে ওরা কথাই বলে না। আমরা শুধু এটুকু জানতে পেরেছি যে ওদের নামের অর্থ হলো, যারা হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটায়।'

যন্ত্রটার খুঁটিনাটি জিনিসগুলো আরও ভাল করে দেখতে ওটার বেশ কাছে চলে এল র‍্যাফার্টি। তারপর আচমকা বেশ জোরে চিৎকার করে সরে এল সে। যেন গায়ে ভীষণ ব্যথা পেয়েছে এমনি করে দুই হাতে পা ঘষছে সে এখন।

'ওহ্, মি. র‍্যাফার্টি! আমি আপনাকে বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম,' ওর অবস্থা দেখে বলল এসপ। 'ওই যন্ত্রটার চারপাশে একটা অদৃশ্য দেয়াল আছে। কেউ যদি সেটার সাথে ধাক্কা খায়, তবে ওটা আঘাত করে। মনে হয় ওই না দেখা দেয়ালটাই ব্যথা দিয়েছে আপনাকে, তাই না? আসলে বাচ্চাকাচ্চারা যাতে ঝামেলা না করে সেজন্যে ওরা নাকি এই ব্যবস্থাটা করে রেখেছে।'

'তা মি. এসপ, আপনার বন্ধুরা এখন কোথায়?' নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল র‍্যাফার্টি।

'ওরা বাড়ির ভেতরে আছে,' এসপ উত্তর দিল। 'আপনি যদি চান তো ওদের দেখতে পারেন, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওদের সাথে কথা বলাটা বেশ কঠিন। আমাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ওরা।'

'রাশিয়ান নাকি?'

'উঁহুঁ, মনে হয় না। আমার চেয়ে আপনিই বোধহয় ভাল বলতে পারবেন ওরা কারা।'

'বেশ তো, চলুন দেখা যাক।'

কাদাভরা উঠন ধরে এসপের পেছনে পা টিপে টিপে চলল র‍্যাফার্টি।

'বুঝলেন, ছয় বছর আগে এই লোকেরা প্রথম আমাদের কাছে

আসে,' ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন মি. এসপ। 'ওরা আমাদের কাছে কয়েকটা মুরগির ডিম চায়। ওদের দেশে নিয়ে গিয়ে ডিমগুলো ফুটাবে। কিন্তু দেখুন, দেশে ফিরতেই নাকি সময় লাগে তিন বছর। এতদিন কি আর ডিম ভাল থাকে? গেল নষ্ট হয়ে। তা, এই বছর ওরা আবার এসেছে আরও কয়েকটা ডিম নিতে। আমি অবশ্য এবার বুদ্ধি করে একটা ডিম ফোটানোর যন্ত্র যোগাড় করে রেখেছি, ওরা বাড়িতে যাওয়ার পথেই মুরগির ছানা ফুটিয়ে নিতে পারবে।' হঠাৎ করেই হেসে উঠল সে। 'আমি চোখ বন্ধ করলেও দেখতে পাই আকাশের ওপর ওদের এই যন্ত্রটা আমার মুরগির ছানায় ভরে উঠেছে।'

খামার বাড়িটার কাছাকাছি এসে এসপকে পাশ কাটিয়ে প্রায় দৌড়েই পেছনের বারান্দায় উঠে এল র‍্যাফার্টি। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেল সে। পেছন থেকে মি. এসপ খামচে ধরল তার হাত। ফিসফিসিয়ে বলল, 'মি. র‍্যাফার্টি, আমার স্ত্রী ওদের সাথে আমার চাইতে ভাল ভাবে কথা বলতে পারে। আস্তে ধীরে ঘরে ঢুকুন, তাকে কথা বলতে দিন।'

'ঠিক আছে,' বলে পিছিয়ে এল র‍্যাফার্টি। খুব সাবধানে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মি. এসপ, তাঁর সাথে গা ঘেঁষে নিঃশব্দে ঢুকল র‍্যাফার্টি এবং অপরিসীম বিস্ময় নিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ঘরের ভেতর।

মিসেস এসপ বসেছে আগন্তুকদের দিকে মুখ করে। ওদের মধ্যে একজন মহিলা, অন্যজন পুরুষ। একটা সোফার ওপর তারা বসেছিল পাশাপাশি। র‍্যাফার্টি লক্ষ করল এদের মাথার ওপর পাতলা সরু অ্যান্টেনা জাতীয় জিনিসগুলো এদিক ওদিক নড়ছে। মুখমণ্ডল গাঢ় বেগুনি রঙের এবং তা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। মুখের অর্ধেক জুড়ে বিরাট বড় গোল গোল চোখ। হঠাৎ দেখে মনে হয় পুরো মুখটাই কোনও পাগলাটে শিল্পীর নিখুঁত তুলির আঁচড়ে

আঁকা।

এবারে মিসেস এসপ মুখভর্তি হাসি নিয়ে রেফার্টির দিকে ঘুরে তাকাল। 'মি. র‍্যাফার্টি,' সে বলল, 'এরাই সেই লোক, অ্যারোপ্লেনে চড়ে আমাদের কাছে এসেছে।' কথা শেষ করে সে তার আঙুলটা উঁচু করে ধরল আর মুহূর্তে আগন্তুকেরা তাদের অ্যান্টেনাগুলো তার দিকে নামিয়ে দিল। 'ইনি হচ্ছেন মি. র‍্যাফার্টি,' বেশ জোরে চেঁচিয়ে বলল সে, সাধারণত লোকে কানে কম শুনলে আমরা যেমন জোরে কথা বলি তেমনি করে। 'একটা বিখ্যাত পত্রিকার সাংবাদিক। ইনি তোমাদের অ্যারোপ্লেনটা দেখেছেন।'

বিস্মিত র‍্যাফার্টির মুখে কোনও কথা সরল না। কোনওরকমে মাথাটা নীচু করে অভিবাদন জানাল সে। আগন্তুকেরাও মাথার অ্যান্টেনা বেঁকিয়ে পাল্টা অভিবাদন জানাল তাকে। মহিলাটি তার নিজের পাশের জায়গাটায় বাঁ হাত দিয়ে আঁচড় কাটল। বোঝা গেল ওখানে সে র‍্যাফার্টিকে বসতে বলছে।

মনে মনে নিজেকেই শোনাল র‍্যাফার্টি, 'এটা একটা চালাকি। নির্ঘাত চালাকি। এখন, র‍্যাফার্টি, তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক। নিজেকে ওদের সাথে জড়িয়ে ফেলো না। সাবধান, র‍্যাফার্টি, সাবধান!'

সে ঘুরে মিসেস এসপের পাশে চলে এল। তারপর প্রচণ্ড চেষ্টায় গলা না কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের আপনি কী নামে ডাকেন, মিসেস এসপ?'

'আসলে আমি ওদের নাম জানি না,' সে বলল। 'ওরা শুধু আপনার জন্যে একটা ছবি তৈরি করতে পারে। ওই যে মাথার ওপর শিং-এর মত জিনিসগুলো আছে না, আপনি যা জানতে চান সে সম্পর্কে ওগুলো একটা চিন্তা-ভাবনার সৃষ্টি করে। ওরা যেটা ভাবে সেটা আপনি দেখতে পাবেন বা সেটা আপনিও চিন্তা

করবেন। যেমন আমি প্রথমে ওদের নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওরা এ ব্যাপারে চিন্তা করল আবার আমার মাথাতেও সেই চিন্তাটা দিল, তখন আমি দেখলাম একটা লোক হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটাচ্ছে। তাই আন্দাজ করে নিলাম "লোহা পেটানো মানুষ" বা এই জাতীয় কোনও নাম ওদের। রেডইণ্ডিয়ানদের নামের মত মনে হয়, তাই না?'

র‍্যাফার্টি একবার লোহা পেটানো মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস এসপের দিকে ফিরল। 'আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন ওরা আমার সাথে কথা বলবে? মানে ওই রকম চিন্তা দিতে রাজি হবে?'

মিসেস এসপ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে তাকাল। 'আমি নিশ্চিত, ওরা আনন্দের সাথেই রাজি হবে। কিন্তু প্রথমে বেশ খানিকটা কঠিন মনে হবে।'

'তবু আমি চেষ্টা করে দেখব,' বলতে বলতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেট বের করে আনল র‍্যাফার্টি। দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল কিন্তু জ্বলন্ত কাঠিটা কোথায় ফেলবে ভেবে পেল না।

'কয়লার বালতিটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলুন,' মি. এসপ বলল। তাই করল র‍্যাফার্টি।

'এই অদ্ভুত, মানে আশ্চর্য, ইয়ে এই লোকদের জিজ্ঞেস করুন তো ওরা কোন্ জায়গা থেকে এসেছে?'

মিসেস এসপ মৃদু হাসল। 'আমি ওদের এটা আরেকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম,' সে বলল। 'কিন্তু পরিষ্কার কোনও ছবি বা ধারণা পাইনি। তবে আপনার জন্যে বোধহয় আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।'

মিসেস এসপ তার আঙুল উঁচু করে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকেরা তাদের অ্যান্টেনা তার দিকে নীচু করে ধরল।

'এই ভদ্রলোক,' মিসেস এসপ চেঁচিয়ে বলল, 'জানতে চান তোমরা কোন্ জায়গা থেকে এসেছ?'

'কোনও উত্তর চাইলে আপনি নিজের আঙুলটা উঁচু করে ধরুন।' র‍্যাফার্টিকে কনুইয়ের মৃদু খোঁচা দিয়ে বলল মি. এসপ।

পুরো ব্যাপারটাই খামোকা বোকামি মনে হলো র‍্যাফার্টির। তবুও সে আঙুলটা উঁচু করে ধরল নির্দেশ মত। আগন্তুক মহিলার মাথার অ্যান্টেনাগুলো নীচু হয়ে নেমে আসল র‍্যাফার্টির কপালে, সোজাসুজি দুই চোখের মাঝখানে। তখনই হঠাৎ ঘটল ব্যাপারটা। র‍্যাফার্টির মনে হলো, ওর মাথাটা যেন রাবারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে এবং কেউ একজন সেটা প্রচণ্ড জোরে পাকাচ্ছে, পিটাচ্ছে নতুন কোনও আকৃতি দেয়ার জন্যে। ভয় পেল সে। প্রচণ্ড ভয়। এবং তারপরই তার মনে হলো, সে যেন উড়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে একটা বিরাট উজ্জ্বল সাদা শূন্যতার মাঝখান দিয়ে। তার চারপাশে তারারা মিটমিট করছে, উল্কারা ঝলসাচ্ছে। এর বেশ খানিকক্ষণ পরে সে দেখতে পেল, একটা ভীষণ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত বিরাট এক তারা। কিছুক্ষণ পরই মিলিয়ে গেল ছবিটা। র‍্যাফার্টি দেখতে পেল তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে এবং এতটাই দুর্বল বোধ করল যে মনে হলো দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও তার নেই। তার হাতের সিগারেটটা গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝেতে। মি. এসপ নীচু হয়ে সেটা তুলে নিল।

'আপনি সিগারেটটা ফেলে দিয়েছিলেন, মি. র‍্যাফার্টি, এই নিন। তা আপনার প্রশ্নের উত্তর পেলেন?'

র‍্যাফার্টির মুখ সাদা কাগজের মত ফ্যাকাসে। 'মি. এসপ,' সে প্রায় কান্নার সুরে বলে উঠল, 'মিসেস এসপ, এটা কোনও চালাকি না! পুরোপুরি সত্যি। এরা সত্যিই অন্য কোনও গ্রহ থেকে এসেছে!'

মি. এসপ শান্ত স্বরে বলল, 'নিশ্চয়ই। ওরা খুব দূরের পথ

পাড়ি দিয়ে এসেছে।'

'আপনি জানেন, এর অর্থটা কী?' যতটা সম্ভব চাপা স্বরে প্রশ্ন করল উত্তেজিত র‍্যাফার্টি। পৃথিবীর ইতিহাসে এই জাতীয় ঘটনা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা জানেন আপনি? আপনি জানেন এটা...এটা, হ্যাঁ, এটা একটা কেমন যুগান্তকারী ঘটনা? কেমন দারুণ একটা গল্প? বুঝতে পেরেছেন কিছু?' এখন সে চিৎকার করছে। 'আপনাদের ফোনটা কোথায়?'

'আমাদের তো টেলিফোন নেই,' জবাব দিল মি. এসপ। 'এই গ্রামে শুধু পেট্রল স্টেশনে একটা টেলিফোন আছে। কিন্তু মি. র‍্যাফার্টি, কিছুক্ষণ পর চলে যাবে ওরা। আপনি আরও কিছুক্ষণ থেকে ওদের বিদায় জানাবেন না? মুরগির ডিম, ডিম ফোটানোর যন্ত্র, খাবারদাবার সবই তো ওদের জাহাজে তোলা হয়ে গেছে।'

'না!' চিৎকার করে উঠল র‍্যাফার্টি। 'এখুনি ওদের যেতে দেয়া যাবে না। আমার একটা ফোন দরকার! আমার একজন ফটোগ্রাফার দরকার।'

মৃদু হাসলেন মিসেস এসপ। 'মি. র‍্যাফার্টি,' সে বলল, 'আমরা চেষ্টা করেছিলাম রাতের খাবারের সময় পর্যন্ত ওদের আটকে রাখতে, কিন্তু ওরা একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে এসেছে, জোয়ার ভাটা কিংবা ওই জাতীয় কোনও বিশেষ সময়ে ওরা ঠিকই চলে যাবে।'

'উঁহুঁ, জোয়ার ভাটা না,' মি. এসপ বললেন। 'চাঁদের সাথে ওদের যাওয়া-আসার একটা সম্পর্ক আছে। চাঁদটা কোথায় থাকে সেটাই আসল।'

মহাকাশের আগন্তুকেরা হাতগুলো কোলের ওপর রেখে শান্ত ভাবে বসে রইল নিজেদের জায়গায়। মাথার লম্বা অ্যান্টেনাগুলো নাড়াচাড়া করছিল আপন মনেই। বোঝা গেল অন্য কারও চিন্তা-ভাবনা তারা শুনছে না।

হিংস্রভাবে ঘরের চারদিকে দৃষ্টি মিলিয়ে নিল র‍্যাফার্টি। নাহ্, কোনও টেলিফোনের চিহ্নও নেই এখানে। কিন্তু, ব্যাপারটা আমার সম্পাদককে জানান দরকার! মনে মনে ভাবল র‍্যাফার্টি। হয় তিনিই নির্দেশ দেবেন কী করা উচিত, নয়তো তিনি ধরেই নেবেন পাগল হয়ে গেছি আমি। কী করবে কিছুই ভেবে পেল না র‍্যাফার্টি। কিছু একটা করো! মাথার ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করল সে। এটা একটা অসাধারণ বিরাট খবর, অথচ তুমি কিছু না করেই দাঁড়িয়ে আছ।

'এই যে এসপ, শুনুন তো!' চিৎকার করে ডাকল র‍্যাফার্টি। 'আপনার কাছে কি কোনও ক্যামেরা আছে? যে কোনও ধরনের ক্যামেরা হলেই চলবে, আছে?'

'ওহ্, অবশ্যই,' এসপ জবাব দিল। 'আমার একটা চমৎকার বক্স ক্যামেরা আছে। পুরানো হলে কী হবে, দারুণ ছবি তোলে। আমার মুরগির ছানাগুলোর কয়েকটা ছবি তুলেছি, আপনাকে দেখাচ্ছি, একটু দাঁড়ান।'

'না-না! আমি ছবি দেখতে চাচ্ছি না, শুধু ক্যামেরাটা চাচ্ছি,' তাড়াতাড়ি বলল র‍্যাফার্টি।

মাথা ঝাঁকিয়ে পাশের রুমে ঢুকল বুড়ো ক্যামেরাটা খুঁজে বের করতে।

'মিসেস এসপ,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল র‍্যাফার্টি। 'ওদের আমার অনেক প্রশ্ন করার আছে।'

'বেশ তো, জিজ্ঞেস করুন,' আনন্দের সাথেই বলল সে। 'ওরা কিছুই মনে করবে না।'

কিন্তু জিজ্ঞেস করতে গিয়ে কোনও প্রশ্নই খুঁজে পেল না র‍্যাফার্টি। কী জানতে চাইবে সে? ওদের নাম সে জানে, কেন তারা এসেছে তাও জানে, কোথা থেকে এসেছে সেটাও জানে...

পাশের ঘর থেকে মি. এসপের গলার স্বর শোনা গেল,

'ইথেল, তুমি কি আমার ক্যামেরাটা দেখেছ?'

'না, দেখিনি,' তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিল মিসেস এসপ। 'ওটা তো তুমি নিজেই কোথায় যেন রেখেছিলে।'

'তাই তো। মনে করতে পারছি না।'

ওদিকে গ্রহান্তরের আগন্তুকেরা নড়েচড়ে উঠল এবার। তারপর দু'জন দু'জনের অ্যান্টেনার মাথা ঘুরিয়ে অন্যটার সাথে লাগিয়ে দিল। বোঝা গেল তারা কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ব্যাপারটা লক্ষ করে চট করে দাঁড়িয়ে পড়ল র‍্যাফার্টি। শালাদের মতলবটা কী? ভাগবে নাকি? জাপটে ধরব? ততক্ষণে সোফা ছেড়ে একই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে অদ্ভুত দম্পতি। এবং পরমুহূর্তেই জোনাকির মত উড়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে, সোজা গোলাবাড়ির দিকে।

দৌড়ে বেরিয়ে এল র‍্যাফার্টি, ওদের পেছন পেছন। আকাশের দিকে দু'হাত তুলে তখন রীতিমত চিৎকার করছে সে, 'প্লীজ, যেয়ো না তোমরা! থামো, থামো!'

কে শোনে কার কথা? অর্ধেক পথ আসতে না আসতেই বিরাট প্লাস্টিক বেলুনটাকে গোলাবাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। চারপাশে একটা মৃদু অথচ ভয়ঙ্কর হিস হিস শব্দ তুলে মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল বেলুনটা।

আকাশের দিকে চোখ তুলে অনেকক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল র‍্যাফার্টি। তারপর ধপাস করে বসে পড়ল কাদামাখা উঠনে। দারুণ চমৎকার খবরটা এখন উড়ে গেছে আকাশে, অথচ তার কাছে নেই কোনও ছবি, নেই কোনও প্রমাণ। এসব না দেখে কে বিশ্বাস করতে চাইবে এমন ঘটনা ঘটেছে? কে বুঝতে চাইবে এই লোক যে কিনা লোহা পেটায় (এর মানে নিশ্চয়ই ধাতু-শিল্পী বা কামার-টামার হবে) আর তার স্ত্রী এই রোববারে আলফ্রেড এসপের খামার বাড়িতে এসেছিল, তারপর সেই সন্ধ্যাতেই এক ঝুড়ি ডিম নিয়ে ফিরে গেছে মহাশূন্যে তাদের বাড়িতে।

র‍্যাফার্টির মাথা পরিষ্কার হতে শুরু করল আস্তে আস্তে। একটু পরই উঠে দাঁড়াল সে, তারপর প্রায় দৌড়ে ঢুকল বাড়ির ভেতর। 'এসপ!' চিৎকার করে ডাকল সে। 'আপনার মুরগির ডিমগুলোর জন্যে ওরা কোনও দাম দেয়নি?'

'হ্যাঁ, দিয়েছে তো,' বিরাট বড় আলমারিটার ডালা খুলে সব জিনিস নামাতে নামাতে জবাব দিল মি. এসপ। সে তার ক্যামেরাটা খুঁজছে।

'টাকাগুলো দেখান তো আমাকে,' তাড়াতাড়ি বলল র‍্যাফার্টি।

'আরে না। ওরা কোনও টাকা দেয়নি। ওদের কাছে কোনও টাকা পয়সাই নেই। ওই ছয় বছর আগে আমাদের ডিমগুলোর বদলে ওদের দেশের কয়েকটা ডিম দিয়ে গিয়েছিল।

'ছয় বছর আগে!' হতাশ শোনাল র‍্যাফার্টির গলা। তারপর হঠাৎ করেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল সে। 'ডিম! কী ধরনের ডিম?'

হাসল এসপ। 'ধরনটা বেশ অদ্ভুত। আমরা ওগুলোকে তারা-ডিম বলে ডাকতাম। ডিমগুলো দেখতে ছিল তারার মত পাঁচ কোনা। অনেক কষ্টে, আমাদের একটা বুড়ি মুরগি ছিল, সব সময় কুঁচে বসে থাকত, সেইটাকে দিয়ে ফুটিয়েছিলাম। মুরগিটা বসতেই চাইত না, ভয় পেত, ওই ধারাল কোণাগুলোর জন্য।'

আলমারি বন্ধ করে এবার তাকের ওপর দেখতে দেখতে বলল এসপ। 'আসলে তারা-হাঁসগুলো তেমন ভাল কিছু ছিল না। দেখতে অনেকটা ছোটখাট জলহস্তীর মত, সাইজে দোয়েল পাখির চেয়ে সামান্য বড়। আবার কী, জানেন? ঠ্যাং ছিল ছয়টা। এদের মধ্যে দুইটা মাত্র বেঁচেছিল, ক্রিসমাসের সময় আমরা ওগুলো খেয়ে ফেলি।'

র‍্যাফার্টির মাথা কাজ করছিল খুবই অস্থির ভাবে। সে শুধু মাত্র এমন একটা জিনিস, এমন একটা প্রমাণ খুঁজছিল যা সে সম্পাদককে দেখাতে পারবে এবং পুরো পৃথিবী যা দেখে বিশ্বাস

করবে ঘটনাটা সত্যি। র‍্যাফার্টি মি. এসপের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনি জানেন না, তারা-হাঁসগুলোর কঙ্কাল কোথায় আছে? জানেন?'

ঘাবড়ে গিয়ে তাকাল এসপ। 'কঙ্কাল? ওহ্ আপনি হাড্ডি-গুড্ডির কথা বলছেন? ওগুলো তো আমাদের কুকুরটাকে খেতে দিয়েছিলাম, সেও প্রায় পাঁচ বছর আগে, কুকুরটা অবশ্য মারা গেছে, তা প্রায় চার বছর হলো।'

স্বপ্নাচ্ছন্ন লোকের মত হ্যাটটা কুড়িয়ে নিল র‍্যাফার্টি। 'ধন্যবাদ, মি. এসপ,' ক্লান্তসুরে বলল সে। 'ধন্যবাদ।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে হ্যাটটা মাথায় দিল র‍্যাফার্টি। একটু পরই সেটা ঠেলে দিল মাথার পেছন দিকে। এবার উঠনে নেমে এল সে। তারপর একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল দূরের মেঘলা আকাশ এবং কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারল আকাশটা ঘুরছে, পৃথিবীটা ঘুরছে, সেই সাথে ঘুরছে ওর মাথাটাও।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মি. এসপ। হাতে কালো একটা বাক্স। ধুলোয় ভরা। নিজের শার্টের হাতা দিয়েই ওটার ধুলো ঝাড়তে ব্যস্ত তিনি।

'মি. র‍্যাফার্টি,' বলল সে। 'আমার ক্যামেরাটা খুঁজে পেয়েছি।'

মূলঃ বিল ব্রাউন

রূপান্তরঃ শাহ্নাজ হোসনে আরা

স্বপ্ন

ডেভিড রাসমুনসেন প্রচুর টাকার মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। উত্তরের গল্প লোক মুখে অনেক শুনেছে সে। ঘটে বুদ্ধি থাকলে ওখানে যে কারও পক্ষে টাকা কামাই করা কোনও ব্যাপার নয়। বহুলোক কাজ করছে উত্তরে এবং তারা দেশি জিনিস পেতে চায়। স্বর্ণসন্ধানীদের কাছে সবচেয়ে বেশি চাহিদা যেগুলোর তার একটা হচ্ছে ডিম।

ডেভিড রাসমুনসেন আশপাশের দোকান থেকে, পনেরো সেণ্টে এক ডজন ডিম চাইলেই কিনতে পারে। কিন্তু সুদূর উত্তরের ডসন শহরে, এই ডিমই এক ডজন পাঁচ ডলারে বিকোবে। শুধু উত্তরে ডিম নিয়ে যাওয়ার ঝক্কিটুকুই যা। ওখানে এক হাজার ডজন ডিম বেচে পাঁচ হাজার ডলার কামিয়ে নিতে পারে সে। আসতে-যেতে ওর খরচ পড়বে সাড়ে আটশো ডলার বা তার কিছু বেশি। পুরো চার হাজার ডলার পকেটে পুরে ফিরবে সে বাড়ি। পরিকল্পনাটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে খুশি হয়ে উঠল ডেভিড রাসমুনসেন।

'আমি পারব, আলমা!' স্ত্রীকে বলল সে। টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে বসেছে ওরা। 'ডাইয়া যেতে লাগবে পঞ্চাশ ডলার। ওখানে কয়েকটা ইণ্ডিয়ানকে ভাড়া করলে ওরা ডিম পৌঁছে দেবে লেক লিণ্ডারম্যানে। তাতে লাগবে ধরো দুশো ডলার। লেক লিণ্ডারম্যানে তিনশো ডলার দিয়ে একটা নৌকা কিনব। কিছু যাত্রী

পার করে দিলে নৌকার দামটা উঠে যাবে। নৌকা ডসনে পৌঁছলে ডিম বেচে বাদবাকি টাকা তুলে নেব!'

স্বামীর পরিকল্পনায় খুব একটা ভরসা পেল না আলমা। কিন্তু বাধা দিয়ে কাজ হবে না জানে সে। তার স্বামী উত্তরে ডিম নিয়ে যাবেই যাবে।

'ফিরতে ধরো দু'মাসের মত লাগবে,' বলল ডেভিড রাসমুনসেন। 'দু'মাসে চার হাজার ডলার বানিয়ে ফেলব! এখন তো কামাচ্ছি মাসে একশো ডলার করে। এই দিন থাকবে না দেখে নিয়ো।'

ব্যাঙ্ক থেকে এক হাজার ডলার ধার নিল সে। তারপর ডিমের আড়ত থেকে এক হাজার ডজন ডিম কিনল। এবার যাত্রার পালা। স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ডিমসহ সান ফ্র্যান্সিসকো ত্যাগী এক নৌকায় উঠে বসল। যাত্রা মোটেও সুখকর হলো না। অশান্ত সাগর বড্ড জ্বালাল। গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ ডাইয়া পৌঁছল ডেভিড।

স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের সাথে, লেক লিণ্ডারম্যানে ডিম বয়ে দেয়ার বিষয়ে কথাবার্তা বলল সে। জায়গাটা এখান থেকে আটাশ মাইল। ইণ্ডিয়ানরা দর হাঁকল পাউণ্ড প্রতি পঞ্চাশ সেণ্ট। ডেভিড ভেবেছিল বড়জোর বারো সেণ্ট চাইবে। রাগ উঠে গেল ওর। কিন্তু উপায় কী। সুদূর ডাইয়াতে, এক হাজার ডজন ডিম নিয়ে কী বসে বসে তা দেবে সে? লেক লিণ্ডারম্যানে ডিমের চালান নিয়ে যেতেই হবে তাকে। অগত্যা রাজি হতে হলো।

ইণ্ডিয়ানরা লেক লিণ্ডারম্যানে ডিম পৌঁছে দিল। লেকের কাছেই নৌকা নির্মাতাদের তাঁবু। লোকগুলো কাজে খুব ব্যস্ত, লক্ষ করল ডেভিড। এর কারণ শরৎ এসে গেছে। এরপর আসবে শীত। হ্রদ-নদী সব জমে বরফ হয়ে যাবে। শীত আসার আগেই নৌকা বেচতে হবে এদের। চোরাগোপ্তা কামড় এখনই টের

পাওয়া যায়।

টাকায় টান পড়েছে ওর, কিন্তু কিছু যাত্রী পাওয়া গেল ওপারে যেতে চায়। তাদের টাকা দিয়ে নৌকা কিনল ও।

ডেভিড রাসমুনসেন তার ডিম আর যাত্রীদের নৌকায় চাপিয়ে ডাইয়া ত্যাগ করল। ভয়ানক ঠাণ্ডা । বাতাসের ঝাপটায় হিম পানি উঠে আসে নৌকায়। তারপর ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যায়। তার সঙ্গে রয়েছে উথাল পাথাল ঢেউ। ডিম টেকে কিনা সন্দেহ হচ্ছে ডেভিডের। কিন্তু একটা সময়, মন খুশি হয়ে উঠল ওর। ডিম ভাঙেনি যখন, আশা করছে ভাঙবেও না। ফলে শীতের অত্যাচার হাসি মুখে মেনে নিল ও।

লেকটা পঁচিশ মাইল চওড়া। আড়াআড়ি বিশ মাইল পাড়ি দিয়েছে, এসময় পানিতে বরফ দেখতে পেল। শেষ পাঁচ মাইলের যাত্রা নৌকার আরোহীদের দফারফা করে ছাড়ল। বরফ, বাতাস আর পানি বারবার আছড়ে পড়ছে ছোট নৌকাটার ওপর। শেষমেশ হ্রদ পাড়ি দেয়া গেল। ডেভিড রাসমুনসেনের দেহ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। এমনি সময় এল দুঃসংবাদটা।

ডসনে যাওয়ার নদীপথ জমে গেছে। মনটা দমে গেল ডেভিডের। ডিম নিয়ে এখন যাবে কী করে সে? পায়ে হাঁটা ছাড়া গতি নেই। শহরের এক ব্যাঙ্কে গিয়ে ঢুঁ মারল ও। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে অনুনয়-বিনয় করে বোঝাল, ডসনে চড়া দামে বিকোবে ওর ডিম–কিছু ঋণ পেলে বড় উপকার হয়। মন গলল ম্যানেজারের। পনেরোশো ডলার ধার দিল ডেভিডকে, অবশ্য সান ফ্র্যান্সিসকোয় তার বসত বাড়ি বন্ধক রাখার বিনিময়ে।

দু'সপ্তা বাদে ডসনের উদ্দেশে রওনা হলো ডেভিড। তিনটে স্লেজ নিয়েছে, পাঁচটা করে কুকুরে টানছে প্রতিটা। একটা সে নিজে চালাচ্ছে। অপর দুটো সামলাচ্ছে দুই ইণ্ডিয়ান। ডিমগুলোর দিকে বারবার চোখ চলে যাচ্ছে ডেভিডের। ভাঙেনি। হাসি ফুটছে

নিজের অজান্তে। হ্যাঁ, কিছু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে বটে, কিন্তু সাধের ডিম তো তার নিরাপদ আছে।

বিশ্রী ধকল গেল ভ্রমণে। উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে খুবই সীমিত জ্ঞান ডেভিডের। ইণ্ডিয়ান দু'জন এজন্যে রেগে অস্থির। এসব এলাকায় চলাচলের নিয়ম-কানুন তারা বোঝাতে চেষ্টা করেছে ডেভিডকে। কিন্তু সে কানে তোলেনি। তার কেবল এক কথা, ডসনে যথাসম্ভব দ্রুত পৌঁছনো চাই। কুকুরগুলোর জানের ওপর দিয়ে উঠে গেল। ভারী ডিমের বোঝা টানছে জানোয়ারগুলো, তাদের বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু ডেভিড নাছোড়বান্দা।

একদিন বরফে দেবে গেল ওর পায়ের পাতা। আলামতটা ঠিকই টের পেল ইণ্ডিয়ানরা। ওকে থামাতে চেষ্টা করল তারা, আগুন জ্বেলে ওর জুতো-মোজা শুকোতে বলল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ছোটার নেশায় পেয়েছে ডেভিডকে। ক'ঘণ্টা পর এর খেসারত দিতে হলো। পায়ে আর সাড় পায় না। জমে শক্ত হয়ে গেছে। পা-টা পরখ করে, কম্বলে মুড়ে নিল ও। তারপর আবার অবিরাম পথ চলা।

এমন আজব লোক ইণ্ডিয়ানরা কোনওদিন দেখেনি। এত খাটতেও পারে মানুষ! তারা উত্তরাঞ্চলের লোক, তাদেরই তো লবেজান দশা। বিশ্রাম ছাড়া এখন আর কিছু ভাবতে পারছে না ওরা।

ক'দিন পর থেকে, একটার পর একটা মরতে শুরু করল কুকুরগুলো। স্লেজ তিনটেই রইল, কিন্তু কুকুর গেল কমে। অবলা জানোয়ারগুলোর ওপর খাটুনির চাপ বেড়ে গেল আরও।

এরপর একদিন এক ইণ্ডিয়ান পড়ে গেল হিমশীতল নদীতে। তার দেহ তলিয়ে গেল বরফ-ভাসা পানির নীচে। সে রাতে দ্বিতীয় ইণ্ডিয়ানটা পিঠটান দিল। ডেভিড এবার একদম একা হয়ে পড়ল।

স্লেজ তিনটেকে এক করে এগিয়ে চলল সে। শরীরের অবস্থা কাহিল তার। দু'পায়ের পাতা জমে গেছে, কালসিটে পড়ে অসাড় প্রায়। বরফের কামড়ে গাল-নাক কালো হয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্রামের ধার ধারল না সে, নিজের দিকে খেয়াল দিল না। ডসনে গিয়ে ডিম বেচা এমুহূর্তে তার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য।

পথে একদিন, ডসন থেকে আগত কিছু লোকের সাথে ওর দেখা হলো। ডসনে খাবারের ঘাটতির কথা তাকে বলল ওরা। সঙ্গে ডিম আছে জেনে আশ্বাস দিল, ওখানে প্রতিটি ডিম এক ডলারে বেচতে পারবে ডেভিড।

'বারো হাজার ডলার,' মনে মনে বলল ডেভিড। বারবার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল নিজেকে। শরীর দুর্বল-ক্লান্ত তাতে কী, মনে ফুর্তি ধরে না তার। শীঘ্রিই ব্যবসা করে প্রচুর টাকা কামিয়ে নেবে সে।

ডসনের দিকে কাছিয়ে আসতে, মারা পড়ল আরও গোটা কয় কুকুর। শেষ ক'মাইল তিনটে স্লেজ টানতে হলো বাকি জানোয়ারগুলোকে। অবশেষে ডসনে এসে পৌঁছতে পারল সে।

'এই, তোমার স্লেজে কী?' শহরের এক স্বর্ণসন্ধানী জানতে চাইল।

'ডিম,' কোনওমতে বলল ডেভিড। অসহ্য ঠাণ্ডায় সারা মুখে তীব্র যন্ত্রণা। কথা আসতে চায় না।

'ডিম!' সোৎসাহে চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা। 'বাহ! এখানে বহু দিন পর ডিমের দেখা মিলল।' সুখবরটা অন্যদের জানাতে গেল সে। ডসনের বাসিন্দাদের কাছে ডিমের বিপুল চাহিদা।

শীঘ্রিই ভিড় জমে গেল ডেভিডের স্লেজের চারপাশে।

'কত করে তোমার ডিম?' প্রশ্ন করল একজন।

'একেকটা দেড় ডলার।'

'এক ডজন দাও, বলল লোকটা।

'আমাকেও এক ডজন দাও দেখি,' আরেকজন বলল।

খুশির সীমা রইল না ডেভিডের। তার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। জীবনে আজকের মত সুখের দিন আর আসেনি।

কিন্তু ক'ডজন ডিম বেচতে না বেচতেই অসুস্থ হয়ে পড়ল ও। মাথায় ভয়ানক ব্যথা। গোটা দেহ কাঁপছে থরথর করে। 'বেচারার বিশ্রাম দরকার,' ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল।

'একটা ফাঁকা বাড়ি আছে, তুমি ওখানে বিশ্রাম নিতে পারো,' বলল আরেকজন। 'আগে একটু সুস্থ হয়ে নাও, তারপর ডিম বেচো।' অন্যান্যরাও গলা মেলাল তার সঙ্গে।

শহরের উপকণ্ঠে, সেই বাড়িতে ডিম সহ ডেভিড রাসমুনসেনকে তুলে দিল সহৃদয় লোকগুলো।

সাংঘাতিক ক্লান্ত ও। চোখ বুজে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। কী সৌভাগ্য তার, শীঘ্রিই লালে লাল হয়ে যাবে–ভাবছে মনে মনে। মাথায় ঘুরছে আলমার জন্যে কী কী কিনে নিয়ে যাবে সে সব চিন্তা। খুশিতে ভরে উঠছে বুক।

একটা সময় ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত-অবসন্ন মানুষটা।

ঘণ্টা খানেক কেটেছে, এমনি সময় টোকা পড়ল দরজায়।

ঘরে এসে ঢুকল ডেভিডের প্রথম ক্রেতা।

'কী ডিম দিয়েছ?' বলে উঠল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে।

'কেন, কী হয়েছে?' ভয়ে ভয়ে বলে ডেভিড

'কী হয়েছে? তোমার সব ডিম পচা!'.

'কী বলছ?' আতঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করে ডেভিড।

'ঠিকই বলছি। তোমার সবকটা ডিম জঘন্য–পচা–বাজে!' গর্জায় লোকটা।

'আ-আমার ডিম পচা!' ভীত আর বেদনাহত দেখায় ডেভিডকে

ওর নাকের নীচে ডিমগুলো তুলে ধরে লোকটা। পচা দুর্গন্ধ। লোকটার কথায় ভুল নেই।

'আমার টাকা ফেরত দাও,' বলে লোকটা।

টাকা গুনে দিয়ে লোকটাকে বিদেয় করল ডেভিড রাসমুনসেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বসে রইল, গাদা করে রাখা ডিমের বাক্সের দিকে চেয়ে। এক সময় ছুরি হাতে চলে এল বাক্সগুলোর কাছে।

প্রথম বাক্সটা ছুরি দিয়ে কেটে খুলল ও। ভেতর থেকে একটা ডিম তুলে নিয়ে কাটল ওটাকে। কালচে-সবুজ কুসুমটা। পচা। এবার অপর এক বাক্স থেকে আরেকটা ডিম পরখ করল। এটাও পচে গেছে। এরপর আরেকটা ডিম পরীক্ষা করল, তারপর আরও একটা। এভাবে চলতে লাগল, যতক্ষণ না সব কটা বাক্স দেখা হলো।

লোকটা ঠিকই বলেছিল। ডিমগুলো নষ্ট। যাচ্ছেতাই রকমের পচা।

ডেভিড রাসমুনসেন ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল। তারপর বাচ্চাদের মত কাঁদতে লাগল ভেউ ভেউ করে। ওর সব টাকা পানিতে গেছে। ব্যাঙ্ক কেড়ে নেবে বাড়িটা। কোন্ মুখে আলমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে সে?

এত কষ্ট, এত দুর্ভোগ মুখ বুজে সহ্য করার এই কি পরিণতি? হৃদয়টা ভেঙে খানখান হয়ে গেছে ওর।

উঠে দাঁড়াল ডেভিড। একপ্রস্থ দড়ি নিয়ে একটা খুঁটির গায়ে ছুঁড়ে দিল। ছাদে আড়াআড়ি এক কাঠের টুকরো খুঁটিটা। এবার একটা চেয়ারে সটান দাঁড়িয়ে দড়ির ফাঁসটা গলায় পরে নিল। মুহূর্তের জন্যে আলমার কথা মনে পড়ল ওর। কিন্তু পরক্ষণে চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিল সে। মারা গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

বেশ ক'ঘণ্টা পরে, ওর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলো। এক লোক ওর লাশ দেখে শহরে গেল সবাইকে জানাতে। 'ডিমঅলা আত্মহত্যা করেছে,' বলল সে। 'লোকটা বোকার হদ্দ। কয়টা পচা ডিমের জন্যে কেউ নিজের জান দেয় এভাবে?'

মূল: জ্যাক লণ্ডন
রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

গয়না

মিস রবিনসন গরিব ঘরের মেয়ে। ওর বাবা মারা গেলেন কপর্দকশূন্য অবস্থায়। ফলে মিসেস লিভিংস্টোনের বাড়িতে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে হলো তাকে। ধনী ভদ্রমহিলার তরুণী দুই মেয়ে, তাদের পড়াতে হবে মিস রবিনসনকে। মোদ্দা কথা, মেয়ে দুটির গৃহশিক্ষিকা তথা গভর্নেসের চাকরি।

মিসেস লিভিংস্টোনের বাড়িতে চাকরানীর মত বাস করে সে। তবে মিস রবিনসন বুদ্ধিমতী আর সুশিক্ষিতা মেয়ে। কখনও সখনও বাসায় মেহমান এলে, তাদের সাথে ডিনারে বসার ডাক পড়ে তার।

এক সন্ধেয়, মিসেস লিভিংস্টোন কিছু বন্ধু বান্ধবকে দাওয়াত দিলেন। আসার কথা চোদ্দজনের, কিন্তু শেষ মুহূর্তে একজন অপারগতা জানালেন। এর ফলে মেহমানের সংখ্যা দাঁড়াল তেরো—অশুভ সংখ্যা। অগত্যা মিস রবিনসনকে ডিনারে যোগ দেয়ার জন্যে ডাক পড়ল।

আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রত্যেকেই ধনী আর উঁচু শ্রেণীর মানুষ। তাদের মাঝে চুপটি করে বসে রইল মিস রবিনসন। মিসেস লিভিংস্টোনের বাতিল করা এক ড্রেস তার পরনে, তবে ওতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। গলায় একখানা মুক্তোর হারও ঝুলিয়েছে সে।

অতিথিদের একজন কাউন্ট বয়সেলি—যেমন বড়লোক তেমনি

খ্যাতনামা। মুক্তো, হীরে সহ যে কোনও মূল্যবান পাথর সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান তাঁর।

পার্টিতে মিস লিনগেট নামে এক যুবতী অতিথি এসেছেন। তাঁর গলাতেও চমৎকার এক মুক্তোর মালা শোভা পাচ্ছে। সগর্বে কাউন্ট বরসেলিকে জিনিসটা দেখালেন তিনি।

'বাহ্,' বললেন কাউন্ট, 'বেশ সুন্দর তো মুক্তোগুলো।'

মিস লিনগেট খুশি হতে পারলেন না। শুধুই 'বেশ সুন্দর' কথাটি তাঁকে তুষ্ট করতে পারেনি। কাউন্টের মুখ থেকে হরেক রকম বিশ্লেষণ শুনতে আগ্রহী ছিলেন বেচারী।

'এর দাম আট হাজার পাউণ্ড,' বললেন ভদ্রমহিলা।

'হ্যাঁ, দাম ঠিকই নিয়েছে,' বললেন কাউন্ট বরসেলি। তাঁর দায়সারা ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল, আট হাজার পাউণ্ড বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি তাঁর মনে।

কাউন্ট বরসেলি হঠাৎ মিস রবিনসনের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'ওটা হচ্ছে পয়সার মাল,' খোলা গলায় স্বীকার করলেন।

'মিস রবিনসনের মুক্তোর কথা বলছেন?' মিস লিনগেট চোখ কপালে তুললেন। 'উনি তো মিসেস লিভিংস্টোনের গভর্নেস!'

মিস লিনগেট এ মুহূর্তে খেপে আগুন। সামান্য এক গভর্নেস দামি মুক্তোর মালা পরে বসে আছে, বললেই হলো?

'আমরা গভর্নেসদের আলোচনা করছি না,' জবাবে বললেন কাউন্ট। 'আলোচনাটা হচ্ছে মুক্তো নিয়ে। ওঁর মালাটার দাম পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বেশি।'

মিস লিনগেটের মুখখানা দেখার মত হলো। কাউন্টের কথা বিশ্বাস হলো না তাঁর। লোকটা ভুল করছে। গভর্নেসরা বাপের জন্মে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের হার চোখে দেখে, যে পরবে?'

'মিস রবিনসন,' গলা কয়েক পর্দা তুললেন ভদ্রমহিলা। 'আপনি যে এমন মহামূল্যবান একখানা হার পরে বসে আছেন,

নিজে জানেন সে কথা?'

সবার মুখ বন্ধ। মিস রবিনসনের জবাব শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে প্রত্যেকে।

'পনেরো শিলিং দিয়ে কিনেছি এটা,' শান্ত কণ্ঠে জানাল মিস রবিনসন।

হেসে উঠলেন মিস লিনগেট।

'কাউন্ট ভুল করছেন জানতাম আমি,' বললেন। 'হুঁহ! পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বেশি!'

কামরার ভেতর এখন অটুট নীরবতা।

অবশেষে মুখ খুলল মিস রবিনসন।

'এটার দাম পনেরো শিলিং,' বলল। 'কাউণ্টের ভুল হয়েছে।'

'মুক্তো চিনতে কখনোই আমার ভুল হয় না,' ঠাণ্ডা স্বরে বললেন কাউণ্ট। 'এবারও হয়নি।'

এসময় ঘটল অস্বাভাবিক এক ঘটনা। একজন কাজের লোক মিস রবিনসনের চেয়ারের কাছে এসে তাকে গোপনে কী যেন বলল গভর্নেসের মুখের চেহারা মুহূর্তে ছাই বর্ণ হয়ে গেল, ভয়ানক বিস্মিত দেখাচ্ছে তাকে।

'মাফ করবেন, মিসেস লিভিংস্টোন,' বলল সে 'আমাকে একটু উঠতে হচ্ছে। হল-এ দু'জন লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

উঠে চলে গেল ও। এবার অতিথিরা উত্তেজিত কণ্ঠে কথোপকথন আরম্ভ করে দিল

'চুট্রিন! চুট্রিন!' বলে উঠলেন কেউ একজন। 'ওরা বুঝলেন না, পুলিশের লোক। মিস রবিনসন মুক্তোর মালাটা কোত্থেকে চুরি করে এনেছে কে জানে। এখন বুঝবে মজা।'

'আমার বাড়িতে চোর,' চেঁচিয়ে ওঠেন মিসেস লিভিংস্টোন। 'উফ. কী ভয়ানক কথা! এখন কী করি? ও কি চুরি শেখাচ্ছে

আমার মেয়ে দুটোকে?'

সবাই একসাথে কথা বলতে শুরু করলেন। এবার সহসা নিস্তব্ধতা নেমে এল। মিস রবিনসন ফিরে এসেছে কামরায়। খুশি-খুশি দেখাচ্ছে তাকে, চোর বলে মনেই হচ্ছে না।

মিস রবিনসনের গলায় নয়, হাতে এখন হারটা। চেয়ারে বসে পড়ে ওটা কাউন্ট বরসেলির দিকে ঠেলে দিল সে।

'এর দাম কত বলুন তো?' জানতে চাইল।

কয়েক মুহূর্ত মুক্তোগুলো পরীক্ষা করলেন কাউন্ট।

'পনেরো শিলিং,' বললেন।

'ঠিক,' বলল মিস রবিনসন। 'এটা আমার মালাটা। পনেরো শিলিং দাম।'

'কিন্তু আগেরটা গেল কোথায়?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন কাউন্ট বরসেলি। 'এটা তো অন্যটা।'

'গুটিগুলো ভেঙে গেলে ক'দিন আগে দোকানে নিয়ে যাই,' বলল মিস রবিনসন। 'ফেরত আনার সময় মারাত্মক এক ভুল হয়ে যায়। দোকানদার আমাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দামের হারটা দিয়ে বসে।'

সবার মুখে হাসি। মস্ত ভুলই বটে।

'ওরা আসল হারটা ফেরত পেয়ে খুব খুশি,' বলল মিস রবিনসন। 'আমাকে তিনশো পাউণ্ড বকশিশ দিয়ে গেছে।'

আবারও অর্গল খুলে গেল সবকটা মুখের। একজন তুচ্ছ গভর্নেসের জন্যে তিনশো পাউণ্ড তো অনেক টাকা।

মিসেস লিভিংস্টোন এবার হস্তক্ষেপ করলেন।

'টাকাটা দিয়ে কী করবে কিছু ভেবেছ?' জোর গলায় জানতে চাইলেন। কিন্তু তোয়াক্কা করলেন না জবাবের। 'টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়ো। কবে কাজে লেগে যায় কে জানে।'

'না, ব্যাঙ্কে রাখব না,' সদম্ভে ঘোষণা দেয় গভর্নেস। 'জীবনে

বেড়াতে যাওয়ার কপাল হয়নি। এবার যাব। মাসের শেষ নাগাদ দক্ষিণ ফ্রান্সে চলে যাব।'

রাগত চোখে চেয়ে রইলেন ওর দিকে মিসেস লিভিংস্টোন। গভর্নেস আর চাকরানীর তফাৎ কোথায়? কাজের বেটিরা দক্ষিণ ফ্রান্সে ছুটি কাটাতে যায় ইহজন্মে কেউ শুনেছে? তা ছাড়া, চাকর-বাকররা মনিবের পরামর্শ চাইবে এটাই তো স্বাভাবিক।

'যেতে চাও যাও,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন মিসেস লিভিংস্টোন। 'কিন্তু আর ফেরত আসার দরকার নেই। তোমাকে আর প্রয়োজন পড়বে না আমাদের।'

'আমি আর আসবও না,' বলল মিস রবিনসন। তারপর চুপচাপ উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

মাসের শেষাশেষি, দক্ষিণ ফ্রান্সে পাড়ি জমাল মিস রবিনসন। মিসেস লিভিংস্টোন হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতে লাগলেন। কবে গভর্নেসের দুঃসংবাদ আসে সেজন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

এর ছয় মাস পরে, বাসায় আবারও ডিনারের দাওয়াত দিলেন ভদ্রমহিলা।

মিস লিনগেট, কাউন্ট বরসেলি ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবরা এসেছেন। মিস রবিনসনের কথা সবারই মনে আছে। একজন তার প্রসঙ্গ তুলল।

'ও আর কোনওদিন আমার এখানে সুযোগ পাবে না,' চড়া গলায় বললেন মিসেস লিভিংস্টোন।

'তার দরকারও নেই,' বললেন কাউন্ট বরসেলি। 'কেন, খবরটা শোনেননি?'

'কী খবর?'

'আমি ক'দিন আগে দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে ফিরলাম,' বললেন কাউন্ট। 'ওখানে সবার মুখে মুখে ফিরছে মিস রবিনসনের গল্প।

তবে এখন আর ও নামে ডাকা হয় না তাকে। সে এখন কাউন্টেস। হোটেলে এক কাউন্টের সাথে পরিচয় হয় তার, তারপর বিয়ে। বিশাল বড়লোক ওর স্বামী। দু'জনে এখন মহা সুখে প্যারিসে আছে।'

'একটা ভুলের জন্যে ওর কপাল খুলে গেল,' মন্তব্য করলেন মিস লিনগেট। 'ঝুটো এক গয়না রাতারাতি ধনী কাউন্টেস বানিয়ে দিয়েছে ওকে।'

মূলঃ ডব্লিউ সমারসেট মম
রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

তালার জাদুকর

কারাগারের জুতো কারখানায় এসে ঢুকল প্রহরী। জিমি ভ্যালেণ্টাইন ওখানে তখন গভীর মনোযোগে, শুকতলার ওপরাংশ সেলাই করছে। ওকে সদর অফিসে নিয়ে এল প্রহরী। ওয়ার্ডেন জিমির হাতে তুলে দিলেন ক্ষমাপত্র। গভর্নর সেদিন সকালে ওতে সই করেছেন। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ওটা গ্রহণ করল জিমি। চার বছর মেয়াদী সাজার প্রায় দশ মাস শাস্তিভোগ করেছে সে। ও অবশ্য বড়জোর তিন মাস থাকতে হবে আশা করেছিল। বন্ধু-বান্ধব তো কম নেই ওর, ভেবেছিল তারা নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলবে।

'শোনো, ভ্যালেণ্টাইন,' বললেন ওয়ার্ডেন, 'কাল সকালে ছাড়া পাচ্ছ তুমি। এখন থেকে ভাল হয়ে চলার চেষ্টা কোরো। লোক তুমি খারাপ নও। মানুষের আলমারি না ভেঙে সৎ জীবন যাপন করো।'

পরদিন সকাল সোয়া সাতটা, ওয়ার্ডেনের আউটার অফিসে দাঁড়িয়ে জিমি। পরনে তার বেখাপ্পা রেডিমেড পোশাক ও কাঠের মত শক্ত জুতো—খালাসপ্রাপ্ত অতিথিদের জন্যে রাষ্ট্রের উপহার। এক কেরানী ওর হাতে একখানা রেল টিকেট আর একটা পাঁচ ডলারের নোট গুঁজে দিল। আইন আশা করে, এ দিয়ে নিজেকে সে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে এবং উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করবে। এরপর ওয়ার্ডেন ওকে একখানা চুরুট ধরিয়ে দিয়ে হাত ঝাঁকিয়ে দিলেন।

জিমি ওখান থেকে সোজা এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল। ঝলসানো মুরগির মাংস আর এক বোতল সাদা ওয়াইনের আকারে স্বাধীনতার মিষ্টি স্বাদ উপভোগ করল সে–এরপর চুরুট ধরাল, ওয়ার্ডেন যেটা দিয়েছিলেন তার চাইতে এটি এক কাঠি সরেস। এবার মন্থর পায়ে এগোল ডিপোর উদ্দেশে। দরজার পাশে বসা এক অন্ধ লোকের পেতে রাখা হ্যাটে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে, উঠে বসল ট্রেনে। তিন ঘণ্টার রেল ভ্রমণ ওকে নামিয়ে দিল ইলিনয়ের কাছে ছোট্ট এক শহরে। জনৈক মাইক ডোলানের ক্যাফেতে ঢুঁ মারতে গেল ও এবং লোকটির সাথে করমর্দন করল। বারের পেছনে একাই ছিল মাইক।

'কম চেষ্টা করিনি আমরা, জিমি, মি. বয়, বলল সে। 'কিন্তু আরও আগে পারা গেল না। তা আছ কেমন?'

'ভাল,' বলল জিমি। 'আমার চাবিটা আছে না?'

ওপরতলায় ওর কামরাটা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি আছে মেঝেতে ওই তো, বেন প্রাইসের কলারের বোতাম পড়ে রয়েছে। খ্যাতনামা গোয়েন্দাটির শার্ট থেকে খসে পড়ে ওটা, গ্রেপ্তার এড়াতে জিমি যখন ধস্তাধস্তি করছিল।

দেয়াল ঘেঁষা ফোল্ডিং খাটটা টেনে সরিয়ে, একটা প্যানেল হড়কে খুলে ফেলল জিমি, ভেতর থেকে টান মেরে বের করে আনল ধুলো পড়া এক সুটকেস। ওটা খুলে, পরম মমতায় চেয়ে রইল সিঁদ কাটার যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে। বিশেষ ধাতসম্পন্ন ইস্পাত, অত্যাধুনিক মডেলের ড্রিল, পাঞ্চ, ব্রেইস আর বিট, সিঁদকাঠি, সাঁড়াশি ও তুরপুন, কী নেই ওখানে, সঙ্গে আরও আছে জিমির নিজস্ব আবিষ্কৃত অভিনব দু'একখানা যন্ত্র।

আধ ঘণ্টা বাদে, জিমি নীচে নেমে, বেরিয়ে গেল ক্যাফের ভেতর দিয়ে। পরনে ওর ধোপদুরস্ত, রুচিসম্মত পোশাক; আর হাতে ধুলোমুক্ত, পরিষ্কার সুটকেস।

জিমি ভ্যালেন্টাইন মুক্তি পাওয়ার এক হপ্তা পর, রিচমণ্ডে সিঁদ কাটার এক ঘটনা ঘটল। নিখুঁত উপায়ে কেউ একজন আলমারি ভেঙে টাকা গায়েব করে দিয়েছে। কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি, এমনই সুকৌশলে কাজটা সেরেছে। বেশি না, মাত্র আটশো ডলার ছিল ওতে। এর দু'হপ্তা বাদে, লোগানস্পোর্টের এক সুরক্ষিত, অত্যাধুনিক বার্গলার-প্রুফ সিন্দুক থেকে খোয়া গেল দেড় হাজার ডলার। তারপর আবারও ঘটল একই ধরনের ঘটনা। এবার জেফারসন সিটি, মিসৌরীতে। পুরানো ধাঁচের এক ব্যাঙ্কসিন্দুক থেকে চুরি গেল প্রায় পাঁচ হাজার ডলারের ব্যাঙ্ক-নোট। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে, ফলে ডাক পড়ল বেন প্রাইসের মত ঝানু গোয়েন্দার। কাজের ধরন পরীক্ষা করে তিনি বুঝে ফেললেন, অপকর্মগুলো একজনই ঘটাচ্ছে।

'এ আর কিছু না, জিমি ভ্যালেন্টাইনের অটোগ্রাফ,' বললেন তিনি। 'এই দেখুন, ও একটার বেশি দুটো ফুটো করে না। হ্যাঁ, ওকেই আমরা খুঁজছি।' কৌশলী চোরটির পিছে লেগেছেন দুঁদে গোয়েন্দা বেন প্রাইস, ফলে অন্যান্য বার্গলার-প্রুফ সিন্দুকের মালিকেরা এবার খানিকটা স্বস্তি বোধ করলেন।

এক বিকেলে, জিমি ভ্যালেন্টাইনকে সুটকেস সহ মেইল হ্যাক থেকে নামতে দেখা গেল। শহরটা আরকানসাসের এলমোর। ওকে দেখে মনে হবে কলেজ ছাত্র, ছুটিতে বাড়ি ফিরেছে। সাইডওয়ক ধরে হোটেলের উদ্দেশে এগোল ও। এসময় এক তরুণী রাস্তা পার হয়ে, মোড়ের কাছে ওকে পাশ কাটাল এবং 'দ্য এলমোর ব্যাঙ্ক' নামাঙ্কিত একটা দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। মেয়েটির চোখের দিকে চাইল জিমি, ভুলে গেল কে সে, এবং মুহূর্তে সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষে পরিণত হলো। চোখ নামিয়ে নেয় মেয়েটি, ঈষৎ লালচে দেখায় তার মুখের চেহারা। জিমির মত ফ্যাশনদুরস্ত সুদর্শন যুবক এলমোরে বড় একটা দেখা যায় না কিনা।

ব্যাঙ্কের সিঁড়ির কাছে এক ভবঘুরে ছেলেকে দেখে, তাকে একপাশে টেনে নিয়ে আসে জিমি। শহরটি সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে। ওদিকে, সেই তরুণীটি আবার বেরিয়ে আসে। সুটকেসধারী যুবকের প্রতি রানীসুলভ উদাসীনতা দেখিয়ে, নিজের রাস্তায় পা বাড়ায়।

'ওই মহিলা মিস পলি সিম্পসন না?' কূটবুদ্ধির আশ্রয় নেয় জিমি

'উনি অ্যানাবেল অ্যাডামস,' বলে ছেলেটি। 'ওনার বাবা এই ব্যাঙ্কের মালিক।'

প্ল্যান্টার্স হোটেলে গিয়ে খাতায় নাম লেখায় জিমি: রালফ ডি. স্পেনসার। এ শহরে ব্যবসার খোঁজে এসেছে, জানায় কেরানিকে। জুতোর ব্যবসা কেমন চলে এ শহরে? কোনও সুযোগ-টুযোগ আছে?

কেরানি ওর পোশাক-আশাক আর আচার-আচরণ দেখে অভিভূত। সে খুশি মনে তথ্য জোগায়। জুতোর কারবার ভাল চলতে পারে এ শহরে, তেমন কোনও চটকদার দোকান নেই তো।

মি. রালফ স্পেনসার, জিমি ভ্যালেন্টাইনের ভস্ম থেকে উঠে আসা ফিনিক্স—আচমকা ভালবাসার আগুনে পুড়ে গিয়ে রয়ে গেল এলমোরে, এবং দিনে দিনে উন্নতি করে চলল। জুতোর দোকান খুলে অল্পদিনেই জমিয়ে ফেলল ও। সামাজিক জীবনেও সফল সে, বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে, ভালবাসার মানুষটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে ওর

বছর শেষে, ওর আর অ্যানাবেলের বাগদান সম্পন্ন হলো বিয়ের দু'হপ্তা বাকি, এসময় নিজের কামরায় একটা চিঠি লিখতে বসল জিমি। সেন্ট লুইতে, পুরানো এক বন্ধুর নিরাপদ ঠিকানায় পোস্ট করল ওটা। চিঠির বিষয়বস্তু এরকম:

'প্রিয় বন্ধু,

লিটল রকে, সুলিভানের ওখানে আসতে অনুরোধ করছি তোমাকে। আগামী বুধবার রাত নটার সময়। আমার হয়ে কিছু কাজ করে দিতে হবে তোমাকে। এ ছাড়াও, আমার যন্ত্রপাতি আমি তোমার হাতে তুলে দিতে চাই। ওগুলো পেলে তুমি খুশি হবে, জানি আমি। পুরানো ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সুন্দর এক দোকান নিয়েছি। সৎভাবে বাঁচার চেষ্টা করছি, বিলি, এবং শীঘ্রিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেয়েটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।

বিয়ের পর সব বেচেবুচে পশ্চিমে চলে যাব, ওখানে আমার বিরুদ্ধে পুরানো অভিযোগ আনার ভয় কম। সত্যি বলছি, দোস্ত, মেয়েটা একটা অপ্সরা। আমাকে মন থেকে বিশ্বাস করে ও; গোটা দুনিয়া দিয়ে দিলেও আমার দ্বারা আর কোনও পাপ কাজ করা সম্ভব হবে না। সুলির ওখানে আসতে ভুলো না যেন, তোমাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন, বন্ধু।'

তোমার পুরানো দোস্ত,
জিমি।

সোমবার রাতে জিমি চিঠিটা লিখে শেষ করেছে, ওদিকে লিভ্যারী বাগিতে চড়ে এলমোরে অলক্ষে এসে হাজির হলেন পাখোয়াজ গোয়েন্দা বেন প্রাইস। চিরাচরিত অলস ভঙ্গিতে শহরময় ঘোরাফেরা করলেন তিনি, যতক্ষণ না কোনও সূত্র পেলেন।

পরদিন সকালে অ্যাডামসদের বাসায় নাস্তার দাওয়াত ছিল জিমির। লিটল রকে যাবে সে, বিয়ের সুট আর অ্যানাবেলের জন্যে চমকপ্রদ কিছু উপহার কেনার জন্যে। নাস্তার পর দলবেঁধে গোটা পরিবার নেমে এল নীচে—মি. অ্যাডামস, অ্যানাবেল, জিমি, অ্যানাবেলের বিবাহিতা বোন এবং তার দুই মেয়ে—একটার বয়স পাঁচ, অপরটার নয়

জিমি এখনও বাস করে, সে হোটেলটির কাছে চলে এল দলটা। জিমি এক ছুটে তার কামরায় গিয়ে সুটকেসটা নিয়ে এল। এবার সবাই মিলে চলল ব্যাঙ্কের উদ্দেশে। জিমির ঘোড়ায় টানা বাগি অপেক্ষা করছে ওখানে। চালক ডলফ গিবসন ওকে নিয়ে যাবে স্টেশনে।

উঁচু, খোদাইকৃত ওক কাঠের রেলিঙের ভেতরে ব্যাঙ্কিংরুম—জিমি সহ সবাই প্রবেশ করল সেখানে। মি. অ্যাডামসের হবু জামাই হিসেবে সর্বত্র জিমির অবাধ যাতায়াত। এলমোর ব্যাঙ্ক সম্প্রতি আধুনিক এক সেফ আর ভল্ট বসিয়েছে। মি. অ্যাডামস সগর্বে, পরিবারের সদস্যদের জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখতে বললেন।

নব উদ্ভাবিত দরজা ভল্টটার। তিন তিনটি 'জবরদস্ত ইস্পাতের বল্টু এঁটে রাখে ওটাকে, একটিমাত্র হ্যাণ্ডেল ঘুরালে যুগপৎভাবে যথাস্থানে বসে যাবে বল্টু তিনটে। এবং সে সঙ্গে ভল্টে টাইম-লকের ব্যবস্থাও রয়েছে। অ্যাডামস সাহেব জিনিসটির কার্যকারিতা স্পেন্সার সাহেবকে দেখাচ্ছেন, উদ্ভাসিত হাসি তাঁর মুখে। মি. স্পেন্সার সৌজন্য রক্ষা করল, তবে বিশেষ কোনও আগ্রহ দেখাল না। দুই বাচ্চা, মে আর আগাথা, চকচকে ধাতব ভল্ট আর ঘড়ি-নব, এসব দেখে খুব মজা পেয়েছে।

ওরা সবাই যখন ভল্ট দেখতে ব্যস্ত, হেলতে দুলতে ভেতরে এসে ঢুকলেন বেন প্রাইস। কনুইয়ে ভর দিয়ে, রেলিঙের ওপারের ঘটনা দায়সারা ভঙ্গিতে লক্ষ করছেন। কেরানির প্রশ্নের জবাবে জানালেন কোনও কাজে আসেননি; পরিচিত এক লোকের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আচমকা নারী কণ্ঠের চিল-চিৎকার এবং তারপর হুড়োহুড়ির শব্দ শোনা গেল। বড়দের অগোচরে, বড় বোন মে খেলাচ্ছলে, পাঁচ বছরের আগাথাকে আটকে দিয়েছে ভল্টের ভেতর। বল্টু

মেরে কম্বিনেশন নব দিয়েছে ঘুরিয়ে, নানাকে যেমনটা করতে দেখেছে আরকী।

ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক হ্যাণ্ডেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মুহূর্ত খানেক সর্বশক্তিতে টানাটানি করলেন। 'দরজা খোলা যাবে না,' গুঙিয়ে উঠলেন অবশেষে। 'ঘড়িতে দম দেয়া হয়নি, কম্বিনেশনও সেট করা নেই।'

ওপাশ থেকে আতঙ্কিত শিশুটির ক্ষীণ আর্তচিৎকার কানে আসছে কেবল। ভল্টের ভেতরটায় যেমন গাঢ় অন্ধকার, তাতে শুধু ওর কেন, যে কারও জান উড়ে যাবে ভয়ে।

'আমার সোনামণিটার কী হবে!' বাচ্চার মা বিলাপ করে ওঠে। 'বাচ্চাটা ভয়েই মরে যাবে! খোলো, দরজাটা খোলো! কী হলো, ভাঙছ না কেন? তোমরা কি সবাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে? জলদি একটা কিছু করো!'

'ওহ, খোদা! স্পেন্সার,' গলা কেঁপে গেল মি. অ্যাডামসের। 'এখন কী করা? আগাথা বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না ওখানে। অক্সিজেন খুবই কম।'

উন্মাদের মত কে একজন ডিনামাইট ফাটানোর প্রস্তাব করল। অ্যানাবেল ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জিমির উদ্দেশে, গভীর বেদনায় আয়ত চোখজোড়া ভরাট। 'একটা কিছু করো, রালফ—'

হবু স্ত্রীর দিকে চাইল সে, মুখে অদ্ভুত এক টুকরো হাসি 'অ্যানাবেল,' বলল ও, 'তোমার বুকের গোলাপটা দেবে?'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না মেয়েটি, তবে গোলাপটা কাপড় থেকে খুলে প্রেমিকের হাতে দিল

গোলাপটা পকেটে গুঁজে রাখল জিমি, তারপর কোটটা ছুঁড়ে দিয়ে শার্টের আস্তিন গুটিয়ে নিল। এভাবেই রালফ ডি. স্পেন্সার সরে গিয়ে, জায়গা করে দিল সুযোগ্য জিমি ভ্যালেন্টাইনকে।

'সবাই দরজার সামনে থেকে সরে যাও,' আদেশ করল ও

টেবিলে সুটকেসটা রেখে ডালা খুলল সে। দ্রুত হাতে, সুবিন্যস্ত ভাবে একে একে বিছাতে শুরু করল চকচকে, অদ্ভুতদর্শন যন্ত্রপাতিগুলো। কাজে মন দিতেই যথারীতি শিস বেজে উঠল ওর কণ্ঠে। মিনিটখানেক বাদে জিমির পোষা ড্রিল মেশিন মসৃণ কামড় বসাল ইস্পাতের পুরু দরজায়। দশ মিনিটের মাথায়–নিজের গড়া রেকর্ড ভেঙে–বল্টু সরিয়ে দরজা মেলে ধরল সে।

আগাথার মূর্ছিত প্রায় দেহ বুকে চেপে ধরল মা। কান্নায় ভেঙে পড়েছে সে আদরের ধনকে ফিরে পেয়ে। সম্পূর্ণ নিরাপদ এখন তার সন্তান।

জিমি ভ্যালেন্টাইন কোটটা গায়ে চড়িয়ে, রেলিঙের ওপারে সদর দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল। দূরাগত এবং এক সময়ের পরিচিত একটি কণ্ঠ এসময় 'রালফ!' বলে ডেকে উঠল, মনে হলো ওর। কিন্তু দ্বিধা করল না ও, দাঁড়াল না।

লক্ষ করল, দরজা একরকম আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশালদেহী এক লোক।

'আরে, বেন যে!' বলে উঠল জিমি। 'ঠিকই পৌঁছে গেছ দেখছি। চলো, বন্ধু, যাওয়া যাক। এখন আর কোনও কিছুতেই কিছু এসে যায় না।'

অস্বাভাবিক আচরণ করে বসলেন এবার বেন প্রাইস।

'আপনি বোধহয় ভুল করছেন, মি. স্পেন্সার,' বললেন গোয়েন্দা। 'আপনাকে তো আমি চিনি না! আপনার বাগি অপেক্ষা করছে, যান।'

বেন প্রাইস ঘুরে দাঁড়িয়ে, গদাই লশকরী চালে রাস্তার উদ্দেশে হাঁটা ধরলেন।

মূলঃ ও' হেনরী
রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

খরচ খুবই বেশি

ফ্রান্স ও ইতালির সীমান্তের কাছে মোনাকো নামে একটি রাজ্য আছে। যেমন তেমন থানা শহরই রাজ্যটির চেয়ে বড়। কারণ রাজ্যটির মোট জনসংখ্যা মাত্র সাত হাজারের মত, আর রাজ্যের সমস্ত জমি অধিবাসীদের মধ্যে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকের ভাগে এক একর জমিও জুটবে না। কিন্তু এই রাজ্যেও একজন প্রতাপশালী রাজা আছেন, আছে রাজপ্রাসাদ, সভাসদবর্গ, সচিব, বিশপ এমনকী সেনাবাহিনী। মাত্র ষাট সদস্যের সেনাবাহিনী। রাজ্য ছোট হলে কী হবে করের কিন্তু অভাব নেই। জনগণ কর দিতে দিতে শেষ। তারপরও সভাসদ, কর্মচারী ও নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করা রাজার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কারণ জনসংখ্যাই তো মাত্র সাত হাজার, কর আর কত আসবে? রাজা অনেক ভেবে চিন্তে জুয়ার আড্ডাখানা খুলে দিলেন। লোকে জুয়া খেলতে এসে হারুক বা জিতুক আড্ডার পরিচালক শতকরা হিসাবে কমিশন রেখে দেয় আর সেই কমিশনের বড় একটা অংশ রাজাকে দিয়ে দেয়। রাজার তো রমরমা অবস্থা। কারণ ইউরোপের কোথাও জুয়া খেলার অনুমতি দেওয়া হয় না। কাজেই ইউরোপ জুড়ে যারই জুয়া খেলতে ইচ্ছা হয় সে-ই চলে আসে মোনাকোয়। তারা হারুক বা জিতুক, রাজা যথারীতি লাভবান। এদিকে কিছুদিন পর জুয়া খেলা নিয়ে রাজার রাজত্বে একটা খুন হলো। রাজ্যের অধিবাসীরা খুব শান্তশিষ্ট, এধরনের ঘটনা এর

আগে কখনও ঘটেনি। বিচার সভা বসল। অনেক তর্কবিতর্কের পর বিচারক খুনীকে মুণ্ডুচ্ছেদের দণ্ড প্রদান করলেন। রাজা দণ্ডাদেশ পড়ে সমর্থন দিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো মোনাকোয় না ছিল মুণ্ডু কাটবার গিলোটিন, না ছিল কোনও জল্লাদ। রাজা পড়লেন ভয়ানক সমস্যায়। সচিবরা বৈঠক করে স্থির করলেন, ফরাসি সরকারের কাছে একটা গিলোটিন আর একজন বিশেষজ্ঞ চেয়ে আবেদন করা হোক। চিঠি পাঠানোর এক সপ্তাহ পর জবাব এল, একটি যন্ত্র ও একজন বিশেষজ্ঞ পাঠানো যাবে। কিন্তু এর জন্য খরচ দিতে হবে ১৬০০০ ফ্রাঁ। জবাবটা রাজার সামনে পেশ করা হলো। রাজা তো তাজ্জব বনে গেলেন। তিনি বললেন, '১৬০০০ ফ্রাঁ! অসম্ভব! হতভাগাটার দাম মোটেও এত হতে পারে না।' আরও সস্তায় কীভাবে কাজটা করা যায় তা ভেবে দেখার নির্দেশ দেওয়া হলো সভাসদকে। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ফরাসীরা ভয়ানক পাজি, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়াটাই ভুল হয়েছে। ইতালি সরকারের কাছে আবেদন করা হোক।

চিঠি পাঠানো হলো। জবাবও এল খুব দ্রুত। ইতালি সরকার জানাল তারা যন্ত্র ও বিশেষজ্ঞ পাঠানো বাবদ ১২০০০ ফ্রাঁ নেবে। রাজা তো খেপে আগুন।

'১২০০০ ফ্রাঁ! না, না। এ হতে পারে না। এর মানে প্রজাদের উপর অতিরিক্ত ২ ফ্রাঁ করে কর বসাতে হবে। অসম্ভব!' প্রজারা এ সিদ্ধান্ত মানবে না। আবার সভা ডাকা হলো। উপস্থিত সভাসদবর্গ সেনাপতিকে বলল, 'এই অপরাধীটার মুণ্ডু কি কোনও সেনা কাটতে পারে না? সেনাদেরকে তো যুদ্ধ করা আর মানুষ মারার জন্যই নিয়োগ দেওয়া হয়!'

সেনাপতি সেনাদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। কিন্তু কোনও সেনাই এ কাজে রাজি হলো না। তারা বলল, 'যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ মারা সে আলাদা কথা, কিন্তু একজন নিরীহ মানুষকে মারা? না,

আমাদের পক্ষে সম্ভব না!' কী করা যায়? সচিবরা সভার পর সভা করতে লাগলেন। কমিটি, সাব কমিটি গঠন করা হলো। শেষে স্থির করা হলো মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করাই ভাল। এতে খরচও বাঁচবে, রাজার মহত্ত্বও প্রকাশ পাবে। রাজাও এতে সম্মতি জানালেন। কিন্তু তখন আর একটি সমস্যা দেখা দিল। মোনাকোয় কোনও জেল ছিল না। কী আর করা, প্রাসাদের সাথেই একটি কারাগার বানানো হলো। একজন রক্ষীও নিয়োগ দেওয়া হলো যুবকটিকে পাহারা দেওয়ার জন্য। মাসের পর মাস কাটতে লাগল। বছর পার হয়ে গেল। বছর শেষে রাজা তাঁর রাজত্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখতে বসলেন। এক জায়গায় নজর পড়তেই রাজার চোখ কপালে উঠল। ঘটনা হচ্ছে, অপরাধীর খাবারদাবার এবং তার জন্য বরাদ্দ করা রক্ষীর ব্যয় দুইয়ে মিলে বাৎসরিক ৬০০ ফ্রাঁতে ঠেকেছে। রাজার তো মাথা গরম। যুবকের বয়স সবে ২৫-৩০। সে যদি আরও পঞ্চাশ বছর বাঁচে তবে খরচ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে খেয়াল আছে? রাজা তাড়াতাড়ি সচিবদের ডেকে বললেন, 'এই পাজিটির জন্য আরও সস্তায় কী করা যায় ভেবে দেখুন।'

সচিবরা পরামর্শ করতে লাগলেন। একজন বললেন, 'রক্ষীটাকে বরখাস্ত করা হোক।' আরেকজন বললেন, 'তা হলে তো বন্দি পালিয়ে যাবে।'

প্রথমজন বললেন, 'যাক না, পালিয়ে গিয়ে যদি ফাঁসিতে ঝুলতে চায় তো যাক পালিয়ে।' রাজাও এতে মত দিলেন। কারারক্ষীটাকে বরখাস্ত করা হলো। দুপুরে যখন বন্দির খাওয়ার সময় হলো তখন কারাগারের দরজায় এসে দেখে সেখানে কোনও পাহারাদার নেই। কী আর করা, পাজিটা নিজেই দরজা খুলে প্রাসাদে চলে গেল। রান্নাঘরে যা পেল তাই খেয়ে কারাগারে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল। দিন যায়, সে আরও সুখে আছে। যথাসময়ে

খায়-দায়-ঘুমায় কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার কোনও লক্ষণ তার মধ্যে নেই। কী করা যায়? আবার সভা বসল। একজন সচিব বললেন, 'ওকে বললেই তো হয় যে আমরা ওকে আর রাখতে চাই না।' বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী অপরাধীকে ডেকে আনলেন। বললেন, 'তুমি পালিয়ে যাচ্ছ না কেন? তোমাকে রাখার কোনও ইচ্ছা আমাদের নেই। তুমি যেখানে খুশি যেত পার, রাজা এতে কিছু মনে করবেন না।'

লোকটি বলল, 'রাজা মহাশয় যে কিছু মনে করবেন না সে তো আমি জানিই। কিন্তু আমি যাব কোথায়? জেলখানায় বসে থাকতে থাকতে আমার শরীরে বাত ধরেছে। কাজকর্ম কিছু করতে পারব না। তা ছাড়া আমি দাগী কয়েদী, কে আমায় কাজ দেবে বলুন? এই হলো এক দিক। তা ছাড়া আর একটি কথা আছে। আপনারা প্রথম আমার ফাঁসি দিলেন, তারপর দিলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এখন বলছেন চলে যেতে। আপনারা যা ইচ্ছে তাই বলবেন আর আমি তাই মেনে নেব, না, তা হতে পারে না। আমি জেলখানায় থাকব, আপনারা যা ইচ্ছে তাই করুন।' কী আর করা। রাজা তো ভয়ানক ভাবনায় পড়লেন। সচিব, মন্ত্রী সবাইকে ডেকে পাঠালেন। রাজা বললেন, 'এই পাজি বদমাশটার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় বের কর, জলদি।'

সবাই মিলে রাজাকে জানালেন এর হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে তার জন্য একটা বৃত্তি দেওয়া হোক! এবং মুক্তি দেওয়া হোক। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ৬০০ ফ্রাঁ পেনশন দেওয়া হবে। বন্দিকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হলো।

সে বলল, 'ঠিক আছে, আপনারা যতদিন আমাকে টাকা দেবেন ততদিন আমি কিছু বলব না। কিন্তু পেনশন বন্ধ হলেই আমি আবার জেলখানায় ঢুকে পড়ব। এই শর্তে আমি চলে যেতে রাজি আছি।' সবাই তার প্রস্তাব মেনে নিল।

বার্ষিক বরাদ্দকৃত পেনশনের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে সে মোনাকো ছেড়ে চলে গেল পার্শ্ববর্তী রাজ্যে। যথাসময়ে সে মোনাকোয় যায় এবং পেনশনের টাকা নিয়ে জুয়ার আড্ডাখানায় চলে যায়। কখনও জেতে, কখনও হারে, তারপর মোনাকো থেকে চলে যায়। এখন সে বেশ সুখে-শান্তিতেই আছে।

মূলঃ লিও তলস্তয়
রূপান্তরঃ রাজীব

আয়কর

সম্প্রতি বাড়ি কিনে থিতু হওয়ার পর এক লোক সবার আগে আগ্রহ দেখাল আমার প্রতি। ভদ্রলোক নাকি একজন অ্যাসেসর–শব্দটা জানা ছিল না আমার। তাকে বললাম, ব্যবসার এ ধারাটির সাথে পরিচয় নেই আমার। তবে তা সত্ত্বেও তাকে দেখে খুশি হয়েছি আমি। ভদ্রলোককে বসতে বলায় বসল সে। কীভাবে আলাপ শুরু করা যায় ভেবে পেলাম না। অবশেষে জানতে চাইলাম, পাড়ায় দোকান-টোকান খুলেছে নাকি সে।

লোকটা সম্মতি জানাল। এবার জানতে চাইলাম ব্যবসা কেমন? বলল মন্দ নয়।

আমি এবার বললাম, তার দোকানে যাব, পছন্দ হলে ওখান থেকেই কেনাকাটা করব।

লোকটা বলল, তার সাথে একবার যে কারবার করেছে সে জীবনেও আর তার মত আরেকজনকে খুঁজতে যায় না। ভারী আত্মবিশ্বাসী শোনাল তার কথাগুলো।

কীভাবে তা জানি না, কিন্তু একটু পরই আবিষ্কার করলাম, বেশ খোলতাই আলাপ জমে উঠেছে দু'জনের মধ্যে। অনেক কথা-বার্তা, হাসাহাসি হলো। কিন্তু লোকটার যে কীসের ব্যবসা জানা হলো না। এবার চাল খাটালাম আমি। সুগভীর এক চাল। আমার কাজের কথা ওকে খোলামেলা জানিয়ে কৌশলে ওর কীসের কারবার জেনে নেব।

'আপনি ভাবতেও পারবেন না, লোকের সামনে ভাষণ দিয়ে কত টাকা কামিয়ে নিয়েছি আমি।'

'কত, দু'হাজার ডলারের মত হবে? নাহ্, বেশি বলে ফেলেছি। অত হবে না, বড়জোর সতেরোশো হতে পারে,' নিজে থেকেই বলল।

'হা-হা! জানতাম পারবেন না। টক দিয়ে চোদ্দ হাজার সাতশো পঞ্চাশ ডলার কামিয়ে নিয়েছি। তাও আবার শুধু গত বসন্ত আর এবারের শীতের কথা বলছি। কী, কেমন বুঝলেন?'

'চিন্তাই করা যায় না। দাঁড়ান, নোট নিয়ে নিই। আপনি বলছেন আয় আরও আছে?'

'খবরের কাগজেরটার কথা তো বলিইনি। চার মাসের জন্যে ওরা আমাকে–কত যেন–এই ধরুন, আট হাজার ডলারের মত দিয়েছে।'

'ওরে বাবা!' বিস্ময় ফুটল লোকটার কণ্ঠে। 'এই-ই নিশ্চয়ই শেষ নয়, আরও আছে?'

'হা-হা-হা! সবে তো শুরু। আমার "দ্য ইনোসেন্টস অ্যাব্রোড" বইটা গত সাড়ে চার মাসে পঁচানব্বই হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। ভাবতে পারেন, পঁচানব্বই হাজার! ধরুন প্রতিটা গড়ে চার ডলার করে। তা হলে কত হয়? এর অর্ধেক আমার রয়্যালিটি।'

'সব্বোনাশ,' খাবি খায় লোকটা। 'এ-ও কি সম্ভব?'

আবার নোট নেয় সে।

'ভুল না হলে অবশ্যই সম্ভব। আয় আরও বেশি আছে আমার। এ বছর আমার রোজগার দু'লাখ চোদ্দ হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে।'

একটু পরে উঠে দাঁড়ায় লোকটা। কোনও ফায়দা হলো না, মনে মনে বলি আমি। লোকটার কাছে বাগাড়ম্বর করে ওকে চমকে

দেয়াটাই সার হলো। ও কীসের ব্যবসা করে তা তো ভাঙল না। শেষ মুহূর্তে, আমার হাতে একখানা বড়সড় খাম ধরিয়ে দিল লোকটা। ওতে নাকি সব লেখা আছে। আমার মত একজন মহাধনীর সাথে কথা বলতে পেরে সে যারপরনাই আহ্লাদিত। কেননা, শহরের মস্ত ধনীদের সাথে ব্যবসা করতে গিয়ে সে উপলব্ধি করেছে, বেচারীদের নুন আনতে পান্তা ফুরানোর দশা। অথচ বহু বছর পরে এমন একজন ধনীর দেখা পেয়েছে, যে কিনা সাদরে বরণ করে নিয়েছে তাকে–হাত মিলিয়েছে। আমাকে নাকি তার বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে সুযোগটা পেলে।

খুশি ধরল না আমার, আপত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না। অচেনা লোকটা আমাকে সবলে জড়িয়ে ধরে, ক'ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দিল আমার ঘাড়ের কাছে। তারপর বিদায় নিল।

লোকটা চলে যাওয়া মাত্র খামটা খুললাম আমি। একটানা চার মিনিট গভীর মনোযোগে পড়লাম কাগজগুলো। তারপর বাবুর্চিকে ডাক দিয়ে বললাম, 'মূর্ছা যাওয়ার আগে আমাকে শক্ত করে ধরো।'

পরে, জ্ঞান ফিরে পেয়ে রাস্তার কোনা থেকে এক শিল্পীকে ডেকে আনতে লোক পাঠালাম। ভাড়াটে লোকটা রাত জেগে অচেনা শয়তানটাকে অভিশাপ দেবে।

লোকটা কী বদের বদ! খুদে খুদে অক্ষরে, চার পৃষ্ঠা ঠাসা অসংখ্য আয়কর সংক্রান্ত প্রশ্ন গছিয়ে দিয়ে গেছে। দুনিয়ার বৃদ্ধতম ব্যক্তিটির পক্ষেও যার মর্মোদ্ধার করা সম্ভব নয়। আর কী সব প্রশ্ন–সবচেয়ে ভদ্র প্রশ্নগুলো হচ্ছে, মহাসড়কে ডাকাতি করি কিনা আমি; কারও সম্পত্তিতে কখনও আগুন দিয়েছি কিনা, আয়-রোজগারের গোপন কোনও রাস্তা ইস্তেমাল করি কিনা এসব।

সোজা কথা, লোকটা আমাকে স্রেফ বুদ্ধু বানিয়ে গেছে।

আমার বারফট্টাইয়ের সুযোগ নিয়ে, আমার আয় দু'লাখ চোদ্দ হাজার ডলার ধরে দিয়েছে। আইনে বলে, এর এক হাজার আয়কর মুক্ত—মহাসমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা শিশির, ব্যাপারটা তেমনি মনে হলো আমার কাছে। পাঁচ শতাংশ হারে সরকারকে এক ভয়ঙ্কর অঙ্কের টাকা কর দিতে হবে আমাকে। দশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ ডলার!

(এখানে বলে রাখি, তা আমি দিইনি।)

বিপুল সম্পদশালী এক লোককে চিনি আমি। প্রাসাদের মত এক অট্টালিকায় বাস করেন তিনি। দু'হাতে টাকা ওড়ান। কিন্তু করদাতাদের তালিকায় চোখ বুলালে দেখা যায়, বেচারার আসলে কোনও আয়ই নেই। পরামর্শের জন্যে তাঁর কাছে গেলাম।

কাগজগুলো তুলে নিলেন ভদ্রলোক, চোখে চশমা এঁটে, কলম ধরলেন—এবং হঠাৎই আমাকে বেহদ্দ গরিব বানিয়ে দিলেন। রেয়াতের তালিকা দেখে দেখে অতি সহজে কাজটা সেরে ফেললেন তিনি।

রাজ্য, জাতীয় ও নহর করের আওতায় বাদ গেল একটি বড়সড় অঙ্ক। জাহাজডুবীর ফলে এবং অগ্নিকাণ্ডে সম্পত্তি নাশ বাবদ বড় এক অঙ্কের রেয়াত মিলল। তা ছাড়া, বাড়ি ভাড়া, জানোয়ার বিক্রি, সম্পত্তির মেরামতি এসব তো আছেই। সব শেষে দেখা গেল, বাদ-ছাদ দিয়ে আমার আয় টিকেছে সাকুল্যে এক হাজার দু'শো পঞ্চাশ ডলার চল্লিশ সেন্ট।

'এখন,' বললেন তিনি, 'এক হাজার ডলার পর্যন্ত ট্যাক্স তো মাফ আছেই। সোজা গিয়ে এই কাগজ হাতে শপথ নেবেন আপনি। আর আড়াইশো ডলারের ট্যাক্স পে করবেন।'

'আপনিও কি এভাবেই কর দেন নাকি?'

'তবে আবার কী? কর মওকুফের প্রশ্নমালা যদি না থাকত, তা হলে এই জঘন্য, শয়তান, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী সরকারকে টিকিয়ে

রাখার জন্যে আমাকে কবেই ফতুর হতে হত।'

শহরের বড়লোকদের মধ্যে আমার এই ওস্তাদটি অন্যতম–তিনি নীতিবোধ, ব্যবসায়িক সততা ও সামাজিক অবস্থানের কারণে অত্যন্ত সম্মানিত। কাজেই তাঁর পরামর্শ না মেনে উপায় আছে? ট্যাক্স অফিসে গেলাম আমি, এবং আমার অতিথিটির অভিযোগের দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে, মিথ্যের পর মিথ্যে বলে চললাম। কৌশল খাটিয়ে আয়করের নাগাল এড়াতে পারলাম বটে, কিন্তু চিরদিনের জন্যে আত্মসম্মানবোধ বলি দিতে বাধ্য হলাম।

মূলঃ মার্ক টোয়েন
রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

শিকারের থলে

'নোরা, মেজর পেলাবি চা খেতে আসছেন,' মিসেস হুপিংটন তাঁর ভাগ্নীকে বললেন। 'এইমাত্র আস্তাবলের দিকে গেলেন ঘোড়া রাখতে, এখুনি এসে পড়বেন। একটু হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করো, ভীষণ মনমরা হয়ে আছেন বেচারা।'

মেজর পেলাবি পরিস্থিতির শিকার অন্তত নিজেকে তিনি তাই মনে করেন। পরিস্থিতির উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ খুবই কম। আরও একটা জিনিসের উপর মেজরের নিয়ন্ত্রণ নেই। সেটা হচ্ছে তাঁর মিলিটারি মেজাজ। বিনা নোটিশে সপ্তমে চড়ে যায় ওটা। আর মন-মেজাজ খারাপ হবার মত অনেক কারণ আছে মেজরের। পেক্সডেল হাউন্ড অ্যাসোসিয়েশনের হাল ধরার পর থেকেই এলাকার শেয়ালরা সব লেজ তুলে পালিয়েছে, টিকিটিও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ওদের। আগের সভাপতি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও শিকারের ব্যাপারে সফল ছিলেন, এবং তাঁর সাথে মেজর পেলাবিকে তুলনা করে খোঁটা দিতে কসুর করছে না শিকার সমিতির অর্ধেক সদস্য। আর মেজরের তিরিক্ষি ব্যবহার দূরে সরিয়ে দিয়েছে বাকি অর্ধেককে। শূন্য হাতে বারবার ফিরে আসার পর শিকার সমিতির অনেক সদস্য এখন ইস্তফা দিচ্ছে। হ্যাঁ, মন খারাপের কারণ আছে মেজর পেলাবির।

তবে মিসেস হুপিংটন মেজর পেলাবির একনিষ্ঠ ভক্ত ও সমর্থক। কিছু বিশেষ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও স্বার্থ আছে মহিলার।

বছরে তিন হাজার পাউন্ডের রোজগার, আর একটা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যারনেটসি পাবার সম্ভাবনা, দুইই মিসেস হুপিংটনকে দুর্বল করে তুলেছে বদমেজাজি মেজরের প্রতি। নিজেকে ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের মিসেস ও ব্যারনেস পেলাবি ভাবতে শুরু করেছেন তিনি। হ্যাঁ, সময়-সুযোগ এবং আরেকটু উৎসাহ পেলেই মেজরের গলায় লটকে পড়বেন। ও তরফ থেকে যদিও তেমন সাড়া মেলেনি, তবু হুপিংটন হলে মেজর ঘন ঘন পায়ের ধুলো দিচ্ছেন ইদানীং। যা বেশ আশাব্যঞ্জক।

'গতকালটা খুব খারাপ গেছে বেচারার,' নোরাকে জানালেন মিসেস হুপিংটন। 'তুমি যদি আর জনাকয় শিকারী টাইপের ছেলেবন্ধুকে নিয়ে যেতে, তা হলে বেশ ভাল হত। ওই মাথামোটা রাশান ছেলেটার মধ্যে কী দেখেছ তুমি, তুমিই জানো।'

'ভ্লাদিমির মোটেই মাথামোটা নয়, খালা!' চটে উঠে বলল নোরা। 'ভ্লাদিমির খুব চমৎকার ছেলে, এখানকার ওসব শিকার-পাগল স্থূল লোকজনের সাথে ওর তুলনা করাটাই অন্যায়...' আরও কী সব যেন বলতে চাইছিল নোরা, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলেন মিসেস হুপিংটন।

'আর যাই হোক, নোরা, ছেলেটা ঘোড়ায় চড়তে জানে না।'

'রাশানদের কেউই ঘোড়ায় চড়তে জানে না, কিন্তু ও বন্দুক চালাতে জানে।'

'তা তো বটেই!' বাঁকা হাসলেন মিসেস হুপিংটন। 'কাল ওর শিকারের থলে থেকে কি বের হলো? একটা কাঠঠোকরা!'

'শুধু কাঠঠোকরাটাকেই দেখলে তুমি, খালা! কয়েকটা খরগোশ আর তিতিরও বেরিয়েছিল ওর থলে থেকে।'

'সে যাই হোক, কাঠঠোকরা শিকার করাটা আমাদের ইংরেজদের স্পোর্টসম্যানশিপের আওতায় পড়ে না।'

'বিদেশীরা প্রায়ই ওরকম পাঁচমিশালি শিকার করে থাকে।

একবার এক রাশান গ্র্যান্ড ডিউক একটা শকুন শিকার করেছিলেন, ভ্লাদিমির নিজে আমাকে বলেছে গল্পটা। যা হোক, আমি ওকে বলে দিয়েছি, কিছু কিছু পাখি আছে, এই যেমন—কাক বা মুরগি, যেগুলো শিকার করাটা শিকারীর জন্য অসম্মানজনক। ওর বয়স তো মাত্র উনিশ, আর কিছুদিন সময় দাও, ও সব শিখে যাবে,' ভারী মুরুব্বিয়ানা চালে বলল নোরা।

ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন মিসেস হুপিংটন। কিছু কিছু লোক আছে যারা ভ্লাদিমিরের আমুদে ফুর্তিবাজ মেজাজের কাছাকাছি আসা মাত্রই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু মিসেস হুপিংটন সে দলে পড়েন না।

'যাক গে, থাক ওসব কথা,' বললেন মিসেস হুপিংটন। 'আমি চায়ের যোগাড় করতে যাচ্ছি। মেজর এর মধ্যে এসে পড়লে, কথা বার্তা চালিয়ে যেয়ো। আর যা বললাম, হাসিখুশি থাকার চেষ্টা কোরো,' বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

নোরা তার খালার ওপর অনেক ছোটখাট ব্যাপারে নির্ভরশীল। অতএব খালার মন যুগিয়ে চলার অভ্যাসটা তার অনেকদিনের। কিন্তু ছেলেবন্ধু ভ্লাদিমির যে এ-বাড়ির কর্ত্রীর নেকনজরে পড়তে পারছে না, সেটা তাকে সামান্য বিষণ্ণ করে তুলছে। ভ্লাদিমির এদিকে বেড়াতে আসার পর গ্রাম্য জমিদার বাড়ি হুপিংটন হলের পরিবেশ অনেক চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, অন্তত নোরার কাছে। এমন সময় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ভ্লাদিমির, শিকার করে ফিরছে। অনেক বনবাদাড় ঠেঙিয়ে ক্লান্ত, আলুথালু, অপরিচ্ছন্ন বেশভূষা, কিন্তু খুশিতে ডগমগ ভ্লাদিমির, শিকারের থলেটাও বেশ মোটাসোটা দেখাচ্ছে।

'বলো তো, কী শিকার করেছি আমি?' জানতে চাইল ভ্লাদিমির।

'তিতির? কবুতর? খরগোশ?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল নোরা।

'হলো না। একটা বড় জন্তু। আমি জানি না ইংরেজিতে ওটাকে কী বলে। বাদামী কালোমতো একটা লেজ আছে।'

'ওটা কি গাছে থাকে, বাদাম খায়?' নোরা ভাবল। 'বড়' শব্দটা স্রেফ বাড়িয়ে বলেছে ভ্লাদিমির।

'না! না!' হাসতে হাসতে বলল ভ্লাদিমির। 'মানে, কাঠবিড়ালি না!'

'ওটা কি পানিতে থাকে? মাছ খায়?' মনে মনে প্রার্থনা করছে নোরা, যেন ওটা ভোঁদড় হয়, শেষ রক্ষা হবে তা হলেও।

'এবারও হলো না,' বলল ভ্লাদিমির। 'জন্তুটা বনে থাকে, খরগোশ আর মুরগি ধরে খায়।'

'সর্বনাশ, ভ্লাদিমির!' দু'হাতে মুখ ঢাকল নোরা। 'তুমি একটা শেয়াল মেরে ফেলেছ!'

হতভম্ব দেখাল রাশান তরুণকে। সে বুঝতে পারছে, একটা মারাত্মক অপরাধ করে ফেলেছে। কিন্তু অপরাধটা কী, সেটা তার রুশ মগজে ঢুকছে না। তার দেশের মানুষ এসব প্রাণী মারার ব্যাপারে তেমন বাছবিচার করে না।

'লুকাও! জলদি লুকাও তোমার ব্যাগটা!' আতঙ্কিত গলায় বলল নোরা। 'খালা আর মেজর পেলাবি এখনই এসে পড়বেন! আলমারিটার ওপর ছুঁড়ে ফেলো, হঠাৎ চোখে পড়বে না তা হলে কারও।'

স্ট্র্যাপ ধরে শিকারের থলেটা ছুঁড়ে মারল ভ্লাদিমির। আলমারির উপরই পড়ত ওটা, নিশানাটা ভালই ছিল। কিন্তু বিধি বাম, দেয়ালের ট্রফি হিসেবে টাঙানো ছিল একটা মস্ত শিংওয়ালা হরিণের মাথা, একটা শিং-এর ডগায় আটকে গেল স্ট্র্যাপটার একটা প্রান্ত। শিং থেকে ঝুলতে থাকল পেটমোটা ব্যাগটা। চায়ের টেবিল থেকে মুখ তুললেই কেউ দেখতে পাবে ওটা। এমন সময় মেজর পেলাবিকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিসেস হুপিংটন।

'আগামীকালই ক্লাবের তরফ থেকে শিকারে যাবার আয়োজন করেছেন মেজর,' খুশি খুশি গলায় বললেন মিসেস হুপিংটন। 'মেজর আশা করছেন ভাল শিকার হবে, কারণ স্মিদার্স বলেছে এ হপ্তায় নাকি অন্তত তিনবার একটা শেয়ালকে দেখেছে সে আমাদের আখরোট গাছের বাগানে।'

'আমি আশা করছি আগামীকালটা ভাল যাবে,' বিরস গলায় বললেন মেজর। 'একটা শিকার পেলেই এই খরা কেটে যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, অনেকসময়ই আমরা শুনি একটা শেয়াল খুঁটি গেড়ে বসেছে কোথাও, কিন্তু কাছে গেলেই দেখা যায় লাপাত্তা। যেমন আমার ধারণা যেদিন লেডি উইডেনের বনে শিকারে গেলাম, তার ঠিক আগের দিন কেউ গুলি করে অথবা ফাঁদ দিয়ে মেরেছে শেয়ালটাকে।'

'মেজর, আমাদের বনে যদি কেউ এমন করে, তবে হাতেনাতে ফল পাবে সে,' জানালেন মিসেস হুপিংটন।

যান্ত্রিক পুতুলের মত চায়ের সরঞ্জাম সাজানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল নোরা। যেন স্যান্ডউইচের ডিশের চারধারে পার্সলি জড়ো করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুনিয়াতে। চোখের এককোণ দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে মেজরের বিরস বদন, আর চোখের অন্য কোণ দিয়ে দেখছে ভ্লাদিমিরকে, তাড়া খাওয়া খরগোশের মত চেহারা হয়েছে তার। আর সবকিছুর ওপর ঝুলে আছে 'ওটা', বমালসমেত ভ্লাদিমিরের শিকারের থলে। মনের চোখে দেখতে পাচ্ছে নোরা, সাদা টেবিলক্লথের ওপর শেয়ালের লাল রক্ত চুইয়ে পড়ল বলে! ভুলেও টেবিল ছেড়ে উপরে তাকাচ্ছে না সে।

'কি শিকার করেছ তুমি আজকে, ভ্লাদিমির?' নীরবতা ভেঙে হঠাৎ ভ্লাদিমিরকে প্রশ্ন করলেন মিসেস হুপিংটন।

নোরার হৃৎপিণ্ড থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত খালার কথা শুনে।

আবার চালু হতে মনে হলো বেশ খানিকটা সময় লাগল।

'কিছু না,' আমতা আমতা করল ভ্লাদিমির। 'মানে, বলার মত কিছু পাইনি।'

'পেলে ভাল হত,' বললেন মিসেস হুপিংটন। 'কথা বলার মত একটা কিছু পাওয়া যেত। সবাই এমন গুম মেরে গেল কেন, মুখে রা নেই কারও?'

'স্মিদার্স ঠিক কখন দেখেছে শেয়ালটা?' জানতে চাইলেন মেজর পেলাবি।

'গতকাল সকালে, গাঢ় রঙের বেশ বড়সড় শেয়াল।'

'কাল এটার পেছনে ছুটব আমরা ঘোড়া নিয়ে!' চিন্তাটা মনে হলো কয়েক মুহূর্তের জন্য উজ্জীবিত করল শিকার ক্লাবের সদা বিষণ্ন সভাপতিকে। আবার নীরবতা ঘিরে ধরল টেবিলকে। পিরিচে চা চামচের টুং টাং আর স্যান্ডউইচে কামড় দেবার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। তবে, মিসেস হুপিংটনের পোষা ফক্স টেরিয়ার একটা খালি চেয়ারে লাফিয়ে ওঠার পর, ঘটনা নতুন দিকে মোড় নিল। টেবিলের ওপর কী সব খানাপিনা মজুদ আছে তা একটু কাছ থেকে জরিপ করার জন্যই কুকুরটা উঠেছিল চেয়ারে, তবে তার মনোযোগ শিগ্‌গিরই ঘুরে গেল অন্য দিকে। মিইয়ে আসা ঠাণ্ডা টি কেকের চেয়ে অনেক মুখরোচক জিনিস আবিষ্কার করেছে সে।

'কী দেখে এত উত্তেজিত হচ্ছে ও?' জানতে চাইলেন কুকুরের অবাক কর্ত্রী, কারণ হাবভাব পুরো বদলে গেছে কুকুরটার। গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড় শব্দের সাথে ছোট ছোট চাপা ক্রুদ্ধ ডাক ছাড়ছে, শিকারের গন্ধ পেলে যেমন করে। 'তোমার শিকারের ব্যাগ, ভ্লাদিমির!' হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন মিসেস হুপিংটন। 'কি জানোয়ার মেরেছ তুমি এবার?'

'এই তা হলে ব্যাপার!' উঠে দাঁড়িয়েছেন মেজর পেলাবি।

‘গন্ধটা আমিও পাচ্ছি অনেকক্ষণ থেকে।’

একই চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে খেলে গেল অতিথি আর গৃহকর্ত্রীর মনে। প্রায় একই সাথে একই রকম লালচে-বেগুনি রঙ নিল তাঁদের মুখ। চেঁচালেন ওঁরা দুজনেই, ‘এত বড় আস্পর্ধা! আমাদের শেয়ালটাকে মেরে ফেলেছ তুমি!’

নোরা একটা কিছু বলার চেষ্টা করল ভ্লাদিমিরের দোষ স্খলনের জন্য। কিন্তু তাঁরা কেউ নোরার কথা শুনতে পেল বলে মনে হলো না। মেজরের মেজাজের থার্মোমিটার স্ফুটনাংকের মাত্রা ছাড়িয়েছে আগেই, এবং জিভ খুঁজে পেয়েছে প্রয়োজনীয় ভাষা। এতদিন তীর্থের কাকের মত বসে থাকার পর যাও বা একটা শেয়ালের সন্ধান পাওয়া গেল, তাও এই উজবুক, মাথামোটা, অবিবেচক, আহাম্মক, রাশান এসে সেটাকে অত্যন্ত হৃদয়হীনতার সাথে মেরে ফেলল? ভাগ্যকে অভিশাপ দিলেন মেজর, অভিশাপ দিলেন আশপাশের সমস্ত জিনিস এবং মানুষকে। মেজরের সপ্তম স্বর যখন পড়ে যাচ্ছিল, তখন শোনা গেল মিসেস হুপিংটনের তীক্ষ্ণ ঝগড়াটে বিলাপ। এদের সাথে থেকে চড়া পর্দায় ঘেউ ঘেউ করে তাল রাখছিল ফক্স টেরিয়ারটা। ভ্লাদিমির চুপচাপ একটা সিগারেট আঙুলে মোচড়াতে মোচড়াতে চুপচাপ বসে আছে চেয়ারে। মাথার ওপর বয়ে যাওয়া শব্দের বন্যার দশভাগের একভাগও বুঝতে পারছে না সে। তবে ইংরেজের ‘অলিখিত শিকারের আইন’ যে আবার ভেঙে ফেলেছে সে, এটুকু বুঝতে পারছিল। মাঝে মাঝেই একটা প্রিয় ও ভদ্র সমাজে বলবার অনুপযোগী ইংরেজি বিশেষণ বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছে নিচু স্বরে। তার মনে পড়ছিল ছোটবেলায় শোনা একটা পুরনো রুশ উপকথা, যাদুর পাখিকে না বুঝে ভুল করে মেরে ফেলায় হাতেনাতে কি ফল পেয়েছিল এক বোকা শিকারী।

ওদিকে মেজর পেলাবি একটা বন্দী সাইক্লোনের মত ঘরের

মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় টেলিফোনটা চোখে পড়ায় মনে হলো অথৈ সাগরে কূল পেলেন তিনি। থাবা মেরে রিসিভারটা তুললেন। হাউন্ড ক্লাবের সেক্রেটারিকে দিতে বললেন অপারেটরকে। সেক্রেটারি ধরলে জোর গলায় সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি মৌখিকভাবে, তারপর ধুপধাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একজন ভৃত্য ইতিমধ্যেই মেজরের ঘোড়াটাকে নিয়ে এসেছে সদর দরজার সামনে।

মিসেস হুপিংটন চেষ্টা করলেন শেয়াল হারানোর বিলাপ আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে যাবার। কিন্তু মেজর মাঠ থেকে বিদায় নেবার পর গলাবাজি ঠিকমত জমল না তাঁর। অনেকটা ওয়াগনারের অপেরা দেখে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে একটা মামুলি ঝড় দেখার মত। ব্যাপারটা অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই হঠাৎ খানিকটা অনাবশ্যক চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'আমি এখন কী করব ওটাকে নিয়ে?' জানতে চাইল ভ্লাদিমির।

'পুঁতে ফেলো।'

'শুধু পুঁতে ফেলব? আর কিছু করতে হবে না?' শুনে খুব আশ্বস্ত মনে হলো ভ্লাদিমিরকে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভাবছিল ইংরেজের কাছে জন্তুটা নিশ্চয়ই খুব পবিত্র। হয়তো স্থানীয় পুরোহিতদের কেউ থাকতে চাইবে জানোয়ারটার শেষ কৃত্যে উপস্থিত থাকতে। কিংবা হয়তো ওর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কবরের ওপর তোপধ্বনি করবার রেওয়াজ আছে ইংরেজদের। না, শুধু পুঁতে ফেললেই চলবে!

নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় ভাগ্যাহত শিকারী ভ্লাদিমির হুপিংটন হলের আঙিনার লাইলাক ঝোপের নীচে ভুল করে মেরে ফেলা

জন্তুটিকে শিকারের থলে থেকে বের করে, কিছু অনুচ্চ প্রার্থনা সমেত কবর দিল। না নোরা, না মেজর পেলাবি, না মিসেস হুপিংটন, কেউই উপস্থিত ছিলেন না সেখানে, থাকলে বোধহয় অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হত।

জন্তুটা ছিল একটা বেশ বড়সড় বনবিড়াল!

মূলঃ সাকি

রূপান্তরঃ আব্দুল্লাহ মুহিউদ্দিন তানিম

রমণী, নাকি ব্যাঘ্র?

অনেক অনেক দিন আগে, সেই প্রাচীন কালে, কোনও এক দেশে ছিলেন এক রাজা। এই রাজা ছিলেন ভীষণ খেয়ালী। তাঁকে ঠিক বর্বর না বলে বরং অর্ধ-বর্বর বললে তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামোটি একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। রাজার ছিল প্রচণ্ড ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা বলে তিনি তাঁর মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ উদ্ভট সব কল্পনাগুলোকে বাস্তবে পরিণত করতেন। কোনও কাজ একবার হাতে নিলে তা শেষ না করে তিনি ছাড়তেন না। সব কিছু ঠিকঠাক মত চললে তিনি আনন্দেই থাকতেন। কিন্তু কাজের মধ্যে একবার কোনও সমস্যা দেখা দিলে তিনি আরও বেশি খুশি হয়ে উঠতেন, কেননা পথের বাধাগুলো নির্মমভাবে দু'পায়ে গুঁড়িয়ে ফেলার আনন্দ রাজা আর অন্য কিছুতেই পেতেন না।

সেই রাজ্যের রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে ছিল স্টেডিয়াম আকৃতির বিশাল এক অ্যাম্ফিথিয়েটার। এটি ছিল রাজার হাজারো খামখেয়ালীপনার অন্যতম নির্দশন। গ্যালারি ঘেরা এই অ্যামফিথিয়েটারটির অভ্যন্তরে ছিল রহস্যময় সব কুঠুরি আর আঁকাবাঁকা অসংখ্য প্যাসেজ। এসব কুঠুরিগুলোর কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে তা কোনও সাধারণ লোকের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, কঠোরভাবে এসবের গোপনীয়তা রক্ষা করা হত অ্যামফিথিয়েটারটির মাঝখানের খোলা অ্যারিনাতে রাজা এক অদ্ভুত ধরনের বিচারকার্যের আয়োজন করতেন। সেখানে অভিযুক্ত

ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এক সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করা হত।

ব্যাপারটি ছিল এরকম–যখনই রাজ্যের কোনও ব্যক্তি এমন কোনও অভিযোগে অভিযুক্ত হত যা রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম, তখনই চারদিকে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দেয়া হত যে অমুক তারিখে রাজার অ্যামফিথিয়েটারে অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারিত হবে। সেই নির্দিষ্ট তারিখে কাছের আর দূরের সব লোক এসে জড়ো হত গ্যালারিতে। কিছুক্ষণ পর রাজা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে গ্যালারির সবচেয়ে উঁচুতে বিশেষভাবে নির্মিত একটি স্থানে গিয়ে বসতেন। তাঁর ইশারায় গ্যালারির নীচের একটি কুঠুরির দরজা খুলে দেয়া হত, সেখান দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি মাঠে প্রবেশ করত। এরপর রাজার নির্দেশে ব্যক্তিটি তার ঠিক বিপরীতে অবস্থিত দুটো দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে যে কোনও একটি বেছে নিত। দরজা দুটো হুবহু এক রকমের দেখতে। কোন্‌টির পেছনে কী আছে অভিযুক্ত ব্যক্তি তা জানতে পারত না।

একটি দরজার পেছনে কুঠুরিতে রাখা হত দু-তিন দিনের অনাহারী হিংস্র এক বাঘ। অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই দরজাটি বেছে নিলে দরজাটি খুলে দেয়া হত, আর ক্ষুধার্ত সেই বাঘ হাজারো জনতার সামনে ব্যক্তিটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। এভাবেই অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হত আর সেই সাথে তার শাস্তিও কার্যকর হত। মামলা নিষ্পত্তির পর রাজার ভাড়া করা কিছু লোক চিৎকার করে বিলাপ শুরু করত, আর জনগণ মাথা নিচু করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বাড়ির দিকে যাত্রা করত।

আবার, এই একই অভিযুক্ত ব্যক্তিটিই যদি অপর দরজাটি বেছে নিত তা হলে সেখান থেকে বের হয়ে আসত অনিন্দ্য সুন্দরী এক রমণী। প্রজাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে অভিযুক্ত ব্যক্তির

বয়সের উপযোগী এই রমণীকে নির্বাচন করা হত। এই রমণীর সাথে ব্যক্তিটির বিয়ে দেয়া হত, এবং তা দেয়া হত তাৎক্ষণিক ভাবে। এভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ প্রমাণিত হত এবং তাকে পুরস্কৃত করা হত। অবশ্য, সেই ব্যক্তির আগের কোনও স্ত্রী আছে কি না, বা তার নিজস্ব কোনও পছন্দ-অপছন্দ আছে কি না, এসব 'ঝামেলাপূর্ণ' বিষয়গুলো এই 'মহৎ' বিচারকার্য পরিচালনার সময় বিবেচনায় আনা হত না। সেই অ্যারিনাতেই বিয়ের সকল বন্দোবস্ত করা হত। রাজা যেখানে বসতেন তার নীচের একটি দরজা খুলে পাদ্রী সাহেব বেরিয়ে হবু দম্পতির দিকে এগিয়ে যেতেন, আর এক দল তরুণী নেচে-গেয়ে বাদ্য বাজিয়ে তাকে অনুসরণ করত। বিয়ে পড়ানোর পর জনতার তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে 'নির্দোষ' ব্যক্তিটি নববধূকে সাথে নিয়ে ফুলের পাপড়ি বিছানো পথ ধরে বাড়ি ফিরে যেত।

বিচারের এই অর্ধ-বর্বর পদ্ধতিটিই সে রাজ্যে চলে আসছিল। এ পদ্ধতির নিরপেক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত–অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই তার ভাগ্য নির্ধারণ করত। আর এ বিষয়ে গ্যালারি থেকে কোনও প্রকার ইশারা বা ইঙ্গিত সে পেত না; কেননা, কোন্ দরজার পেছনে কী আছে তা রাজা ছাড়া গ্যালারির আর কেউ জানত না। এ ছাড়া, এই বিচারকার্যের আরেকটি সুবিধা ছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের নিষ্পত্তির জন্য খুব একটা অপেক্ষা করতে হত না। দোষী প্রমাণিত হলে সাথে সাথে শাস্তি; আর নির্দোষ প্রমাণিত হলেও সাথে সাথে পুরস্কার। সেই পুরস্কার সে পছন্দ করুক আর নাই করুক।

রাজ্যের প্রজাদের কাছেও বিষয়টি বেশ উপভোগ্য ছিল। তারা যখন গ্যালারিতে এসে জড়ো হত তখন কেউ মোটেও জানতে পারত না তাদের কেমন দৃশ্য দেখতে হবে। রক্তাক্ত কোনও পরিণতি, নাকি কোনও আনন্দ উৎসব? নোটিস প্রদানের পর

থেকেই তাদের মনে নানা রকম প্রশ্ন দেখা দিত। 'কী ঘটতে পারে, কী ঘটা উচিত'—এ ধরনের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ত তাদের মধ্যে। নির্ধারিত দিনটিতে বুক ভরা কৌতূহল নিয়ে তারা গ্যালারিতে উপস্থিত হত। তারপর কেটে যেত রুদ্ধশ্বাস কিছু মুহূর্ত। একসময় অবসান ঘটত সকল জল্পনা-কল্পনা আর কৌতূহলের। পরিণতি যাই হোক না কেন, কৌতূহল নিবৃত্তির পর দর্শকদের মনের গভীরে এক প্রকার আদিম আনন্দানুভূতি ছড়িয়ে পড়ত।

এই অর্ধ-বর্বর রাজার এক কন্যা ছিল। রাজকন্যা ছিল অপরূপ সুন্দরী। তবে তার ধমনীতে ছিল অর্ধ-বর্বর পিতার রক্ত, সে ছিল তার পিতার মতই খেয়ালী আর আবেগপ্রবণ। এ ধরনের গল্পে রাজকন্যারা রাজার অতি আদরের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি, রাজকন্যা ছিল রাজার চোখের তারা। এই রাজকন্যা ভালবাসত সে রাজ্যের এক তরুণ প্রজাকে, যে কিনা সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে কোনও অংশেই রাজ পরিবারের সমকক্ষ ছিল না। তবে এই যুবকটি ছিল নিঃসন্দেহে রাজ্যের সবচেয়ে সাহসী আর সুদর্শন যুবক। রাজকন্যা যুবকটিকে পাগলের মত ভালবাসত। যুবকটিও রাজকন্যার কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল। রাজার অজ্ঞাতে তাদের এই প্রেম নির্বিঘ্নেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন বিঘ্ন দেখা দিল; রাজা কীভাবে যেন সবকিছু জেনে ফেললেন। ব্যস্। সাথে সাথেই যুবকটিকে ধরে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আর জনসাধারণকে নোটিসের মাধ্যমে একটি তারিখ জানিয়ে দেয়া হলো। সেই তারিখে রাজার অ্যাম্‌ফিথিয়েটারে সকলের সামনে যুবকটির বিচার হবে।

উঁচু-নিচু সব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল। এক অতি সাধারণ প্রজা কিনা ভালবেসেছে রাজার

মেয়েকে! পরবর্তীতে এমন ঘটনা অনেক ঘটলেও, ঠিক সেই সময়ে ব্যাপারটি ছিল একেবারে নতুন। শুনে সকলেই আকাশ থেকে পড়ল। সবার মনে একই প্রশ্ন—এমন সাধারণ ঘরের ছেলে স্বয়ং রাজার কন্যাকে ভালবেসে কি অপরাধের কাজ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য তারা অধীর আগ্রহে সেই দিনটির অপেক্ষা করতে থাকল।

এদিকে, যেহেতু এবারের অভিযুক্ত ব্যক্তিটি স্বয়ং রাজার মেয়ের সাথে জড়িত, তাই তার বিচারের আয়োজন করার জন্যও রাজার লোকদের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গেল। তারা রাজ্যের সমস্ত বাঘের খাঁচা তন্নতন্ন করে খুঁজে সবচাইতে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বাঘটিকে বেছে নিল। অন্যদিকে উপযুক্ত বিচারকরা রাজ্যের সকল শীর্ষস্থানীয় সুন্দরীদের মধ্য থেকে সুদর্শন যুবকটির সাথে মানানসই একজনকে বাছাই করার কাজে লেগে গেলেন। যদিও যুবকটির বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি রয়েছে তা সকলেই জানত, কিন্তু রাজার বিচারকার্যের মধ্যে তা কোনওভাবেই বিবেচনায় আনা হবে না। রাজকন্যাকে ভালবাসা যদি তার জন্য কোনও দোষের কাজ না হয়ে থাকে তবে বিচারকদের বাছাই করা সুন্দরী রমণীটির সাথেই তার বিয়ে হবে এবং নিয়মানুসারে সেটাই হবে তার পুরস্কার! তাকে অবশ্যই সেই নির্দিষ্ট দিনটিতে অ্যামফিথিয়েটারে যেতে হবে। তারপরের ঘটনাগুলো রাজা পরমানন্দে উপভোগ করবেন। কোনও কিছুই রাজাকে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

দেখতে দেখতে বহু প্রতীক্ষিত সেই দিনটি এসে গেল। দূর-দূরান্ত থেকে আসা অসংখ্য লোকের ভিড়ে গ্যালারি ভরে উঠল। তিল ধারণের জায়গাটিও রইল না। যারা গ্যালারিতে স্থান পেল না তারা অ্যামফিথিয়েটারের বাইরে ভিড় করল। রাজা তাঁর সভাসদদের নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর নীচে,

ঠিক বিপরীত দিকেই রয়েছে সেই দরজা দুটো।

সব কিছু প্রস্তুত। রাজা ইশারা করলেন। নীচের একটি দরজা খুলে গেল। রাজকন্যার প্রেমিক অ্যারিনাতে প্রবেশ করল। দীর্ঘকায়, সুদর্শন এই যুবকটিকে দেখেই গ্যালারিতে চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। উপস্থিত লোকদের অধিকাংশই জানত না যে তাদের মধ্যে এত সুদর্শন এক যুবক বাস করে। রাজকন্যা এমন যুবকের প্রেমে পড়বে, সেটাই তো স্বাভাবিক। আহা, এমন একজনকে কিনা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে এমন ভয়ঙ্কর একটি স্থানে! লোকের মুখে মুখে এমনি আরও নানারকম মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে নিয়ম অনুসারে যুবকটি রাজার দিকে ঘুরে কুর্নিশ করল। কিন্তু, রাজার দিকে তার কোনও দৃষ্টি ছিল না, তার দৃষ্টি ছিল রাজার ডানে বসা রাজকন্যার দিকে।

এমন এক অনুষ্ঠানে রাজকন্যার না আসাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সে এসেছে। আর আসবে না-ই বা কেন? তার প্রেমিকের ভাগ্য নির্ধারিত হবে রাজার অ্যারিনাতে–এ ঘোষণা জারি হবার পর থেকেই এ দিনটি আর এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নানারকম বিষয় তার সমস্ত চিন্তা জুড়ে ছিল। প্রথমেই সে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল কোন্ দরজার পিছনে কী থাকবে এই রহস্য উদ্ঘাটনের কাজে। সে তার সমস্ত চিন্তা, বুদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ইচ্ছাশক্তি সব কিছু ব্যবহার করেছে চরম গোপন সেই তথ্যটি জানার জন্যে। এবং সফলও সে হয়েছে। চামড়া আচ্ছাদিত পুরু দরজা দুটোর মাত্র একহাত দূরে দাঁড়িয়েও তার প্রেমিক যে তথ্যটি জানতে পারবে না, সোনাদানা-অর্থ আর নারীর ইচ্ছাশক্তির বলে রাজকন্যা তা ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে।

কোন্ পাশের দরজাটি খুললে এক সুন্দরী রমণী বের হয়ে তার প্রেমিকের বাহুলগ্না হবে–রাজকন্যা শুধু সে তথ্য উদ্ধার

করেই ক্ষান্ত হয়নি, সে সেই সুন্দরী রমণীর পরিচয়টিও উদ্ধার করে ফেলেছে। মেয়েটি রাজপ্রাসাদেরই সবচেয়ে সুন্দরী যুবতীদের একজন। রাজকন্যা তাকে চেনে, এবং ঘৃণা করে। অতীতে প্রায়ই রাজকন্যা দেখেছে, অথবা হয়তো কল্পনা করেছে যে সেই সুন্দরী 'প্রাণিটি' তার প্রেমিকের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। আর কখনও কখনও তার প্রেমিকটিও যেন দৃষ্টিতে সে দৃষ্টির জবাব দিয়েছে। হয়তো পুরো ব্যাপারটিই ঘটেছে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে, কিন্তু সেটাই বা কম কীসের। অনেক কিছুই তো ঘটে যেতে পারে কয়েক সেকেণ্ডে! মেয়েটি সুন্দরী, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে রাজকন্যার ভালবাসার মানুষটির দিকে চোখ তুলে তাকায়, তার এত বড় সাহস! সেই নিঃশব্দ দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ওই যুবতীটিকে রাজকন্যা ঘৃণা করে, বর্বর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া নির্মমতার সবটুকু দিয়ে সে ওই সুন্দরী যুবতীটিকে ঘৃণা করে।

গ্যালারির সকল দর্শকের দৃষ্টি তখন অ্যারিনার সেই যুবকটির দিকে আবদ্ধ, আর যুবকটির দৃষ্টি রাজকন্যার দিকে। রাজকন্যার ফ্যাকাসে মুখটি দেখেই সে চট্ করে বুঝে ফেলেছে যে রাজকন্যা জানে কোন্ দরজার পেছনে কী আছে। রাজকন্যার কাছ থেকে সে এমনটিই আশা করেছিল। তাকে সে খুব ভাল ভাবেই চেনে। তাই তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে করেই হোক না কেন, রাজকন্যা এই গোপন তথ্যটি উদ্ধারে সফল হবে। এমুহূর্তে সেখানে দাঁড়িয়ে রাজকন্যার চোখের তারায় সেই সফলতার ছাপটিই সে স্পষ্ট দেখতে পেল।

যুবকটির চোখে মুহূর্তের ঝলকানি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল–চোখের ইশারায় সে প্রশ্ন করল, 'কোন্‌টি?'

প্রেমিকের চোখের ভাষা পড়ে নিতে রাজকন্যার এতটুকুন কষ্ট হলো না, আগেও যেমন কখনও হয়নি।

এমন সময়ে একটি মুহূর্তও নষ্ট করার নয়। যেমন চকিতে প্রশ্ন করা হয়েছে তেমনি চকিতেই এর উত্তর তাকে দিতে হবে।

রাজকন্যা তার ডান হাতটি সামান্য উপরে তুলে চট্ করে ডানে ইশারা করে নামিয়ে রাখল। রাজকন্যার এ ইঙ্গিত তার প্রেমিক ছাড়া আর কারুরই নজরে পড়ল না; কেননা, বাকি সকলের চোখ এখন সেই প্রেমিকটির দিকেই আটকে আছে।

প্রেমিক যুবকটি উল্টো দিকে ঘুরে দৃঢ় পদক্ষেপে দরজা দুটোর দিকে এগিয়ে গেল। গ্যালারিতে এখন নিশ্ছিদ্র নীরবতা, নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে সকলে। সকলের দৃষ্টিকে সাথে নিয়ে দরজা দুটোর খুব কাছে পৌঁছে গেল যুবকটি। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ডান দিকের দরজাটি খুলে ফেলল সে।

এখন, গল্পের এই চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে, একটি প্রশ্নই আমাদের মনে জেগে ওঠে: দরজাটি খুলে দেবার পর কী বের হয়েছিল, হিংস্র বাঘ, নাকি সেই সুন্দরী রমণী?

এ প্রশ্নটি নিয়ে আমরা যতই চিন্তা করব এর উত্তর দেয়া ততই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে; কেননা, এর সাথে জড়িত রয়েছে মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির এক জটিল আবর্ত যা আমাদের নিয়ে যাবে এক ভয়ানক গোলকধাঁধার চক্রে, যেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাওয়া মোটেও সহজ নয়। প্রশ্নটির সাথে মানব হৃদয়ের অনুভূতি জড়িত আছে—এ কথা না বলে বরং সঠিক হবে যদি বলি মানবী হৃদয়ের, এবং আরও সঠিক হবে যদি বলি গরম রক্তের অর্ধ-বর্বর প্রকৃতির এক মানবীর হৃদয়ের জটিল সব অনুভূতি জড়িত আছে। প্রিয় পাঠকগণ, আপনারা বিষয়টি আরেকটিবার ঠাণ্ডা মাথায় এভাবে ভেবে দেখুন যে, সিদ্ধান্তটি আপনি নিচ্ছেন না বরং নিচ্ছে সেই রাজকন্যা, যার অন্তর একই সাথে প্রেমিককে হারাবার বেদনা, হতাশা এবং ঈর্ষার মিলিত অনলে দগ্ধ হয়েছে।

প্রেমিককে সে কোন্ দরজাটি নির্দেশ করবে—এ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কত রকম চিন্তা আর কল্পনাই না খেলে গেছে তার মনে। তার ভালবাসার পুরুষটি সেই দরজাটি খুলে দিচ্ছে যার পেছনে হিংস্র থাবা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ানক এক বাঘ—এ দৃশ্য কল্পনা করে কতবার সে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদেছে, আধো তন্দ্রায় এমন কত দুঃস্বপ্নই না হানা দিয়েছে তার কল্পলোকে।

আবার এই একই পুরুষটিই যদি অপর দরজাটি খুলে দেয়, তখন? এই দুশ্চিন্তাও তাকে কম তাড়া করেনি। অন্য দরজাটি খুলে জীবনে ফিরে পাবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার প্রেমের পুরুষ তারই চোখের সামনে সেই সুন্দরীকে জড়িয়ে ধরছে যাকে সে দুই চোখে দেখতে পারে না—এমন একটি দৃশ্য কল্পনা করে কতবারই তো রাজকন্যা দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। যুবকটি সেই রূপসী তরুণীকে সাথে নিয়ে ধীর পায়ে পাদ্রী সাহেবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার প্রেমিককে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার আনন্দে সেই তরুণীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, নতুন জীবন ফিরে পেয়ে প্রেমিকটিরও সমস্ত দেহ থেকে আনন্দের দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে, চারদিক থেকে হর্ষোৎফুল্ল জনতা চিৎকার করে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে; আর এদিকে পাদ্রী সাহেব তাঁর পেছনে নিষ্ঠুরভাবে নেচে চলা একদল তরুণীকে সাথে নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং রাজকন্যার চোখের সামনে তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করছেন; তারপর সেই নবদম্পতি ফুলের পাপড়ি বিছানো পথ ধরে হাতে হাত রেখে হেঁটে চলছে, এদিকে উল্লসিত জনতা ফেটে পড়ছে তুমুল হর্ষধ্বনিতে, আর অতি তীব্র সেই হর্ষধ্বনির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে রাজকন্যার বুকফাটা আর্তনাদ—এমনি জ্বালা-যন্ত্রণাময় সব কল্পনায় রাজকন্যার অন্তর জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

এর চেয়ে তার প্রেমিক সেখানে সেই পাবলিক অ্যারিনাতেই

মরে গিয়ে পরজনমে তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকুক—সেটাই কি ভাল হবে না?

কিন্তু তারপরও কথা থাকে। সেই বীভৎস বাঘ, প্রেমিকের আর্তচিৎকার, রক্ত—এসব? এসব সে কী করে উপেক্ষা করবে?

সেদিনের সেই 'বিচার' অনুষ্ঠানে রাজকন্যা ডানদিকের দরজাটি চকিতে নির্দেশ করেছিল ঠিকই, কিন্তু সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে সিদ্ধান্তটি নেয়া মোটেই সহজ কাজ ছিল না। এর আগের কয়েকদিন কয়েক রাত সে একটানা নিজের সাথে যুদ্ধ করেছে, বিভিন্ন দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করেছে। এতসব করতে তার মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে জানত যে সিদ্ধান্ত তাকে একটা নিতেই হবে, এবং সে তা নিয়েও ছিল। আর তাই চরম সেই দিনটিতে প্রেমিকের দৃষ্টিতে ভেসে আসা প্রত্যাশিত সেই প্রশ্নের উত্তরে রাজকন্যা বিন্দু মাত্র সময় নষ্ট না করে ডানদিকের দরজাটি নির্দেশ করেছিল।

কিন্তু, সেই দরজাটির পেছন থেকে কী বের হলো? ঘুরেফিরে আবারও সেই একই প্রশ্ন! সত্যিকথা বলতে কী, আমি নিজে একা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে মোটেই সাহস পাচ্ছি না। সুতরাং, প্রিয় পাঠকগণ, আমি এ প্রশ্নটি আপনাদের সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখছি: ডান দিকে সেই দরজাটির পেছন থেকে কী বের হয়েছিল—রমণী, নাকি ব্যাঘ্র?

মূল: ফ্র্যাংক. আর. স্টকটন
রূপান্তর: সামিউল আমীন

উৎসর্গ

চীনের প্রাচীরের পাশ ঘেঁষে সম্রাট ইউয়ানের রাজ্য। একদিন ভোরে, চা পান করছিলেন সম্রাট আর হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন। ফসল কাটার মৌসুম আসন্ন। ঝিরঝিরে, ভেজা বাতাসে গা জুড়িয়ে যায়।

হঠাৎই, বাগানের লাল-নীল টালির ওপর দিয়ে, ছুটতে ছুটতে আসতে দেখা গেল সম্রাটের এক ভৃত্যকে। 'সম্রাট, হে সম্রাট, বড় আশ্চর্য ঘটনা!' চেঁচাচ্ছে সে।

'হ্যাঁ,' বললেন সম্রাট, 'বাতাসটা আজ বড্ড মিঠে লাগছে।'

'জী না, হুজুর। সে অলৌকিক ঘটনা!' বলে উঠল ভৃত্য, কুর্নিশ করল।

'চা-টা ভারি ভাল লাগছে, এটা নিঃসন্দেহে অলৌকিক ঘটনা।'

'জী না, মহামান্য সম্রাট।'

'দাঁড়াও, আন্দাজ করতে দাও–সূর্য উঠেছে, নতুন দিন শুরু হয়েছে। কিংবা সাগরের পানি নীল দেখাচ্ছে। এর চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার আর কী আছে?'

'মহামান্য সম্রাট, এক লোক আকাশে উড়ছে!'

'কী?' হাতপাখা নাড়া বন্ধ হয়ে গেছে সম্রাটের।

'ডানায় ভর দিয়ে একটা লোক বাতাসে ভাসছে। আকাশ থেকে কার যেন গলার আওয়াজ শুনে যেই চোখ তুলেছি, দেখি

ওই কাণ্ড। মুখে একজন মানুষ নিয়ে স্বর্গে চড়ে বসে আছে একটা ড্রাগন। কাগজ আর বাঁশ দিয়ে তৈরি, সূর্য আর ঘাসের মত রং ওটার গায়ে।'

'এই সাত সকালে,' বললেন সম্রাট, 'আজগুবি স্বপ্ন দেখে উঠে এসেছ তুমি।'

'আমার কথা বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখবেন, চলুন।'

'বসো,' বললেন সম্রাট। 'চা খাও। কোনও মানুষকে সত্যি সত্যি উড়তে দেখা অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বটে। ব্যাপারটা নিয়ে একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো, আমারও দৃশ্যটা স্বচক্ষে দেখার জন্যে খানিকটা প্রস্তুতি দরকার।'

চা পান করছেন দু'জনে।

'দেরি করবেন না, সম্রাট,' মিনতি করল ভৃত্য। 'লোকটা চলে যাবে।'

চিন্তিত মুখে উঠে দাঁড়ান সম্রাট। 'চলো হে, দেখি কী দেখেছ।'

এক বাগানে প্রবেশ করলেন ওঁরা, ঘাসে ছাওয়া ময়দানটা পেরিয়ে, ছোট্ট সেতুটা আর গাছ-গাছালির জটলা পার হয়ে, উঠে এলেন খুদে এক টিলায়।

'ওই যে!' বলে উঠে ভৃত্য।

আকাশে চোখ রাখেন সম্রাট।

ও-ই উঁচু থেকে, শোনা যায় কি যায় না, হেসে উঠল এক লোক। রঙচঙে কাগজ আর নলখাগড়া ব্যবহার করে একজোড়া ডানা আর হলদে রঙের চমৎকার এক লেজ বানিয়েছে সে। পাখিদের সাম্রাজ্যে, বিশালতম প্রজাতির এক বিহঙ্গের মত ভেসে রয়েছে—ঠিক যেন প্রাচীন ড্রাগনদের দেশে হাল জামানার এক ড্রাগন।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস ভেদ করে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল বহু উঁচু থেকে। 'আমি উড়তে পারছি, আমি উড়তে পারছি!'

ভৃত্য সোল্লাসে হাত নাড়ল ওর উদ্দেশে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

সম্রাট ইউয়ান নিথর দাঁড়িয়ে। তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত উড়ন্ত লোকটির দিকে নয়, চীনের প্রাচীরের উদ্দেশে। সুদূরতম সবুজ পর্বতমালার কুয়াশা সবে কাটতে শুরু করেছে, ধীরে ধীরে আদল পাচ্ছে প্রাচীরটা। গোটা এলাকাটিকে রাজকীয় ভঙ্গিতে, সাপের মত এঁকেবেঁকে, ছুঁয়ে রয়েছে মহান প্রাচীরটা। শত্রুবাহিনীর আক্রমণ থেকে যেন অনন্তকাল ধরে রক্ষা করছে তাঁদেরকে দেয়ালটা। নদী-রাস্তা-পাহাড় ঘেঁষা শহরটার দিকে দৃষ্টি চলে গেল এবার সম্রাটের, জেগে উঠছে লোকালয়।

'আচ্ছা,' ভৃত্যকে বললেন সম্রাট, 'এই লোকটাকে তুমি ছাড়া আর কেউ উড়তে দেখেছে?'

'জী না, হুজুর, আমি একাই দেখেছি,' বলে, হাসিমাখা মুখে আকাশের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল ভৃত্য।

আকাশের দিকে আরেকটি মিনিট স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন সম্রাট, 'ওকে নেমে আসতে বলো।'

'এই যে, নেমে এসো, নেমে এসো! সম্রাট তোমাকে ডাকছেন!' মুখের কাছে দু'হাত জড় করে আদেশ পালন করল ভৃত্য।

উড়ন্ত লোকটি নীচের দিকে নেমে আসতে শুরু করলে চারধারে নজর বুলালেন সম্রাট। এক চাষী তার জমিতে দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, লক্ষ করলেন তিনি।

কাগজের খসখস, বাঁশের ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে নেমে এল লোকটা। তারপর গর্বিত পদক্ষেপে সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়াল. কিম্ভূত সাজ পোশাকের কারণে প্রথমটায় জবুথুবু থাকলেও, অবশেষে কুর্নিশ করল সম্রাটের উদ্দেশে।

'করেছ কী তুমি?' কৈফিয়ত দাবি করলেন সম্রাট।

'আমি আকাশে উড়েছি, হুজুর,' বলল লোকটা।

'করেছ কী তুমি?' সম্রাট বলে উঠলেন আবারও।

'বললামই তো!' চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা।

'কিছুই বলোনি।' সম্রাট হাড্ডিসার একটা হাত বাড়িয়ে, রঙীন কাগজ আর বিহঙ্গ সদৃশ মানুষটিকে স্পর্শ করে দেখলেন।

'জিনিসটা সুন্দর–কেমন, হুজুর?'

'হ্যাঁ, তবে অতিরিক্ত সুন্দর।'

'দুনিয়ায় এ জিনিস এই একটাই আছে!' আত্মতৃপ্তির হাসি হাসে লোকটা। 'আমার আবিষ্কার।'

'দুনিয়ায় এই একটাই মাত্র?'

'কোনও সন্দেহ নেই।'

'আর কে কে জানে এটার কথা?'

'কেউ না। এমনকী আমার স্ত্রীও না। ও ভেবেছে আমি বুঝি ঘুড়ি বানাচ্ছি। ও ঘুমিয়ে পড়লে রাতের বেলা চুপিচুপি পাহাড়ে এসে উঠেছি। তারপর ভোর হলে পর, সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে পাহাড় থেকে লাফ দিয়েছি। ব্যস, আর কী, সোজা উঠে গেছি আকাশে! আমার বউ এর কিছুই জানে না।'

'ওর জন্যে ভাল হলো,' বললেন সম্রাট। 'এসো।'

প্রাসাদে লোকটাকে নিয়ে ফিরে এলেন সম্রাট। সূর্য এখন দখল করে নিয়েছে আকাশ, তাজা সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে সবুজ ঘাস–মন ভাল হয়ে যায়। সম্রাট তাঁর ভৃত্য ও উড়ন্ত যানের আবিষ্কারককে পেছনে নিয়ে থমকে দাঁড়ালেন সুবিশাল উদ্যানে।

হাততালি দিলেন সম্রাট, 'প্রহরীরা, কে কোথায় আছ?'

দৌড়তে দৌড়তে এল তারা।

'বন্দী করো একে।'

প্রহরীরা গ্রেপ্তার করল লোকটিকে।

'জল্লাদকে ডাকো।'

'কী বলছেন আপনি, সম্রাট!' বিস্মিত আবিষ্কারক হাহাকার করে ওঠে। 'কী করেছি আমি?' কেঁদে ফেলল সে, মর্মর শব্দ উঠল তার যন্ত্রটায়।

'এই লোক বিশেষ এক কল বানিয়েছে,' বললেন সম্রাট, 'আবার জিজ্ঞেস করে কী করেছে। হুঁহ, সে নিজে জানে না। যা খুশি তাই বানালেই হলো, কেন বানিয়েছে, কী তার কাজ জানার দরকার নেই।'

ধারাল কুঠার হাতে তেড়ে এল জল্লাদ। নগ্ন, পেশল দু'বাহু তৈরি তার, কেবলমাত্র হুকুম মাটিতে পড়ার অপেক্ষা।

'একটু দাঁড়াও,' বললেন সম্রাট। কাছেই রাখা এক টেবিলের উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়ালেন, ওটার ওপর স্বয়ং তাঁর আবিষ্কৃত একটি যন্ত্র। নিজের গলা থেকে খুদে এক সোনার চাবি খুলে নিলেন সম্রাট। ছোট্ট, পলকা যন্ত্রটায় চাবি ঢুকিয়ে দম দিলেন। তারপর ছেড়ে দিলেন ওটা।

মেশিনটা ধাতুতে আর অলঙ্কারে গড়া এক খুদে বাগানের প্রতিরূপ। দম দিয়ে ছেড়ে দিলে খুদে খুদে পাখিরা ধাতব গাছে বসে গান গায়, এইটুকুন এক অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় নেকড়ের পাল, ছোট ছোট মানুষের মূর্তি ছোটাছুটি করে রোদে-ছায়ায়, হাতপাখা নেড়ে বাতাস খায়, পাখিদের গান আর অবিশ্বাস্য রকমের ছোট অথচ কলকণ্ঠী ঝর্ণার সুরধ্বনি শোনে।

'কি, অপরূপ না জিনিসটা?' অবশেষে বললেন সম্রাট। 'কী বানিয়েছি কেউ জিজ্ঞেস করলে ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারব আমি। আমার যন্ত্রের পাখিরা গান গায়, ঝর্ণা কলধ্বনি করে, এর মানুষ-জন হাঁটাচলা করে, আরও কত কী।'

'কিন্তু হে, মহামান্য সম্রাট!' উড়ন্ত যানের আবিষ্কারক হাঁটু গেড়ে বসে। দরদর ধারায় অশ্রু গড়াচ্ছে তার গাল বেয়ে।

'আমিও তো ওই একই কাজ করেছি! আমি আপনারই মত সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছি। ঘুমন্ত বাড়ি-ঘর, বাগান দেখেছি আমি। সাগরের ঘ্রাণ নিয়েছি, এমনকী সাগর দেখেওছি, ওই পাহাড়ের ওপারের আকাশ থেকে। পাখির মত ডানা মেলে ভেসে বেড়িয়েছি আমি, ওহ, সে যে কী সুন্দর অভিজ্ঞতা বলে বোঝাতে পারব না। এই নরম পালকের মতন উড়িয়ে নিচ্ছে বাতাস, তো এই আবার পাখা নেড়ে গা জুড়িয়ে দিচ্ছে। আর সকালের আকাশের কী যে অদ্ভুত সৌরভ—বলার মত না! তুলনা হয় না, সম্রাট, তারও তুলনা হয় না!'

'হ্যাঁ,' ব্যথিত কণ্ঠে বললেন সম্রাট। 'বুঝতে পারছি সত্যি কথাই বলছ তুমি। আমার হৃদয়টাও তোমার সাথে সাথে বাতাসে ভেসে উঠেছিল। জানতে ইচ্ছে করছিল কেমন সে অনুভূতি? আকাশটাই বা কেমন? অত ওপর থেকে বহু দূরের জলাশয়গুলোকে কেমন দেখায়? আমার প্রাসাদ আর লোকজনদের? পিঁপড়ের মত কি? ঘুমে ডুবে থাকা দূরের শহরগুলোকে কেমন লাগে?'

'আমাকে তা হলে মাফ করে দিন, হুজুর!'

'কখনও কখনও,' বললেন সম্রাট, আরও বেদনার্ত শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর, 'পুরানোকে রক্ষা করতে হলে নতুনকে ত্যাগ করতে হয়। আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছি না, পাচ্ছি অন্য একজনকে।'

'কাকে?'

'তোমার দেখাদেখি এরকম আরেকটা যন্ত্র যে বানাবে তাকে। কিন্তু সে তো তোমার মত সৌন্দর্যপিপাসু হবে না। তার মনে থাকবে শয়তানি বুদ্ধি, সে ধ্বংস করে দেবে দুনিয়ার সমস্ত শোভা। সে লোককেই আমার যত ভয়।'

'কেন? কেন?'

'কে বলতে পারে, একদিন এমনি এক যন্ত্রে চড়ে কেউ চীনের

প্রাচীরের ওপর পাথর ফেলবে না?' বললেন সম্রাট। 'ওটাকে ধ্বংস করে দেবে না?'

কেউ এক তিল নড়ল না, টুঁ শব্দটি করল না।

'ওর গর্দান নাও!'

রূপালী কুঠারটা সাঁই করে নামিয়ে আনল জল্লাদ। সম্রাট এরপর আদেশ করলেন: 'উড়ুক্কু যান আর তার আবিষ্কারকের দেহ পুড়িয়ে ছাই করো, কবরচাপা দাও।'

অনুগত ভৃত্যের দল আজ্ঞা পালন করতে ছুটল!

উড়ন্ত যানের খবর-আনা ভৃত্যটির দিকে ফিরে চাইলেন এবার সম্রাট। 'মুখ বন্ধ রাখবে। স্বপ্ন দেখেছ তুমি, বুঝতে পেরেছ? অত্যন্ত দুঃখজনক কিন্তু অপরূপ এক স্বপ্ন। আর ওই চাষীকে বলে দেবে, সে যেন মনে করে তার দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল। খবরটা জানাজানি হলে তোমরা দু'জন প্রাণে বাঁচবে না।'

'আপনি দয়াময়, হুজুর।'

'না, মোটেই দয়াময় নই,' বললেন সম্রাট। বাগানের দেয়ালের ওদিকটায়, লক্ষ করলেন, ভোরের বাতাসের মিষ্টি গন্ধমাখা অভিনব যন্ত্রটায় আগুন দিয়েছে তাঁর প্রহরীরা। কালো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে শূন্যে। 'না, বরং বলতে পারো ভয়ানক শঙ্কিত আর হতভম্ব।' প্রহরীরা ছোট্ট এক গর্ত খুঁড়ছে ছাই চাপা দেয়ার জন্যে। 'লক্ষ প্রাণের স্বার্থে, একজন জীবন উৎসর্গ করলে কী আর এমন এসে যায়?' সান্ত্বনা খুঁজছেন সম্রাট।

গলায় ঝোলানো চেন থেকে চাবিটা তুলে নিলেন তিনি, আবারও দম দিলেন তাঁর তৈরি অপূর্ব সুন্দর খেলনাটায়। সম্রাট দৃষ্টি প্রসারিত করলেন, সবুজ মাঠ-ময়দান, নদী-ঝর্ণা, শহর ছাড়িয়ে ওপাশের মহান প্রাচীরটার উদ্দেশে। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর। ইতোমধ্যে দম পেয়ে চালু হয়ে গেছে তাঁর খুদে খেলনাটা।

খুদে খুদে পাখিরা মধুর গান গেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে খুদে আকাশটায়।

'ওহ,' বললেন সম্রাট, চোখ বুজলেন। 'পাখিগুলোকে দেখো! তোমরা পাখিগুলোকে দেখো!'

মূল: রে ব্র্যাডবেরি

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে

হরর কাহিনি

পিশাচ-চক্র

সম্পাদনাঃ অনীশ দাস অপু



'...আমার বিস্ফারিত চোখের সামনে দেখতে দেখতে ওদের শরীরের সমস্ত মাংস খসে পড়ল...আমার শরীর অবশ হয়ে আসছে...

তারপর? তারপর কী হলো জানতে হলে পড়ুন রক্ত হিম করা এ বইয়ের টাইটেল গল্পটি।

এ সংকলনের বাদবাকি গল্পের প্রতিটিই আপনাকে দারুণ শিহরিত ও রোমাঞ্চিত করবে।

হরর ও পিশাচ কাহিনির এ এক অপূর্ব সম্ভার।

পড়েই দেখুন না!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনুবাদ

হিচ-হাইকার

সম্পাদনাঃ অনীশ দাস অপু

সম্পাদকের দাবি, এক কুড়ি কাহিনি নিয়ে তার এ বই পাঠককে কাঁদাবে, হাসাবে এবং ভাবাবে। তিনি বলেছেন, চূড়ান্ত বাছাই এবং সম্পাদনা শেষে মনে হয়েছে-নাহ, সত্যি চমৎকার একটি সংকলন আমি উপহার দিতে যাচ্ছি আমার পাঠকদেরকে। সত্যি কই তাই? পাঠক, নিজেই দেখুন না একবার পরখ করে! আশা করি বিশ্বখ্যাত লেখকদের লেখা গল্পগুলো পড়ে আপনারও বিচিত্র অনুভূতি হবে সম্পাদকের
মত - কখনও অশ্রুসজল হয়ে উঠবে চোখ, কখনও ফেটে পড়বেন অট্টহাসিতে, আবার রোমাঞ্চ জাগবে শরীরে, হবেন শিহরিত।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০